পা বাড়ালেই রাস্তা

প্রেমেন্দ্র মিত্র

মিত্র ও ঘোষ
১০ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ, বৈশাখ ১৩৬৯

দ্বিতীয় মুদ্রণ

—পাঁচ টাকা—

প্রচ্ছদপট :

অঙ্কন—শ্রীআশু বন্দ্যোপাধ্যায়

মুদ্রণ - রিপ্রোডাকশন সিণ্ডিকেট

মিত্র ও ঘোষ, ১০ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা ১২ হইতে এস এন. রায় কর্তৃক প্রকাশিত ও মানসী প্রেস, ৭৩ মাণিকতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীপ্রদীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র

স্নেহাস্পদেষু

পা বাড়ালেই রাস্তা

যা চোখের সামনে, হাতের কাছে, তার রূপ আমরা দেখতে পাই না। জানি না তার মূল্য দিতে।

বৈশালী কি উজ্জয়িনী বললে মনে আমাদের নেশা লাগে। তার রাস্তা-ঘাট বাজার-হাট মন্দির-বাগান মানুষজন আমাদের কল্পনাকে রঙিন করে তোলে। কিন্তু সেই মন নিয়ে কাছের জিনিস কি দেখি!

ধরা যাক পঞ্চাশ বছর বাদে এই কলকাতার শহরের পটভূমিকায় এক ছায়াছবি তৈরী হচ্ছে।

সে ছবিতে এই কলকাতা শহরের চেহারা দেখলেই তখনকার দর্শক মুগ্ধ হয়ে যাবে নিশ্চয়।

তবু এ কলকাতার কতটুকু তারা পাবে!

সময়ের দূরবীক্ষণের কাঁচ ত আর নিখুঁত নয়। তাতে কত কিছু যাবে বেঁকে চুরে। হয়ত চৌরঙ্গী পার্ক স্ট্রীট দিয়ে পালকির সঙ্গে স্টেট বাস যাবে।

বোম্বাই মার্কিনী ছবিওয়ালাদের বংশধর কেউ তখনও থাকলে, ধুতি পাঞ্জাবির ওপর পাগড়ি-চড়ান, পায়ে মিলিটারি বুট-পরা জনসাধারণকে সে রাস্তায় হাঁটতে দেখা কিছু অসম্ভব হবে না।

কিন্তু ওরকম ভুঁইফোঁড় বিদ্যাদিগ্‌গজ ছবিওয়ালার বদলে সত্যিকার বিচক্ষণ রসিক কারুর হাতেও যদি সেই ছবি তৈরী হয় তবু এই আমাদের আজকের দিনের কলকাতার আসল রহস্য-বিস্ময় গ্লানি-গৌরব মাধুর্য-মালিন্য তাতে পুরোপুরি ধরা পড়বে কি?

বর্তমানের এসব ছবি যেখানে রঙিন ছায়ালোকে উধাও সেই দূরত্বের মোহাঞ্জন পরেই এই কলকাতাকে দেখতে চেষ্টা করলে তার অনেক কিছু নতুন করে আবিষ্কারের বিস্ময় হয়ত পেতে পারি।

সবচেয়ে তাতে চমৎকৃত করে দেবে বুঝি কলকাতার রাস্তাঘাট।

কলকাতার রাস্তার যে একটি অপূর্ব রূপ আছে অতি পরিচিত অতি নিকট বলেই হয়ত আমাদের মন তার প্রতি উদাসীন।

কিন্তু চলুন কোন বিকেলবেলায় ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে রাস্তার ধারের মাঠে, কি চৌরঙ্গীর মোড়ে—কার্জন পার্ককে কেটে ছেঁটে ভেঙে চুরে তছনছ করে যেখানে ট্রামের লাইনের গোলকধাঁধা তৈরী হয়েছে।

মনে হবে যেন মেলা বসেছে।

এমন মেলা সেখানে নিত্য বসে। আর কি বিচিত্র সে মেলা!

কলকাতা যে বাংলাদেশের রাজধানী সেখানে গেলে অন্তত ভুলে যেতে হবে খানিকক্ষণ।

রাস্তার ধারে মাঠের ওপর যেখানে এতটুকু সুবিধে হয়েছে সেখানেই রসনালোভন সওদা সাজিয়ে যারা বসে আছে তারা বেশির ভাগই বঙ্গসন্তান নয়।

আহার্য সওদাগুলিও যেমন বাংলার নিজস্ব নয়, দোকানী খরিদ্দার রাস্তার মানুষও তাই।

ধুলো বালি নোংরা সম্বন্ধে একটু নির্বিকার হলে উপাদেয় অনেক কিছু দিয়ে রসনার তৃপ্তি সাধন করা যায়। গোলগপ্পা, আলুকাবলি, দহি-বড়া, আলু-ভাজি, চানাচুর, কমলার শরবত আর টাটকা মাড়াই আখের রস।

আর তেমন কোন দিনে ঠিক সময়টিতে যদি গিয়ে পড়া যায়—দেখাও হয়ে যেতে পারে আমাদের দিলীপ সামন্তের সঙ্গে অপ্রত্যাশিত ভাবে।

দিলীপকে অবশ্য প্রথমেই চোখে না পড়বার কথা।

তার আগে বাজখাঁই গলায় সাদর সম্ভাষণ শোনা যাবে আখের রসের হরবোলা দোকানীর, মাড়াই কলের চাকার ঘন্টাধ্বনি সহযোগে বিভিন্ন খিচুড়ি ভাষায়।

আইয়ে বাবু আইয়ে, পি যাইয়ে। আসেন বাবু—একদম তাজা রোস আছে,—মেজাজ খুস হোয়ে যাবে!

এইবার হয়ত মাড়াই কলে আখের যোগান যে দিচ্ছে তাকে চোখে পড়তে পারে। দেখলে একটু অবাকই হবার কথা। আখ মাড়াই-এর ব্যাপারে এরকম চেহারা অন্তত দেখবার আশা করা যায় না। মাঝারী মাপের বেশ শক্ত সমর্থ জোয়ান শ্রীমান ছেলে,—পোশাক-পরিচ্ছদ অতি সাধারণ আর একটু জীর্ণ-প্রায় হলেও পরিচ্ছন্ন। মুখ চোখে বিদ্যাবুদ্ধি ভদ্রতার ছাপ স্পষ্ট।

দোকানে এবার খদ্দেরের ভিড় একটু বেড়ে গেছে। যাই কি না যাই ভাবে একটু দূরে দাঁড়িয়ে একদল ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়ে—হাসি-তামাশা করছে। কিছুই মালিকের নজর এড়াবার জো নেই।

মালিক ডাক দেয়,—"এ দিলীপবাবু। উ ছোড়িয়ে দেন, ইধারে আসেন।"

দিলীপ আখ যোগান ছেড়ে কাছে আসবার পর তার চাপা গলার আলাপ শোনা যায়—

"দেখিয়ে উধার। সাহেব লোক আসছে। আজকাল খুব আখের রোস খায়! ওই আসতে আছে! খুব ভালো করে বাত-চিত্ কোরবেন!"

ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়ের দল এতক্ষণে তাদের দ্বিধাদ্বন্দ্ব জয় করে কাছে এগিয়ে আসে।

মালিক দৌলতরাম নিজেই প্রথম আপ্যায়ন সুরু করে,—"Coming Sir! good juice ladies & gentleman!"

নতুন খরিদ্দারদের মধ্যে হাসাহাসি পড়ে যায়। দলের মুরুব্বী ছেলেটি হেসে জিজ্ঞাসা করে,—"বোলো কিৎনা পানি মিলায়া!"

"পানি!" দৌলতরাম একেবারে যেন মর্মাহত হয়,—"উখ্ কা রসমে পানি? ইয়ে কেয়া গাই কে দুধ হ্যায়!"

হাসাহাসির মধ্যে আরেক জন জিজ্ঞাসা করে,—"কেয়া সাফা গিলাস মিলে গা?"

দৌলতরাম জবাব দিতে গিয়ে হঠাৎ থেমে যায়। তার দোকানের

সব বাহার জানাবার এই তো সুযোগ। সোৎসাহে বলে,—"আংরেজিমে বোলিয়ে, হিন্দি কেঁও। আংরেজি বাত কিজিয়ে!"

সগর্বে এবার দিলীপকে দেখিয়ে দিয়ে বলে,—"বহুৎ আচ্ছা আংরেজি জানতে হেঁ, বি-এ ম্যাট্রিক পাশ হায়।"

দিলীপ নির্বিকার মুখে দাঁড়িয়ে থাকে। ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়েরা হেসে এ ওর গায়ে লুটিয়ে পড়ে।

মুরুব্বী ছেলেটি একটু বিদ্রূপের সঙ্গে প্রশ্ন করে,—"Is that so! Well, are the glasses clean?"

দিলীপের মুখে ভাবান্তর নেই, গ্রামোফনের মত বলে যায়—"As clean as you can expect here. The washing tub is there for you to see."

"কেয়া! শুনা আভি!"—দৌলতরামের বুক একেবারে দশ হাত। চোখ মুখ তার তেলে ঘামে চটচটে হয়ে না থাকলে বোধহয় তা থেকে জ্যোতিই ঠিকরে বার হত। সে উৎসাহ ভরে আরো অনেক কিছু জানায়,—"লিখাপড়া বহুৎ করিয়েছে! মুন্সিকে কাম কোরবে না, ইসি লিয়ে হামার সাথে ই কাম কোরতে আছে!"

গেলাস ধোয়ার নোংরা টবের জলের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করেই নতুন খরিদ্দারদের কাঁচের গেলাসে খাবার প্রবৃত্তি উবে গিয়েছে তখন। তারা মাটির ভাঁড়ে রস খেতে চায়—"দেও, উও মিট্টিকে গিলাস মে দেও।"

দৌলতরাম একটু হতাশ হয়, এমন খরিদ্দার অমন চোস্ত ইংরাজি শুনেও তার কাঁচের গেলাসের মর্যাদা রাখল না!

"যো আপকা মর্জি।" বলে একটু ক্ষুণ্ণভাবেই মাটির গেলাসে সে রস ঢেলে তাদের দেয়।

মাটির গেলাসে দেওয়ার আপত্তির তার অন্য কারণও আছে। যত সস্তাই হোক মাটির গেলাস কিনতে পয়সা লাগে। মাটির গেলাস প্রায় ফুরিয়েও এসেছে।

দিলীপকে সে আবার কাছে ডাকে। বলে,—"মিট্টিকে গেলাস কমতি আছে, হামি মোলকে লিয়ে আসছি। আপনি দুকান দেখেন তব তক্।"

দিলীপের ওপর দৌলতরামের বিশ্বাস যথেষ্ট বোঝা যায়। কিন্তু বিশ্বাস যতই থাক হুঁশিয়ারিতে দৌলতরাম কম যাবে কেন!

আখের রসের দাম যে ছোট বাক্সে জমা থাকে সেটা উপুড় করে সমস্ত পয়সা কড়ি কয়েক প্যাঁচ দিয়ে ট্যাকের থলিতে গুঁজে সে মাড়াই যা হয় নি সেই আখগুলো গুনে ফেলে।

"এক কুড়ি সাতঠো আছে দিলীপবাবু! হুঁশিয়ারি সে কাম কোরবেন।"

শেষ উপদেশ দিয়েও দোকানের ওপর একবার শেষ দৃষ্টি বুলিয়ে দৌলতরাম চলে যায়।

ফিরে আসে প্রায় ঘণ্টাখানেক পর। হিসেবী সাবধানী মানুষ মাটির গেলাসগুলো নিজেই বয়ে এনেছে। গেলাসগুলো যথাস্থানে রাখতে রাখতে আখের সারির দিকে চেয়ে খুশি আর তার ধরে না।

"বিজনেস্ ত বহুৎ আচ্ছা মালুম হোতেছে দিলীপবাবু। তিনঠো উখ পিষাই হোইয়ে গিয়েছে।"

দিলীপ পকেট থেকে এতক্ষণের পাওয়া দামটা বার করে হাতে তুলে দেবার পর দৌলতরামের হাসিটা প্রায় আকর্ণবিস্তৃত হয়ে ওঠে।

কিন্তু দামের পয়সা গুনতে গুনতে সে হাসি কোথায় মিলিয়ে ভ্রূকুটি দেখা দেয় দৌলতরামের মুখে।

"কেতো পয়সা দিলেন দিলীপবাবু।"

"কেন দেড়টাকা পান নি! বারোটা ছোট গেলাসের দাম!"—দিলীপ পরের বিস্ফোরণটার জন্যে যেন প্রস্তুত হয়েই শান্তভাবে জানায়।

"বারো গিলাস মানে ছে বড়া গিলাস। তিনঠো উখসে আঠারো ছোটা গিলাসের বদলি সিরিফ বারো!"—দৌলতরাম চোখে যেন অন্ধকার দেখে,—"কি বোলছেন কি দিলীপবাবু!"

"ভুল ত কিছু বলি নি।'—দিলীপ অবিচলিত। "তিনটে আখের রসে যে ক' গেলাস হয়েছে তাই বলছি!"

এবার আর্তনাদ করে ওঠে দৌলতরাম,—"তিনটে উখসে খালি বারো গিলাস নিকলেছে!"

দৌলতরামের দুনিয়া যেন হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেছে এমনি দিশাহারা তার অবস্থা। এই অবস্থাতে হঠাৎ একটা কথা মনে হয়ে যেন টনক নড়ে ওঠে।

আখ মাড়াই-এর টেবিলের চার ধারে কাপড়ের পর্দা ঝোলানো। ব্যস্ত হয়ে সে একদিকের পর্দা তুলে নিচে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে।

বুঝতে আর কিছু বাকি থাকে না। সেখানে দুটি বালতি যেমন রেখে গেছল তেমনি কানায় কানায় জলে ভর্তি এখনো। আখের রসের সঙ্গে তাদের মধুর মিলন কেউ ঘটায় নি।

পর্দা ফেলে দিয়ে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ দৌলতরামের মুখ দিয়ে রাগে দুঃখে বিস্ময়ে বিমূঢ়তায় কোন কথা আর বার হয় না। তার পর নিজেকে সম্পূর্ণ সামলে নিয়ে লজ্জায় সঙ্কোচে বিনয়ে সে যেন গলে যায়।

"হামার কসুব মাফ্ কোরবেন দিলীপবাবু, হামারি ভুল হোইয়েছে!"

দিলীপ কোন জবাব না দিয়ে চুপ করে থাকে। তার চোখের দৃষ্টিতে যদি কৌতুক কিছু থাকে মুখের ভাবে তা ধরা পড়ে না।

দৌলতরাম আবার উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে আত্মধিক্কারে।

"হামি আপনাকে চিনতে পারি নি। আপনি বি-এ ম্যাট্রিক পাশ হোয়ে এৎনা ছোটা কাম কোরতে আইয়েছিলেন উসি সে আমি তাজ্জব হোইয়ে গেছলাম। আজ আউরভি বুদ্ধু বনিয়ে গেলাম। আপনি এতো সাধু সন্ত সাচ্চা আদমি হামি কি জানি! আমি কি না ভাবিয়েছি, আখের রোসে আপনি পানি মিলাবেন। কি আপ্‌সোস আমার হোতে আছে আপনি সমঝাতে পারবেন না।"

এবার দিলীপের মুখে হাসি দেখা দেয়। বলে, "আপ্‌সোস হচ্ছে সত্যি?"

"জরুর। বহুৎ আপ্‌সোস!"

দৌলতরামের একেবারে অন্তর থেকে এ স্বীকৃতি যে বেরিয়ে আসে এবিষয়ে সন্দেহ নেই।

"তা আপসোস যখন হচ্ছে, তখন আমার মাইনে কিছু বাড়িয়ে দেবেন বোধ হয়।" দিলীপের ভাব দেখে মনে হয় সব সমস্যার এমন সহজ সমাধানের রাস্তা আর সহজে মিলবে না!

দৌলতরাম কিন্তু একেবারে যেন স্তম্ভিত হয়ে যায়।

"মাহিনা! তন্খা! আপনি বোলেন কি! এই মাহিনা দিয়ে আপনার মাফিক এত্‌না বড়া আদমিকে হামি তক্‌লিফ দিবো! নেহি দিলীপবাবু, আপনি হামার কসুর মাফ্‌ কোরবেন। আপনার মাফিক অ্যায়সা সাধুজিকে ইয়ে ছোটা কামে লাগিয়ে আউর গুণাহ আমি কোরতে পারব না। হায় রাম! গঙ্গা পানি দিয়ে আমি নর্দমা সাফ্‌ কোরিয়েছি!"

দিলীপ হেসে বলে,—"নর্দমা সাফ্‌ কেন,—এ শহরে ওর চেয়ে নোংরা কাজও ত ওই জলে করান হয় জানি!'

"সে যাঁহা হোচ্ছে, হোতে দিন। হামি পারবো না।" দৌলতরাম তার দৃঢ়তা জানায়,—"আপনার যা তন্খা হোয়েছে আপনি লিয়ে যান, হামার কসুর আউর বঢ়াবেন না!"

"চাকরি তাহলে হামার খতম! সাচ্চা হওয়ার দাম নগদাই পেয়ে যাচ্ছি?"

থলি বার করে মাইনের পয়সা গুনে দিলীপের হাতে দিতে দিতে দৌলতরাম বলে,—'এইসা বাৎ বোলবেন না দিলীপবাবু। হামার বহুৎ ভাগ্‌ যে আপনি কৃপা কোরিয়ে কয় রোজ হামার উখ্‌ ধরিয়েছেন। এই লিন,—আপনার তিন দিনের রোজ ছে টাকা আউর আজ পৌনে এক বেলাকে দেড় রুপয়া। মোট সাড়ে সাত টাকা। হিসাব ঠিক আছে?"

দিলীপ পয়সাটা হাতে নিয়েও সামনে ধরে রেখে বলে,—"হিসাবে

কখনও আপনার ভুল হয়! কিন্তু জল না মেশানোর লোকসানটা আমার মাইনে থেকে কেটে রাখলে হত না!”

“রাম রাম!” দৌলতরাম লজ্জায় জিভ কাটে। “দিল কি হামার এতো ছোটা আছে? উ ছে গিলাসের লোকসান দশ গিলাসে উঠিয়ে যাবে। আচ্ছা নমস্তে।”

বোঝা যায় দিলীপকে এখন বিদায় দিতে পারলেই দৌলতরাম বাঁচে।

কিন্তু দিলীপের যেন মায়া এখনো কাটে নি। প্রতিনমস্কার করেও খানিক দাঁড়িয়ে থাকে সে। হঠাৎ বলে,—“আচ্ছা হিসাবপত্র এখন সব চুকে গেছে ত! আপনার সঙ্গে চাকরির সম্পর্ক আর নেই?”

“কিছু না!”—দৌলতরাম পরিষ্কার ভাবে জানায়।

“খুব ভালো!” বলে একটা সিকি টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে দিলীপ হুকুম করে,—“এখন এক গেলাস রস দিন দেখি!”

দৌলতরামের খানিকক্ষণের জন্যে বাক্‌রোধ হয়ে যায়।

দিলীপকে আবার ভালো করে বুঝিয়ে দিতে হয়,—“হ্যাঁ, এক গ্লাস রস! এখন আমি আপনার খরিদ্দার!”

দৌলতরাম প্রবল ভাবে আপত্তি জানায়—“আরে এ কি বলছেন! নেহি, নেহি, আপনার কাছে পয়সা লিবো কি? আপনি এমনি এক গিলাস পিয়ে যান!”

দিলীপ শক্ত হয়েই প্রতিবাদ করে,—“উঁহুঃ—মাগনা খাব কেন? নিজের রোজগারের পয়সায় খাওয়ার সুখ কি তাতে আছে? কি, দেবেন?”

বিমূঢ় বিহ্বল ভাবে দৌলতরাম মাটির গেলাসে খাঁটী রসই ভর্তি করে ঢেলে দিলীপের দিকে এগিয়ে দেয়।

দুই

দিলীপকে এখন একটু চিনে নেওয়া যায়।

চেহারার একটা আঁচ আগেই পাওয়া গেছে। কন্দর্পকান্তি নয়। দারুণ কিছু একটা বিশেষত্বও নেই। কিন্তু সবসুদ্ধ ছাড়িয়ে একটা বলিষ্ঠ শ্রী আছে,—মুখে চোখে একটা বুদ্ধির দীপ্তি।

চেহারায় না থাক চরিত্রে একটু বিশেষত্ব আছে, তা না হলে কলকাতার রাস্তায় আখ মাড়াই-এর কাজে তাকে দেখা যাবে কেন?

বি.এ-টা সত্যিই পাস করেছে, কিন্তু তার পর আর পড়াশুনা করবার সঙ্গতি ছিল না। তাই ডিগ্রীর কাগজটা হাতে পাবার আগেই রোজগারের চেষ্টায় বেরুতে হয়েছে।

বাপ-মা-মরা ছেলে, পিসীর কাছেই মানুষ হয়েছে। সেই পিসী মারা যাবার পর কোথাও কোনো আশ্রয় কি বন্ধন আর নেই। পিসীর অবস্থা এমন কিছু ভালো ছিল না। নিঃসন্তান বিধবা, স্বামীর সামান্য বিষয়-সম্পত্তিতে জীবনস্বত্ব নিয়ে ভাইপোকে কোনরকমে মানুষ করেছেন।

পিসী মারা যাবার পর সে সব বিষয়-সম্পত্তি পেয়েছে ভাসুর-পো দেওর-পোরা। তারা নেহাত খারাপ লোক নয়, সাধারণ দোষেগুণে গড়া মানুষ। ইচ্ছে থাকলে দিলীপ তাদের কাছে আশ্রয় একটা পেত। কিন্তু দিলীপ নিজেই পরের ঘাটের আলগা বাঁধন খুলে দিয়ে ভেসে পড়েছে।

ভেসে বেড়াচ্ছে তার পর থেকে আজ বছর তিনেক। কাজকর্ম যখন যেমন জুটেছে নিয়েছে। আবার বেকার হয়ে তাকে পথে পথেও ঘুরতে হয়েছে দিনের পর দিন। পাকা একটা কায়েমী কাজ যোগাড় করতে পারে নি এখনো।

কিন্তু দিলীপের চরিত্রের বিশেষত্ব এইখানে যে এই ছন্নছাড়া জীবনেও তার প্রাণের স্ফূর্তি মুখের হাসি শুকিয়ে যায় নি। হতাশ হতে যেন সে জানে না।

বেকার হয়ে কাজ না পেয়ে তার মনে আক্রোশও জমে না কারুর বিরুদ্ধে। কাজ নেই বলে বিক্ষোভটাই তার কাছে লজ্জার মনে হয়।

কে বলে কাজ নেই।

হপ্তাখানেক কাজের সন্ধানে বিফল হয়ে ঘুরে ঘুরে একদিন ক্লান্ত হয়ে চৌরঙ্গীর রাস্তায় এসে দাঁড়িয়ে সে যেন এই সত্যটা হঠাৎ আবিষ্কার করেছিল।

চারিদিকে তাকিয়ে দেখে সে অবাক হয়ে বুঝেছিল কাজের তো অন্ত নেই। রাস্তার ধারের ফেরিওয়ালা থেকে ঠেলাগাড়ি যে ঠেলছে বা রাস্তায় হ্যাণ্ডবিল বিলোচ্ছে সবারই তো হাজার রকম কাজ। কাজ নেই শুধু হয়ত তার, যে অফিসে পাখার হাওয়ার তলায় মোটা বাঁধান খাতায় কলম চালাতে চায়।

কাজ নেই বলে কাঁদুনি সে তাই কখনো গায় নি। কিন্তু সেই সঙ্গে এটাও সত্য যে কোন কাজেই টিঁকতে পারে নি বেশী দিন। ছোট বড় সব কাজেই কোথায় যেন এমন কিছু আছে যার সঙ্গে তার স্বভাবের বিরোধ বাধে। যেমন বেধেছে আজ। মেনে ও মানিয়ে নিতে এখনো পারে না বলেই এক দিন তাকে সব জায়গা থেকেই খসে পড়তে হয়, কোথাও গালমন্দ খেয়ে, কোথাও আজকের মত সশঙ্ক খাতির নিয়ে।

দৌলতরামের কাছে বিদায় নিয়ে দিলীপ খানিক এদিক্ ওদিক্ উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরে বেড়ায়। দম দেওয়া কলের মত যাদের জীবন ঘড়ির কাঁটা ধরে ছোটে তারা দুদণ্ডের জন্যে যেন আরামের নিঃশ্বাস নিতে এসেছে এখানে। কিন্তু দম দেওয়া কলের চাকা এখানেও থামতে চায় কই? খেয়াল মত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে দিলীপ নানা দলের নানান রকম কথাবার্তার উড়ো টুকরো শুনতে পায়। মনে হয় এই খোলা আকাশের নিচেও যে যার নিজের জীবনের বেড়া যেন সঙ্গে করে এনেছে। ফাটকা বাজারের ব্যাপারীকে তার তেজী মন্দী এখানেও তাড়া করে এসেছে। চাক্‌রেদের মনটা সেই অফিসের ফাইল আর বড়

সাহেব ছোট সাহেবের কচাকচির মধ্যেই পড়ে আছে। মেয়েরা এসেছে শাড়ি কাপড় আর গয়নার দোকানের বিজ্ঞাপন হয়ে।

এরই মধ্যে বেমানান প্রাণের দমকা হাওয়া যেন শুধু ওই রাস্তার আধা-ভিখিরী বকাটে বাউণ্ডুলে ছেলেগুলো। দমকা হাওয়া কিন্তু তাও শহরের অভিশাপে নির্মল কই? শহরের বিষাক্ত ধোঁয়ায় ধুলো বালি জঞ্জালে মেশানো।

তবু তাদের দেখে মনটা যেন একটু খুশী হয়।

কিন্তু করছে কি ছেলেগুলো?

রাস্তার ধারে এক ঠোঙা 'মশলা মুড়ি' কিনতে কিনতে দিলীপের ওপাশের একটা ফেরিওয়ালার ঠেলার দিকে চোখ পড়ে।

প্লাস্টিকের রং-বেরঙের গেলাস বাটি থালা ইত্যাদি ঠেলার ওপর সাজানো। কেউ দেখতে কেউ কিনতে ভিড় করে দাঁড়িয়েছে। বকা ছেলেগুলোও দাঁড়িয়েছে খদ্দেরদের-গা ঘেঁষে। কিছু সরাবার বা পকেট মারবার মতলবে নাকি?

একটি মেয়ে সেখানে চোখে পড়বার মত। সাজ-পোশাক সাধারণ, কিন্তু পাশ থেকে দেখলেও দেহের সুঠাম গড়ন মুখের শ্রী টুকুর আভাস পাওয়া যায়।

মেয়েটি দুটো বুঝি গেলাস কিনে হাতের ফুলতোলা কার্পেটের হ্যাণ্ডব্যাগটা খোলেন সেগুলো রাখবার জন্যে।

স্বাভাবিক কৌতূহলে দিলীপ লক্ষ্য করে দেখে যে গেলাসগুলো ভালো করে ভরে রাখবার জন্যে মেয়েটি হ্যাণ্ডব্যাগটার ভেতর থেকে কটা রঙচঙে বই বার করে ঠেলার ধারেই রাখছে। ছবিওয়ালা মলাট দেখেই বইগুলো যে ছোটদের তা বুঝতে দেরি হয় না।

অচেনা অজানা মেয়ে, তবু দিলীপের যা বয়স তাতে একটু জল্পনা মনে মনে না করে পারা যায় কি!

বইগুলি কার জন্যে?

ছোট ভাই না নিজেরই ছেলেমেয়ে?

মাথার সামনের দিকটা দেখা গেলে না হয় বোঝা যেত বিবাহিতা কি না। তবে সিঁদুরও ত আজকাল অনেকে শুধু নামমাত্র ছোঁয়ায়, আর ঘোমটাও সবাই কি দেয়!

দু-এক মুহূর্তের উড়ো ভাবনা।

মশলা মুড়ির দাম দিয়ে 'চেঞ্জে'র পয়সা বুঝে নেওয়ার পরই চোখ তুলে মেয়েটিকে আর দেখতে পায় না। বকাটে ছেলেগুলোও উধাও। জল্পনা-কল্পনাও সেই সঙ্গে শেষ।

কিন্তু ব্যাপারটার ঠিক ওইখানে ছেদ পড়ে না।

এদিক ওদিক ঘুরে এক জায়গায় একটা বেঞ্চে গিয়ে বসে।

হঠাৎ কাছেই বাচ্চাদের গলা আর হাসাহাসি তার কানে আসে।

মুখ ফিরিয়ে দেখতে পায় সেই বকা হাঘরে ছেলেগুলোই কি একটা নিয়ে হাসাহাসি করছে।

"আরে হাতী না, হাঁথী—হাঁথী! দেখছিস্ না হাঁথীর উপর চড়িয়ে শের মারতে আছে।"

ছেলেদের মধ্যে একজন মাতব্বর। বাংলা ভাষার ভবিষ্যৎ তার গলায় সে প্রচার করে' অন্যদের বোঝাচ্ছে।

কিন্তু ছেলেদের হাতে ওটা কি!

ছোটদের ছবির বই না?

ও বই এরা পেল কোথায়!

দিলীপের তৎক্ষণাৎ মেয়েটির সেই বই বার করা ও ছেলেগুলোর কাছ ঘেঁষে দাঁড়ানোর কথা মনে পড়ে যায়।

বেঞ্চি থেকে উঠে সে ছেলেদের জটলার দিকে এগোয়।

ছেলেগুলোর বই নিয়ে মজা তখনও সমানে চলেছে।

তাদের মধ্যে অজ্ঞ কে একজন বুঝি বলে,—"আরে এটা কি আছে রে? সাপ!"

উচ্চারণের এমন মারাত্মক ভুলের জন্যে তাকে মাতব্বরের কাছে ধমক খেতে হয়।

"ফির সাপ। সাপ বোলতে পারিস্ না! ইয়ে কোন্ সাঁপ আছে জানিস ?"

সাপ সম্বন্ধে সবাই অভিজ্ঞ। একজন তার পাণ্ডিত্য প্রকাশ করে—

"জানে, সব কোই জানে। ইয়ে ত করেৎ!"

মাতব্বর আবার ধমক দেয়,—"করেৎ! কভি দেখেছিস বুদ্ধু কাঁহাকা! আরে ইয়ে করেৎ নেই,—অজ্‌গর সাঁপ আছে—বহুৎ বড়া সাঁপ। একঠো হাঁথী ভি দিলে খেয়ে লিবে।"

অজগরের খাদ্য বিবরণে এবার দিলীপ বাধা দেয়—

"এই! এ বই কোথায় পেয়েছিস?"—বলে সে ধমক দিয়ে নিজের উপস্থিতিটা জানায়।

ছেলেদের দল প্রথমটা একটু হকচকিয়ে যায়। সবাই এক মশলায় তৈরী নয়। দু-চার জনের চোখে ভয়ের ছায়াটা লুকোন থাকে না।

কিন্তু গলা কাঁপলেও একটু তেজ না দেখালে মাতব্বরের মান থাকে কোথায়।

সে একটু রুখে দাঁড়িয়ে বলে,—"কোথা আবার পাব, 'মোল'-কে লিয়ে এসেছি দুকান থেকে!"

দিলীপ তার হাত থেকে বইটা এবার কেড়ে নিয়ে ধমক দেয়।

"দোকান থেকে কিনেছ হতভাগা! চল দেখাবি কোন্ দোকান থেকে কিনেছিস! নইলে পুলিসে ধরিয়ে দেব।"

ছেলেদের দলে বেশ একটা আতঙ্ক দেখা যায়। তবু মরিয়া হয়ে মাতব্বর শেষ চেষ্টা করে দেখে।

"এঃ, পুলিসে ধরিয়ে দেবে? কাহে? কিতাবে কারুর নাম লিখা আছে না কি!" একটু দম নিয়ে সে জোর গলায় দাবী করে,—"এ হামার কিতাব!"

"তোমার কিতাব!"—দিলীপ ছেলেটার ভয়-কাতর মুখের দিকে চেয়ে একটু হেসে বলে,—"তবে আয়, পড়। পড়ে শোনা!"

ছেলেদের অবস্থা এবার কাহিল।

আরো কাহিল হয় ইতিমধ্যে চারি ধারে যে কজন জড় হয়ে গেছে তাদের দরুন।

কলকাতার শহর। রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে ঘাসগুলোর দিকে খানিক মাথা নিচু করে চেয়ে থাকলে লোক জমে যায়। কি খুঁজছেন মশাই? সাপটাপ কিছু দেখেছেন নাকি! না না, টাকা হারিয়েছে নোট? ঘাসের শোভা দেখার অপরাধ যে করেছিল সে কেটে পড়বার পরও গুলতানি জমবে। গুজব ছড়াবে। কি হয়েছিল মশাই? কেউ বলবে, জানি না। ভিড় জমেছে তাই দেখছি। কেউ ইতিমধ্যে ফেনিয়ে ওঠা কল্পনাকে আরো মশলা যোগাবে। একটা ছোরা পড়েছিল। রক্তমাখা ছোরা!

দিলীপকেও এখন নানা প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়।

"কি হয়েছে মশাই?"

"চুরি করেছে তো!"

"দিন মশাই, বেশ উত্তম মধ্যম।"

"না না, নিয়ে যান থানায়! এ শয়তান বিচ্ছুকে আর বাড়তে দিতে নেই।"

থানায় দেওয়া না হাতের সুখ করা কোন্‌টা প্রশস্ত তাই নিয়ে তর্ক বেধে যায়।

"কিন্তু চুরি যখন করেছে……" মন্তব্য সুরু করেন একজন মুরুব্বী গোছের ভদ্রলোক।

ছেলেগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে দিলীপ এবার প্রতিবাদ জানায়।

"না, চুরি করবে কেন।"

"সে কি, চুরি করে নি?"—জনতার কেউ কেউ বেশ হতাশ হন।

"না চুরি করে নি।" দিলীপ তাঁদের আরো আশাভঙ্গ করে, —"একজন ভদ্রমহিলা ভুলে ফেলে গেছেন। ওরা কুড়িয়ে পেয়েছে তাই ফিরিয়ে দিয়ে আসতে বলছি।"

ছেলেগুলোকে দিলীপ এবার হুকুম করে—"যা শীগগির ফিরিয়ে

দিয়ে আয়। বেশী দূর উনি বোধ হয় এখনো যান নি। ট্রামের স্টপেজে ছুটে যা আগে।"

ছেলেদের আর দুবার বলতে হয় না। কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে একবার তাকিয়ে দলের মাতব্বর বইটা নিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। তার সঙ্গে আর সবাই।

হতাশ ভাবে জনতার একজন বলেন,—"ছেড়ে দিলেন মশাই! বিশ্বাস করে ওদের কখনো ছেড়ে দেয়। নিজে থেকে ওরা ফেরত দেবে মনে করেন!"

দিলিপ একটু হেসে জবাব দেয়,—"দিতেও তো পারে। অন্ততঃ আশা করতে ক্ষতি কি ?"

"ক্ষতি আর কি!" তিক্ত স্বরে একজন ফোড়ন কাটেন,—"একটা উঠ্‌তি চোর শহরে ছাড়া রইল এই যা!"

দিলীপ একটু থেমে কৌতুকের সঙ্গে এবার বলে,—"চোর কি ওই একটাই শহরে ছাড়া আছে ?"

দূর থেকে একদল নিজেদের মধ্যে কি রসিকতায় উচ্চৈঃস্বরে হাসতে হাসতে দিলীপের পাশ দিয়ে চলে যায়।

তাদের হাসিটা যেন তারই কথার উত্তর।

তিন

আখের রস চার আনা, আর মশলা মুড়ি দু আনা।

তা বাদে পকেটে এখন নগদ সাত টাকা দু আনা। তা মন্দ কি!

কিন্তু তাই নিয়ে কলকাতার একেবারে খাস সাহেবী রাস্তায় ঘোরাঘুরি করাটা একটু বোধহয় বাড়াবাড়ি।

দিলীপকে সেই রাস্তাতেই খানিকবাদে ঘুরতে ফিরতে দেখে তাই তার মতলবটা কি ভেবে একটু অবাক হওয়া স্বাভাবিক।

মতলব হয়ত কিছুই নয়, শুধু দেখে দেখে বেড়ানো।

রাস্তাটার আর যাই হোক এখনো জাত বজায় আছে। চৌরঙ্গী জাত কূল হারিয়েছে অনেক আগেই, কিন্তু এ রাস্তাটার কৌলীন্য এখনো খোয়া যায় নি। রাস্তাটা ফাঁকাও বটে অনেক। বড় বড় দোকান রকমারী ভাবে সাজানো। বড় বড় কাঁচের জানালার ভেতর দিয়ে আরেক জীবন-ধারার রুচি ও ঐশ্বর্য পরিচ্ছন্নভাবে ঘোষিত।

দিলীপের দৃষ্টি কিন্তু ঠিক সে দিকে নেই।

ফুটপাতের ওপর রঙের বাহার দিয়ে নারীদেহের নগ্নতাকেই মূলধন করে সাজিয়ে অজস্র বিদেশী বই কাগজ ছড়ানো।

সেখানে দিলীপ খানিক দাঁড়ায়। একটা-আধটা উল্টে-পাল্টে দেখে। আবার চলতে সুরু করে।

তারপর একটা দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে পড়ে।

দোকানের কাঁচের 'শো-কেস'-এর একটা কার্ড বোর্ডে কাটা ছবি তাকে দাঁড় করিয়েছে বলা যায়।

না, কোনো মোহিনী নারীমূর্তি নয়, ছবিটা সৌম্যদর্শন শুভ্র গুম্ফশ্মশ্রু বিমণ্ডিত এক বৃদ্ধের! বৃদ্ধ প্রসন্ন মুখে দেশলাই জ্বেলে তাঁর পাইপ ধরাচ্ছেন।

একটু ইতস্ততঃ করে দিলীপকে হঠাৎ এই দোকানেই ঢুকে পড়তে দেখা যায়।

ছোট দোকান কিন্তু পরিপাটী করে বিলাতী কায়দায় সাজানো। চারদিকের দেয়াল ধূমপানবিলাসীদের মহার্ঘতম উপকরণে সাজানো। আয়নার মত বুঝি মুখ দেখা যায়, এমন পালিশ করা কাউণ্টার। ফিট-ফাট শার্টপ্যাণ্ট-পরা দুজন কর্মচারী খদ্দেরদের তদারক করতে সেখানে দাঁড়িয়ে। দামী সাহেবী পোশাক পরা দুজন ভদ্রলোককে নিয়ে একজন কর্মচারী ব্যস্ত।

এ দোকানে তাকে কতখানি বেমানান যে লাগে তা দিলীপের অজানা নয়। যে কর্মচারীটির হাত খালি তার কাছে এগিয়ে যেতে চোখের দৃষ্টি ও দেহভঙ্গির তাচ্ছিল্যে সে সেটা আরো স্পষ্ট করেই বুঝতে দেয়।

কাউণ্টারে কনুইএর ভর দিয়ে আলস্যভরে দাঁড়ান অবস্থাতেই সে একবার ভুরু তুলে অবজ্ঞাভরে দিলীপের দিকে তাকায়। তারপর তাচ্ছিল্য ভ'রে জিজ্ঞাসা করে সংক্ষেপে—"Yes... ?"

দিলীপ অবজ্ঞাটা মর্মে মর্মে বোঝে কিন্তু অস্বস্তি একটু বোধ করলেও অপ্রস্তুত হওয়া তার কুষ্ঠিতে নেই।

"একটু পাইপের তামাক চাই।"—সে জানায়।

কর্মচারী যেমন ভাবে দাঁড়িয়ে ছিল সেই ভাবেই ঈষৎ বিদ্রূপের সঙ্গে বলে,—"Do you ? Brand ?"

ব্র্যাণ্ড! এবার দিলীপকে একটু ফাঁপরে পড়তে হয়। ব্র্যাণ্ড আবার কি ? পাইপের তামাক কত রকমের হয় তার জানাই ত নেই।

কথাটা তার মুখ দিয়েও বেরিয়ে যায়—"Brand !"

এবার কর্মচারীর মুখ দিয়ে ফিরিঙ্গি ঢঙে বাঙলা কথাই বেরোয়,—"হ্যাঁ কোন ব্র্যাণ্ড চান ?"

'শো-কেস'-এ সাজান বিজ্ঞাপনের ছবিটার দিকে একবার তাকিয়ে দিলীপ সমস্যাটা সমাধান করে ফেলে। ছবির তলায় যে নামটা লেখা সেইটাই চায়।

কিন্তু বিপদ তবু সম্পূর্ণ কাটে না! শুধু ব্র্যাণ্ডের নাম বললেই ত হয় না কোন্ মাপের কৌটো তাও জানানো দরকার। পকেটে যার সর্ব-

ছুটেছিলেন তিনি কাছে এসে উচ্চস্বরে বলেন,—"What's this ! আমি আগে ডেকেছি।"

ট্যাক্সি ড্রাইভার কিন্তু যেন তাঁকে দেখেও দেখে না। সসম্ভ্রমে দিলীপের দিকে চেয়ে বলে,—"উঠুন স্যার !"

দিলীপ উঠে বসতেই ব্যর্থ ভদ্রলোকের সমস্ত রাগ তার ওপরই গিয়ে পড়ে। অন্য দুজন প্রার্থীও তখন কাছে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দেন,—"আপনি উঠলেন যে বড় ! ট্যাক্সি হামনে আগে বুলায়া !"

দিলীপের কোন উত্তর দেবার দরকার হয় না। তার বদলে ট্যাক্সি ড্রাইভারই দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে বলে,—"বুলায়া তো ! কিন্তু মিটার যে ডাউন ছিল সেইটুকু শুধু নেহি দেখা ! ট্যাক্সি ওঁর জন্যেই 'এনগেজড' ছিল।"

"এনগেজড্ থা !" ব্যর্থ প্রার্থীরা একবার ট্যাক্সির মিটারের দিকে আর একবার দিলীপের চেহারা পোশাকের দিকে বিমূঢ় ভাবে তাকায়।

ট্যাক্সি তখন ছেড়ে দিয়েছে।

কলকাতার যে অঞ্চলের একটি নাতিপ্রশস্ত রাস্তায় ট্যাক্সি গিয়ে থামে এক কালে তার কিছু গৌরব যে ছিল বাড়িগুলির আয়তনে ও আকারে তার খানিকটা পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু সে পূর্ব গৌরব এখন ইতিহাস। বাড়িগুলির জীর্ণ চেহারায় অথর্ব বার্ধক্যের সুস্পষ্ট ছাপ।

অঞ্চলটার নিজস্ব কোনও রূপও আর নেই। রাস্তার পাঁচমিশেলী জনতা থেকেই বোঝা যায় দেশের নানা জাতি ও সম্প্রদায়ের মিশ্রণে এখানে ভাবীকালের নাগরিকতার একটা ছাঁচ তৈরী চলেছে।

ট্যাক্সি একটি জীর্ণপ্রায় সেকেলে বিলাতী ধরনের বাড়ির সামনে থামবার পর দিলীপ দরজা খুলে নেমে যায়।

হঠাৎ পেছন থেকে ট্যাক্সি-ড্রাইভারের কর্কশ কণ্ঠ শোনা যায়,— "ও মশাই, যাচ্ছেন কোথায় ? ভাড়াটা দেবে কে ?"

"ভাড়া!" দিলীপ অবাক হয়ে ফিরে দাঁড়ায়।

"হ্যাঁ ভাড়া!" ট্যাক্সি-ড্রাইভারের গলা বেশ চড়া,—"ট্যাক্সি চড়লে ভাড়া দিতে হয়,—তা জানেন না বুঝি।"

"ও Taxi fare!" দিলীপ যেন এতক্ষণ ব্যাপারটা বুঝতে পারে। তারপর মোলায়েম গলায় বলে,—"ভাড়া আমার খাজাঞ্চির কাছে পাবে।"

"খাজাঞ্চি! সে আবার কে!"—ট্যাক্সি ড্রাইভার জ্বলে ওঠে।

দিলীপ নির্বিকার ভাবে জানায়,—"খাজাঞ্চি জানো না! যাকে বলে Treasurer! আমার এস্টেটের ম্যানেজার।"

"না, না ওসব চালাকি রাখুন মশাই!" ট্যাক্সি-ড্রাইভার যেন ক্ষেপে যায়। "ভাড়া আমার এখুনি চাই। বার করুন এক টাকা দশ আনা।"

দিলীপ অত্যন্ত যেন ক্ষুণ্ণ হয়ে বলে, "এক টাকা দশ আনা! তারই জন্যে এত চেঁচামেচি! ছিঃ, তোমার লজ্জা হওয়া উচিত।"

ট্যাক্সি-ড্রাইভারকে লজ্জিত হবার বিধান দিয়ে দিলীপ সোজা এবার ভাঙা লোহার গেটটা ঠেলে ভেতরে চলে যায়।

রাস্তার দুটি ফিরিঙ্গি ছেলেমেয়ে সেখানে এসে দাঁড়িয়ে তখন মজা দেখছে।

একজন বলে,—"কেয়া, আজ ভি আপকা ভাড়া নেহি মিলা!"

ট্যাক্সি-ড্রাইভার বাড়িটার দিকে ডান হাতের মুঠিটা তুলে দুবার শাসিয়ে বলে,—"কাঁহা মিলা! আচ্ছা আমারও নাম কেষ্ট দাস। ভাড়া ফাঁকি দেওয়া আমি বার করে দেব।"

ভাড়া ফাঁকি দেওয়ার দুঃখেই বোধ হয় সে ছেলেমেয়ে দুটিকে বলে,—"আও উঠো। লেকিন খালি মেরা ঘর তক্।"

ছেলেমেয়ে দুটি তার কথা শেষ হবার আগেই তখন ভেতরে উঠে বসেছে।

বাইরেও যেমন ভেতরেও তেমনি বাড়িটাতে আগেকার শৌখিনতার কিছু কিছু চিহ্ন এখনো একেবারে লুপ্ত হয় নি।

ভাঙা লোহার গেট দিয়ে ঢুকলেই নিতান্ত ছোট একটা 'লন'। আগে তাতে বিলিতী ফুলের বাহার দেখা যেত। এখন খাবলা খাবলা শুকনো চেহারার ঘাস এখানে সেখানে। যত রাজ্যের অপ্রয়োজনীয় জিনিস এদিকে ওদিকে জমা করে রাখা হয়েছে। কোথাও টেবিলের ভাঙা পায়া, চেয়ারের উইয়ে খাওয়া হাতল, ছেঁড়া ক্যানভাসের পর্দা, কোথাও ভাঙা বালতি, ভাঙা কাগজ ফেলা ঝুড়ি, পচা তুলোর লেপ, ভাঙা ফুলদান।

এই আবর্জনাগুলোর ভেতরও আগের যুগের রুচি ও সচ্ছলতার কিছু সাক্ষ্য খুঁজলে পাওয়া যায়।

চওড়া দুচারটে ধাপ উঠেই সামনের হলঘর। দোতলার সিঁড়ি উঠে গেছে এক পাশ দিয়ে। এখানেও সেই জীর্ণতা ও দারিদ্র্যের ছাপ ঘরদোরের বহুদিনের সংস্কারহীন চেহারা থেকে আসবাবপত্র মিলে সবকিছুর ওপর। যে ছেলেমেয়েগুলি ওপরের সিঁড়ি দিয়ে নেমে আসছে তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ প্রসাধনের সমস্ত পারিপাট্য ভেদ করেও তা ফুটে বেরুচ্ছে। তাদের ভেতর ইঙ্গভারতীয় বাঙালী অবাঙালী সব রকম জাতি ও সম্প্রদায়ই আছে।

পোশাকে প্রসাধনে যেমনই হোক ছেলেমেয়েগুলি প্রাণোচ্ছল। দিলীপের সঙ্গে তাদের প্রীতির সম্পর্কটাও বোঝা যায়।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতেই দিলীপকে সাদর সম্ভাষণ জানায়।

"Good Evening দিলীপ!"

"Good Evening!" বলে দিলীপ একটু অগ্রসর হতেই একটি মেয়ে কাছে এসে হেসে বলে,—Aren't you rather early to-day?"

দিলীপ হেসে জবাব দেয়, "Yes, got home-sick suddenly?"

'Home-sick!'—ছেলেমেয়েগুলি হেসে ওঠে।

একটি ছেলে বলে,—"কিন্তু ঘরে ত এখন Cold war চলছে, না? বুড়ো যোশেফের সঙ্গে ত কথা বন্ধ।"

আর একটি মেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করে, "এবার কতদিন হল?"

'পাঁচ মাত্র!' বলে দিলীপ হাসে!

"For five whole days! Well don't give in before a week!" বলে হাসতে হাসতে তারা বেরিয়ে যায়।

দিলীপ পকেট থেকে চাবি বার করে হলের ডান ধারের একটি ঘরের তালা খুলে ঢোকে।

সেকেলে ধরনের বাড়ি বলে ঘরটি বেশ প্রশস্ত। আসবাবপত্র সবই অত্যন্ত পুরানো ও জীর্ণপ্রায় হলেও ঘরটিতে একটি রুচি ও পরিচ্ছন্নতার ছাপ আছে। কিন্তু রুচিটা কি জাতের নির্ণয় করতে গেলেই মুশ্‌কিল। ঘরের একদিকের চেহারা দেখলে বোঝা যায় সেখানে সবসুদ্ধ জড়িয়ে বিলাতী রুচিরই প্রাধান্য, আর একদিকে ঠিক তার উল্টো। একদিকে সেকেলে ও রঙচটা হলেও সোফা—খাট—এমন কি একটা ওয়ার্ডরোব দেখা যায়। আর একদিকে শুধু তক্তপোশ আর কাঠের ছোট দেরাজ ও আলনা। একদিকের দেয়ালে যীশু খৃষ্টের একটা বাঁধানো ছবি, আর দিকে দেয়ালে লাগান ব্র্যাকেটের ওপর শুকনো গাঁদা ফুলের মালা পরানো শ্রীকৃষ্ণের একটা মাটির মূর্তি। ও ছাড়া আরো অনেক কিছুতেই মনে হয় ঘরের দুধার যেন রেষারেষি করে পরস্পারের থেকে আলাদা হবার পাল্লা দিচ্ছে।

ভেতরে ঢোকবার পর দিলীপের ভাবগতিক কেমন সন্দেহজনক ঠেকে।

দিলীপ ঘরে ঢুকে প্রথমে আলোটা জ্বালে। তারপর এদিক ওদিক চেয়ে সন্তর্পণে ফুলের তোড়াটা একটা সোফার পেছনে লুকিয়ে রেখে তামাকের কৌটোটা অন্য দিকের দেরাজের ভেতর রেখে দেয়।

গায়ের শার্টটা ছেড়ে আলনায় টাঙিয়ে দিলীপ তার দিকের বন্ধ জানালা একটু খুলে দিতেই দমকা হাওয়ায় দেয়ালের ক্যালেণ্ডারগুলো থেকে ঘরের হাল্কা জিনিসপত্র তছনছ হবার উপক্রম হয়।

জানালাটা আবার বন্ধ করে ফিরে দাঁড়িয়েই দিলীপ হঠাৎ যেন দারুণ গম্ভীর হয়ে যায়। গম্ভীর কিন্তু অন্যমনস্ক। ঘরের ভেতর আর

কেউ যে এসে ঢুকেছে তা যেন তার খেয়ালই নেই। সে তৎক্ষণাৎ পেছন ফিরে হাত জোড় করে শ্রীকৃষ্ণের আরাধনায় যেন মগ্ন হয়ে যায়।

ঘরে যিনি ঢুকেছেন তাঁর মুখও সমান গম্ভীর। কোটপ্যাণ্ট-পরা মাঝবয়সী ভদ্রলোক। লম্বা চওড়া দশাসই চেহারায় যৌবনের স্বাস্থ্য ও শক্তির আভাস এখনও পাওয়া যায়। পোশাক-পরিচ্ছদের জীর্ণতা সত্বেও সবশুদ্ধ জড়িয়ে মানুষটির মধ্যে একটা প্রশান্ত ব্যক্তিত্বের ছাপ আছে।

প্রশান্তিটা এখন অবশ্য একটু বিচলিত।

গম্ভীর মুখে কোটটা খুলে রাখতে গিয়ে দেয়ালের একটা গোপিনীবেষ্টিত কৃষ্ণের ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডারের ওপর তাঁর দৃষ্টি পড়ে। তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করলে এখন টের পাওয়া যায় যে দুদিকের দেয়ালেই খড়ির দাগ দিয়ে ঘরটিকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে। সে দাগ এক দেয়াল থেকে সুরু করে মেঝের ওপর দিয়ে আরেক দেয়াল পর্যন্ত টানা। ছবি আঁকা ক্যালেণ্ডারটা দেয়ালের সেই ব্যবধান-রেখা একটু অতিক্রম করে এসেছে বলেই ভদ্রলোকের মুখে ভ্রূকুটির চিহ্ন।

ভদ্রলোক একবার পিছন ফিরে প্রার্থনামগ্ন দিলীপের দিকে তাকান, তারপর নিজের দিকের একটা টিপয়ে সজোরে কয়েক বার চাপড় মেরে শব্দ করেন।

দিলীপ ফিরে তাকিয়ে দেখে, তারপর নীরবে কাছে এসে দেওয়ালের দিকে তাকিয়ে ক্যালেণ্ডারটার সীমালঙ্ঘনের বেয়াদবি শুধরে দেয়। কিন্তু ভদ্রলোক জয়োল্লাসে পিছন ফিরতে না ফিরতেই টিপয়টা সশব্দে ঠেলে দিয়ে আশু পরাজয়ের শোধ নেয়। টিপয়টা একটু বুঝি দিলীপের ঘরের অংশের দিকে অনধিকার প্রবেশ করেছিল।

ভদ্রলোক চমকে ফিরে তাকান। এবার দিলীপের মুখই জয়োল্লাসে দীপ্ত। ভদ্রলোক কিন্তু সহজে হার মানতে রাজী নন। ঘরের ওপর তীক্ষ্ণভাবে দৃষ্টি বুলিয়ে প্রতিশোধ নেবার উপায়ও বার করে ফেলেন। দিলীপের তক্তপোশের ওপর গোটান বিছানাটা তার দিকের সীমান্ত একটু বুঝি পার হয়ে এসেছে।

কিন্তু ভদ্রলোক সেদিকে যাবার আগেই দিলীপ লাফ দিয়ে গিয়ে বিছানাটা টেনে নেয়।

এমন সুযোগটার সদ্ব্যবহার না করতে পেরে ভদ্রলোক বেশ একটু দমে যান। কিন্তু দিলীপের চালাকির পাল্টা জবাব দেবার কোন সুযোগ আর দেখতে পাওয়া যায় না।

দিলীপের দিকে অগ্নিদৃষ্টিতে একবার চেয়ে ভদ্রলোক নিরুপায় হয়ে এক জোড়া তাস নিয়ে এবার টেবিলের ওপর একা একা 'পেশেন্স' খেলতে বসেন।

টেবিলটা তাঁর অংশের একেবারে সীমানায় পাতা।

তাসগুলো তার ওপর পাতা হতেই দিলীপের মাথায় আরেক দুর্বুদ্ধি খেলে। হঠাৎ জানলার কাছে গিয়ে সে এক ধাক্কায় সেটা খুলে দেয়। সঙ্গে সঙ্গে দমকা হাওয়ায় তাসগুলো সব ঘরময় উড়ে ছত্রাকার।

তাসগুলো ধরে রাখতে গিয়ে বেসামাল হয়ে ভদ্রলোকের আর বাক্-সংযম থাকে না। তেলেবেগুনে জ্বলে উঠে তাঁর মুখ দিয়ে বেরিয়ে যায়—"You di—"

ওই স্খলনটুকুই দিলীপের পক্ষে যথেষ্ট।

দেয়ালের ক্যালেণ্ডারটাকেই যেন উদ্দেশ করে সে বলে,—"কেউ যেন কিছু বলছিল মনে হচ্ছে!"

ভদ্রলোকের দিক থেকে একটা নাসিকাধ্বনি শোনা যায় প্রত্যুত্তরে,—"ছোঃ"—তারপর তিনিও তাঁর টিপয়টাকে সম্বোধন করে বলেন,—"Is there anybody worth talking to here! কথা বলবার মত মানুষ ত চাই।"

দিলীপ একটা উপযুক্ত জবাব বোধ হয় দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু হঠাৎ আর একটা দমকা হাওয়ায় তার নিজের জিনিসপত্রই ওলটপালট হয়ে গোপিনী-বেষ্টিত কৃষ্ণ ধরাশায়ী হন।

এবার ভদ্রলোকের সশব্দ হাসিতে ঘর ফেটে যাবার উপক্রম।

গোমড়া মুখে দিলীপকেই এবার ক্যালেণ্ডারটা তুলে রেখে জানালা বন্ধ করতে ছুটতে হয়।

ভদ্রলোক তাঁর মেঝেয় ছড়ানো তাসগুলো কুড়োতে মন দেন।

তাস কুড়োতে গিয়েই সোফার পেছনের ফুলের তোড়াটা চোখে পড়ে। অবাক হয়ে সেটা তুলে নিয়ে তিনি খানিক ভ্রূকুঞ্চিত করে দাঁড়িয়ে থাকেন। তারপর টেবিলটাকে সম্বোধন করে বলেন,—"আমার ঘরে এ ফুল এল কোথা থেকে? I never bought them!"

গলাটায় বিরক্তির সুর দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও মুখের প্রসন্নতাটা লুকোন যায় না।

"Miracles sometimes happen! দুনিয়ায় কত তাজ্জব ব্যাপারই তো ঘটছে"—দিলীপ তার বিছানাটাকে শোনায়।

"কিন্তু আমি জানতে চাই, এ ফুল আমার ঘরে আনার মানে কি? এ কার কাজ?"—ভদ্রলোক সোফাসেটিগুলোকেই ধমকান।

"কোনো আহাম্মকের নিশ্চয়!" দিলীপ তার আলনাটাকে বুঝিয়ে দেয়। "নইলে ফুল পেয়ে যার এত মেজাজ, তিন কুলে তার কে আছে ফুল এনে দেবার।"

"নেই ত হয়েছে কি। Joseph Tandon doesn't need anybody।" যোশেফ সাহেব ওয়ার্ডরোবটাকে সাফ্ কথা শুনিয়ে দিয়ে পাল্টা জিজ্ঞাসা করেন,—"তিন কুলে তোমার কে আছে?"

ওয়ার্ডরোবটার হয়েই বোধ হয় দিলীপ জবাব দেয়, "আমারও কেউ নেই!" তার পর সোজাসুজি যোশেফের দিকেই ফিরে বলে, "But don't shout and get excited! মিছিমিছি চেঁচামেচি করতে আপনাকে কতবার বারণ করেছি!"

"বারণ করেছ!" যোশেফও এবার সোজা দিলীপের দিকে ফিরে দাঁড়ান। "Who are you to order me! আমার যেমন খুশি আমি shout করব। তোমার বারণ আমায় শুনতে হবে?"



"আমার নয়, ডাক্তারের।" দিলীপের গলায় এখন গাম্ভীর্য, "Blood pressureটা বেড়ে stroke হলে সামলাবে কে ?"

"তোমায় সামলাতে হবে না।" যোশেফ জানিয়ে দেন অবজ্ঞাভরে, তারপর আবার গলা চড়িয়ে বলেন,—"stroke যদি হয় ত হবে তোমার জন্যে। পয়সা দিয়ে এ ফুল কেনবার কি দরকার ছিল তোমার ! ফুল কেনার নবাবি ত করেছ, চোদ্দ মাস এ ঘরের ভাড়ার share দাও নি তা মনে আছে ?"

"I protest !" দিলীপ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানায়, "আপনার হিসেব ভুল !"

"আমার হিসেব ভুল ?" যোশেফ আগুন হয়ে ওঠেন,—"এই চোদ্দ মাসে কবে তুমি কি দিয়েছ ?"

"কিছুই দিই নি !" অম্লান বদনে জানায় দিলীপ, "তবে চোদ্দ নয় সতেরো মাস !"

যোশেফ কয়েক সেকেণ্ডের জন্যে হতভম্ব হয়ে যান। তার পর হতাশভাবে যেন হাল ছেড়ে দিয়ে বলেন,—"ওঃ Hopeless, তুমি একটা worthless loafer নয় একটা fool, একটা idiot!" হতাশভাবে বলতে বলতে যোশেফের মেজাজ আবার একটু করে চড়তে থাকে। একটু থেমে বলেন,—"চৌদ্দ হোক, সতেরো হোক তোমায় এক মাসেরও ভাড়া দিতে হবে না। You please get out—তোমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখতে চাই না!"

বক্তব্যের শেষে বিস্ফোরণটুকু ঘটে, সমস্ত রোগের হেতুটুকু যেন তিনি জানিয়ে দেন,—"You are a Hindu!"

"And you are a Christian!" অম্লান বদনে দিলীপ জবাব দেয়,—"কি চমৎকার Combination বলুন ত। Blendও বলতে পারেন।" পকেট থেকে তামাকের টিনটা বার করে দিয়ে দিলীপ সকৌতুকে জানায়,—"যেমন এইটে!"

"কি ওটা?" যোশেফ প্রথমে অবাক হয়ে চেয়ে থাকেন। দিলীপ কৌটোটা তাঁর হাতে গুঁজে দিতে একটু বিমূঢ়ভাবেই বলেন,—"এ ত ভালো পাইপের তামাক দেখছি! তুমি কোথায় পেলে?"

দিলীপ নিজের বিছানাটা গুছোতে ব্যস্ত হয়ে যেন তাচ্ছিল্যভরে বলে—"দোকানে!"

"দোকানে ত জানি!"—যোশেফের গলা এখনো প্রসন্ন নয়,—"কিন্তু পয়সা দিয়ে কিনেছ, না just shop-lifting?"

"Shop-lifting-ই যদি হয়, তাহলে for a worthy cause!"—দিলীপের বেশ রহস্যজনক ভাব।

"Worthy cause! কি সেটা?"—যোশেফ ভুরু কোঁচকান।

দিলীপ ক্যালেণ্ডারের দিকে দেখিয়ে একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে,—

"আজকের তারিখটার আমার কাছে বিশেষ একটু দাম আছে কি না! অত্যন্ত বদমেজাজী বেয়াড়া easily inflammable impossible এক old dear এই দিনটিতে নাকি আমাদের ধরাধাম ধন্য করেছিলেন!"

যোশেফকে এবার নিজেকে সামলাতে একটু কাশির সাহায্য নিতে হয়। ভেতরে তখুনি গলে গেছেন কিন্তু বাইরে তা দেখালে চলে কি করে! একটা মৃদু নাসিকা-ধ্বনি করে বললেন,—"হুঁঃ—you mean it's my birthday! কিন্তু—কিন্তু—" আবার গলাটা চড়েই ওঠে, "কিন্তু birthday বলে তোমার—ওই চুরি করা present আমি নেব মনে করো!"

"চুরি নয়—! বাটপাড়ি নয় রাহাজানি নয়!"—দিলীপ তাঁকে আশ্বস্ত করে—"দস্তুর মত নগদ গ্যাঁটের পয়সা খরচ করে কেনা!"

"পয়সা!"—যোশেফের গলায় অবিশ্বাস,—"পয়সা তুমি পেলে কোথায়?"

"পেলাম কাজ করে!"

"কাজ!" আবার যোশেফের মেজাজ গরম হয়ে ওঠে,—"বলতে তোমার লজ্জা করে না! Worthless loafer! একটা গ্র্যাজুয়েট হয়ে আজ দুবছর কোনো চাকরি তুমি যোগাড় করতে পেরেছ!"

"I have to correct you again uncle Joseph"—দিলীপ গম্ভীর-ভাবে জানায়—"এই দু বছরে আমি অন্ততঃ বিশ রকম কাজ করেছি! Icecream Vendor থেকে দাঁতের মাজন বিক্রী,—বাস-কণ্ডাক্টারী থেকে আখমাড়াই কিছুই বাদ দিই নি।"

"এগুলোকে তুমি কাজ বলো! Are they worthy of you?"

"I am ashamed of you uncle Joseph!"— এবার দিলীপের স্বর সত্যিই ক্ষুণ্ণ,—"আপনি একথা বলবেন আমি ভাবি নি! গ্রাজুয়েট হয়েছি বলে, টেবিলে বসে কলম পেষাই কি আমার কাজ!"

একটু চুপ করে থেকে দিলীপ সোজাসুজি আঘাত দিয়ে বলে,—"আপনিও ত ইঞ্জিন-ড্রাইভারি থেকে পুলিস সার্জেণ্টগিরি, অনেক কিছু করেছেন। Are you ashamed of it ?"

যোশেফ সগর্বে বলেন,—"Of course not !"

"That's the spirit, uncle !"—দিলীপের মুখে হাসি দেখা যায়। "কাজের একটা গর্ব থাকা দরকার ! সে কাজ যেমনই হোক !"

যোশেফ একটু নরম হলেও একেবারে ছেড়ে দেন না ! বলেন, "বড় বড় বুলি তো খুব আওড়াতে শিখেছ ! কিন্তু why can't you stick to any work ? ছোট বড় কোনো কাজে টিঁকে থাকতে পারলে ?"

"না, তা আর পারছি কই ?" দিলীপ স্বীকার করে,—"তবে দোষটা আমার না দুনিয়ার তাই বোঝবার চেষ্টা করছি !"

যোশেফের আবার বুঝি পিত্তি জ্বলে যায়,—"তুমি কাজে টিঁকতে পারো না, সেটা দুনিয়ার দোষ ?"

দিলীপ একটু হেসে বলে,—"তা হতেও তো পারে ! ইস্‌ক্রুপের প্যাঁচে সোজা পেরেক আঁট হয়ে বসতে পারছি না। তাই প্যাঁচালো ইস্‌ক্রুপ সব তুলে ফেলতে হবে।"

"May I not live to see that day !"—যোশেফ তাঁর ভীতিটা স্পষ্টই জানিয়ে দেন,—"তোমাদের পাল্টানো দুনিয়া আমায় যেন দেখতে না হয় !"

"দেখতে হয়ত আমারও পাবো না, কিন্তু আশা ছাড়বো কেন ?" বলে দিলীপ হাসে।

যোশেফ প্রসঙ্গটা আর না বাড়িয়ে বলেন,—"আচ্ছা এখন একটা কাজ করো দেখি ! এই টিনটা দোকানে ফেরত দিয়ে এসো !"

দিলীপ অবাক হয়ে বলে,—"ফেরত দিয়ে আসব ! ফেরত দিয়ে দাম চেয়ে আনব আবার ?"

"হ্যাঁ তাই আনবে। ক' পয়সা রোজগার করেছ শুনি ! নিজের

গায়ের একটা ভালো জামা যার নেই—বড়মানুষি দেখিয়ে জন্মদিনের উপহার দেবার বেয়াড়া শখ তার কেন ?"

"শখ ত বেয়াড়াই হয় uncle !"—দিলীপ গম্ভীর হয়ে বলে,—"বেয়াড়া আর বেহিসাবী। অনায়াসেই যা মেটানো যায়, সে শখের আর দাম কি ?"

একটু চুপ করে থেকে সে ভিন্ন স্বরে বলে,—"যাক্ আমার present যদি না নিতে চান নেবেন না ! তবে ভেবেছিলাম চলে যাবার আগে আপনার মুখখানা একটু ধোঁয়াটে দেখে যাব। তা আর হল না।"

যোশেফ দস্তুর মত বিচলিত হয়ে পড়েন। তবু নিজেকে সামলাবার চেষ্টা করে বলেন,—"তুমি,—তুমি—So you are thinking of leaving this place !"

"ভাবছি নয়, সত্যিই চলে যাব ঠিক করেছি। আর কতকাল আপনার গলগ্রহ হয়ে থাকব।"

যোশেফের মুখ দিয়ে খানিক কথা বার হয় না। তারপর গলাটা একটু কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে তিনি নির্বিকার ভাবে বলবার চেষ্টা করেন,—"Thank you for your consideration ! তা যাচ্ছ কোথায় ?"

প্রশ্নটা নেহাত যেন করতে হয় বলেই করা।

দিলীপ সেই ভাবেই জবাব দেয়,—"জানি না। যা হোক একটা আস্তানা খুঁজে বার করতে হবে !"

যোশেফের নির্লিপ্ততা আর বজায় থাকে না। বেশ একটু ঝাঁঝের সঙ্গেই তিনি বলেন,—"তোমায় আস্তানা দেবার জন্যে শহরের সবাই Reception Committee সাজিয়ে বসে আছে বোধ হয় !"

"বিদ্রূপ আপনি করতে পারেন uncle !"—দিলীপের স্বরে একটু বেদনার আভাস,—"কিন্তু সত্যিই এখানে তো আর থাকা যায় না। আপনার সঙ্গে কোন সম্বন্ধ নেই তবু যা আপনি করেছেন…"

কথাটা দিলীপ শেষ করতে পারে না। কিছুই যেন আসে যায় না,

এই ভাবে যোশেফ বাধা দিয়ে বলেন,—"If you want to express your gratitude for that, do by all means, but don't forget to get out as early as possible !"

"হ্যাঁ কাল সকালেই যাব ঠিক করেছি।" বলে দিলীপ হাসে।

"খুব ভালো ! কোন মত বদল যেন আর না হয়।" বলে যোশেফ কিন্তু ঘর থেকে বেরিয়ে যান। যেন এখন থেকেই দিলীপের আর তিনি মুখদর্শন করতে চান না।

* * *

পরের দিন বেশ সকালেই দিলীপের ঘুম ভাঙল। কিন্তু বিছানা থেকে উঠে সে অবাক। যোশেফ এত সকালে উঠে গেলেন কোথায় ! দিলীপের খুব ভোরে ওঠাই অভ্যাস, কিন্তু যোশেফ বিছানায় শুয়ে শুয়েই বেশ বেলা পর্যন্ত কাটাতে ভালোবাসেন। খবরের কাগজটা তন্নতন্ন করে সব কটা পাতা পড়ে বার দুই চা খেয়ে তবে তিনি বিছানা ছাড়েন।

কিন্তু আজ হঠাৎ তাঁর হল কি ? তাঁর টুপি ও লাঠিটা যথাস্থানে না দেখে বোঝা গেল যে বাড়ির বাইরে তিনি গেছেন।

ঘরের দরজাটা খুলতে গিয়ে দিলীপ আরো অবাক হল।

দরজাটা বাইরে থেকে তালা বন্ধ !

প্রায় ঘণ্টাখানেক বাদে বাইরে থেকে সে তালা খোলবার আওয়াজ পাওয়া যায়। দিলীপ তখন বিছানায় শুয়ে একটা বই পড়ছে।

তালা খুলে যোশেফই ঘরে ঢোকেন। দিলীপের দিকে যেন তাঁর দৃষ্টিই নেই এমনভাবে লাঠিটা কোণে রেখে, টুপি খুলে তিনি নিজের দিকের চেয়ারে গিয়ে বসে জুতোটা খোলায় মন দিলেন।

সকৌতুকে তাঁর ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করে দিলীপ একটু হেসে এবার জিজ্ঞাসা করলে,—"আপনি দরজায় তালা দিয়ে গেছলেন ?"

"হ্যাঁ গেছলাম।'—যোশেফ এ প্রশ্নে যেন চটে যান,—"তালা দিয়ে যাব না তো কি দরজা খুলে রেখে যাব চোর-ছ্যাঁচোড়ের জন্যে ? তুমি তো তখন ঘুমোচ্ছো।"

"তা আমায় জাগিয়ে দিলেই পারতেন! তা ছাড়া অত ভোরে ত কখনো ওঠেন না আপনি। আজ হঠাৎ কি এমন দরকার পড়ল!"

"That's none of your business! তুমি—তুমি কি করছিলে এতক্ষণ? জিনিসপত্র তো কিছুই গোছানো হয় নি দেখছি।"

দিলীপ একটু হেসে বললে—"না। গোছানো আর হল কই!"

যোশেফের মুখের ভাব আর গলার স্বরে এবারে আর কোন মিল রইল না। মুখের খুশি গলার রূঢ়তায় ঢাকবার বৃথা চেষ্টা করে তিনি বললেন, "ওঃ তার মানে মতলব এখন বদলেছে!"

হাসি চেপে দিলীপ বললে,—"তাই ধরে নিতে পারেন।"

"হু"—যোশেফ যেন তিক্ত স্বরেই বিদ্রূপ করে বললেন,—"আমি আগেই জানতাম! এমন Free board আর lodging কোথায় আছে, যে যাবে!"

দিলীপ কিন্তু এবারে আর হাসি চাপতে পারলে না। হাসতে হাসতেই বললে, "শুধু কি Free board and lodging, এমন absurd, hopeless, helpless old dear of an uncle পাব কোথায়?"

যোশেফের মুখখানা এবার দেখবার মত। কিন্তু বিহ্বল অবস্থাটা জোর করে কেশে আর কত সামলান যায়। শেষকালে ধমক দিয়ে তাঁকে নিজের মর্যাদা রাখতে হল,—"Don't be silly and sentimental! তোমাদের হিন্দুদের ওই এক দোষ!"

ধরা গলায় কড়া ধমকটা দিয়ে যোশেফ নিজের দুর্বলতার সাফাই গাইলেন,—"তোমাকে আমি এমনি থাকতে দিলাম মনে করেছ! I want back all I have spent on you! তুমি হট্ করে পালিয়ে গেলে আমার টাকাগুলো যে মারা যাবে!"

এ যুক্তির তারিফ্ করে দিলীপ বললে,—"তাইত, এ বুদ্ধিটা ত আমার মাথায় আসে নি! কিন্তু আপনার দেনা শোধ করবার মত কাজ যে একটা দরকার! নইলে চিরকাল আটক থাকতে হবে যে!"

"পাবে। পাবে!" যোশেফ ভরসা দিয়ে বললেন,—"Do you believe in lucky trinkets?"

"মানে Talisman গোছের কিছু? যাতে ভাগ্য ফিরে যায়?" দিলীপ আগ্রহের ভান করে বললে—"আছে না কি এমন কিছু?

"আছে বই কি!" সানন্দে আশ্বাস দিয়ে যোশেফ তাঁর পুরানো ট্রাঙ্কটা খুলে হাতড়াতে সুরু করলেন। সারা জীবনের দরকারী অদরকারী নানা বিচিত্র জিনিসের তলা থেকে তার পর যা তিনি বার করলেন সেটি কোন অজানা অক্ষর খোদাই করা ছোট একটি চাকতি গোছের জিনিস। সরু একটা ছোট চেনে ঝোলানো।

সগর্বে দিলীপের হাতে সেটা দিয়ে তিনি বললেন, "This is my most prized prossession! আজ এইটে নিয়ে বেরোও দেখি। দেখি ভাগ্য ফেরে কি না! It can never fail."

দিলীপ সেটা হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল।

যোশেফ একটু অস্বস্তির সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কি, তোমার বিশ্বাস হচ্ছে না?"

"খুব হচ্ছে!—ধীরে ধীরে দিলীপ বললে,—"আমি জানি এ জিনিস কখনো ব্যর্থ হতে পারে না।"

শুধু গলাটাই তাব ধরা নয়, চোখ দুটোও কেমন যেন সজল।

যোশেফ খুড়োর দেওয়া ট্যালিস্‌ম্যানের গুণ বুঝতে কিন্তু সারাদিন কেটে যায়।

সারাদিন বুড়ো যোশেফের মানরক্ষার জন্যেই দিলীপ চেষ্টার কিছু ত্রুটি করে নি। চাকরি পাওয়ার চেয়ে uncle যোশেফের মুখে একটু হাসি ফোটাবার আগ্রহই তার অনেক বেশী। তাঁর দেওয়া বিলিতী কবচ যে কিছুতেই ব্যর্থ হতে পারে না এ প্রমাণ তাকে করতেই হবে।

তাই প্রমাণ করতে সে না গিয়েছে এমন জায়গা নেই, না করেছে এমন চেষ্টা নেই।

কিন্তু ফল কিছুই হয় নি।

কোথাও দরোয়ানই হটিয়ে দিয়েছে কড়া মেজাজে, "নেহি, হিঁয়া কুছ কাম নেহি। ঝামেলা মৎ করিয়ে।"

কোথাও অভ্যর্থনাটা ওর চেয়ে ভালো হয়েছে। কিন্তু বেশ সহানুভূতির সঙ্গে সব শুনে-টুনে কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তি দুঃখ জানিয়ে বলেছেন,—"কি করব বলুন। আমাদের লোক এর মধ্যেই নেওয়া হয়ে গেছে!"

"এর মধ্যেই!" দিলীপ অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করেছে,—"আপনাদের বিজ্ঞাপন ত মাত্র কাল বেরিয়েছে। Interview-এর তারিখই ত তাতে আজ বলে দেওয়া ছিল।"

কর্তাব্যক্তি একটু বেকায়দায় পড়ে এবার অমায়িক ভদ্রতার মুখোশ আর রাখতে পারেন নি। একটু বিরক্ত স্বরেই বলেছেন,—"মাপ কববেন, আপনার সঙ্গে অফিসের পরিচালনা নিয়ে আলাপ করবার সময় নেই। আমাদের লোক নেওয়া হয়ে গেছে এইটুকুই জানালাম।"

যে ভাবে তিনি তারপর বেয়াবার জন্যে বেল টিপেছেন তাতেই দিলীপকে বুঝিয়ে দেওয়া হয়েছে যে তার এখন বিদায় নেওয়াই ভালো।

কোথাও এই আলাপের সুযোগটুকুও মেলে নি। সিঁড়ি দিয়ে বিজ্ঞাপিত অফিসে পৌঁছোতে না পৌঁছোতে বেয়ারা এসে No Vacancy-র নোটিশ দরজায় টাঙিয়ে দিয়ে গেছে।

মরিয়া হয়ে দিলীপ সম্ভব অসম্ভব কোনো জায়গায় হানা দিতে বাকি রাখে নি।

বড় বইএর একটা দোকান চোখে পড়েছে রাস্তায় যেতে। সেখানেই ঢুকে পড়েছে।

দোকানের একজন কর্মচারী এগিয়ে এসেছে—"কি চাই!" বলে।

দিলীপ এদিক ওদিক চেয়ে বলেছে,—"আপনারা ত সব রকম বইই রাখেন।"

দোকানের মালিকই বোধ হয় কাউণ্টারের একধারে উঁচু চেয়ারে সমাসীন। তিনি খুশি হয়ে এবার আলাপের ভার নিয়েছেন,—"আজ্ঞে

আমাদের মত stock খুব কম দোকানেই আছে। কি চাই বলুন। না থাকলে আনিয়েও দিতে পারি।"

"না, আনাতে কিছু হবে না!" দিলীপ একটু ইতস্ততঃ করে বলেই ফেলেছে, "আচ্ছা আপনাদের দোকানের কাজ যে রকম বেশী, একজন উপরি লোক নিতে পারেন না?"

মালিকের মুখে প্রথমে বিমূঢ়তা তার পরে রাগ দেখা দিয়েছে—"আপনি কি সেই পরামর্শ দিতে এসেছেন!"

"না, না, আমি বলছিলাম কি, আমি আপনাদের যে কোন কাজ করতে প্রস্তুত! একবার পরীক্ষা করেই দেখুন না!"

দোকানে ইতিমধ্যে অন্য খদ্দের এসেছে। মালিক সেদিকে মনোযোগ দেবার আগে সংক্ষেপে তীব্র স্বরে শুধু বলেছেন,—"যান বেরিয়ে যান।"

দিলীপকে সে আদেশ মানতেই হয়েছে তার পর।

কোথায় যাবে এবার?

সামনে চোখে পড়লে যে কোন জায়গায়।

মস্ত বড় বাড়ি তৈরী হয়েছে। কংক্রিটের বাড়ি হবে, তারই ইস্পাতের কঙ্কাল জোড়া হচ্ছে। হাতুড়ির আওয়াজে কান ঝালাপালা। সুরকি সিমেণ্ট বালির গাদা এধারে ওধারে। তারই মধ্যে কনট্রাক্টরের প্রকাণ্ড বিজ্ঞাপনের বোর্ড টাঙান।

সেখানেও দিলীপ একবাব ঢুঁ মেরে দেখে।

সোলার হ্যাট মাথায়, খাকী শার্ট-পরা রুক্ষ রোদে পোড়া আধবুড়ো চেহারার ইঞ্জিনীয়ারই বোধ হয় মিস্ত্রীদের কি বোঝাচ্ছেন।

দিলীপ গিয়ে পাশে দাঁড়ায়।

খানিক বাদে একজন মিস্ত্রীরই চোখ পড়ে তার দিকে। ইঞ্জিনীয়ারের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে, "এ বাবু আপনাকে কিছু বলবেন বোধ হয়।"

ইঞ্জিনীয়ার তার দিকে একটু বিস্মিত মুখেই ফেরেন,—"হাঁ বলুন, কি বলবেন!"

"একটা কাজ!"

"কাজ, কি কাজ?" ইঞ্জিনীয়ারের ভুরু কপালে ওঠে।

"যে কোন কাজ! রাজমিস্ত্রীর কাজটা অবশ্য শিখি নি। কিন্তু বলেন তো যোগাড় দিতে পারি।"

ইঞ্জিনীয়ার এবার সকৌতুক দৃষ্টিতে দিলীপের দিকে তাকান। আজ যোশেফ খুড়োর পেড়াপীড়িতে দিলীপকে বাধ্য হয়ে তাঁর একটা ভালোগোছের প্যাণ্ট শার্টই পরে বেরুতে হয়েছে! গায়ে মানাবার জন্যে যেটুকু অদল-বদল দরকার যোশেফই করে দিয়েছেন।

ইঞ্জিনীয়ার সাহেবের দৃষ্টিতে দিলীপও নিজেকে দেখতে পায়। এই পোশাকে রাজমিস্ত্রীর যোগাড়ে হবার দরখাস্তটা পরিহাসের মতই শোনাচ্ছে বটে!

ইঞ্জিনীয়ার সাহেব রসিক ব্যক্তি, সহৃদয়ও বটে। প্রথমে হেসে বলেন, "কিন্তু এই পোশাকে ঘেঁসের কড়াই মাথায় নিয়ে ভারা বেয়ে উঠতে একটু অসুবিধে হবে না?" তার পর তাঁর গলার স্বর বদলে যায়,—"আপনাকে কাজ দিতে পারলে সত্যি খুশি হতাম। কিন্তু বিশ্বাস করুন কোন উপায় নেই। আপনি—আপনি বরং—" হাতের নোট বইটা থেকে পাতা ছিঁড়ে তাতে একটা ঠিকানা লিখে দিলীপের হাতে দিয়ে বলেন,—"এইখানে একবার চেষ্টা করে দেখতে পারেন। যে কোন কাজ আপনি নিতে প্রস্তুত বলেই এটা দিলাম।"

ছেঁড়া একটু কাগজের চিরকুট। কিন্তু সারাদিনের ব্যর্থতার গ্লানি যেন তাইতেই অনেকখানি কেটে যায়। মুখে ধন্যবাদ জানাতে দিলীপের বাধে। চোখের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতাটুকু জানিয়ে সে চলে আসে। মনে যেন সে নতুন করে একটা ভরসা পায়। না চাকরি পাবার ভরসা নয়। পৃথিবী এখনো সবটাই যে সিমেণ্ট মোড়া হয়ে যায় নি, এখনো তার কোণে কানাচে নানান ফাটলে সবুজের ছোঁয়া আছে সেই ভরসা।

চিরকুটে লেখা কাগজে অবশ্য কিছু কাজ হয় না। শুধু একটু ভদ্র জবাব মেলে,—"অত্যন্ত দুঃখিত!"

কুছপরোয়া নেই। দিলীপ কিন্তু দুঃখিত নয়। যোশেফ খুড়োর ট্যালিসম্যান জাগ্রত্ হয়ে উঠবেই। চেনটা আঙুলে ঝুলিয়ে দিলীপ সেটা ঘোরাতে ঘোরাতে রাস্তা হাঁটে!

বড় রাস্তায় এসে পড়েছে।

সামনে একটা দেশী রেস্তোরাঁ। রেস্তোরাঁর নাম ডাক আছে নিশ্চয়। দরজাতেই লোকজনের ভিড়। ভেতরেও সব টেবিল প্রায় ভর্তি। বেশ হট্টগোল ও বিশৃঙ্খলা। বেয়ারারা সামলাতে পারছে না। খদ্দেররা চেঁচামেচি করছে।

শুধু গলায় কাজ হবার নয় বলে একজন টেবিলটাই চাপড়াচ্ছেন। একজন বেয়ারা ভেল্কিবাজির মত এক হাতে পরপর তিন-চারটি ডিশ ও আরেক হাতে গেলাস নিয়ে পাশ দিয়ে যাবার সময় তিনি হুঙ্কার দিলেন—"কি হল কি? আধ ঘণ্টা অর্ডার দিয়ে বসে আছি।"

আরেক জন অন্যদিক থেকে টিপ্পনি কাটলেন,—"ছুরি কাঁটা ত ঢুকতে না ঢুকতে সাজিয়ে দিয়ে গেলে। ওই ছুরি কাঁটাই চিবোব নাকি?"

চারিদিক থেকে আরো নানা রকম হুকুম ও অভিযোগ।

দুদিকে টেবিলের সারের মাঝখানে সরু পথ একেবারে ম্যানেজার বা মালিকের টেবিলে গিয়ে শেষ হয়েছে। তার পেছনে পার্টিশানের দরজা পেরিয়ে রান্নার জায়গা।

দিলীপ এই গোলমাল ও বিশৃঙ্খলায় যেন খুশি হয়েই ধীরে ধীরে সামনের দিকে এগোয়।

মালিকের এবার তার দিকে দৃষ্টি পড়ে।

খদ্দেরের পোশাক থেকে তার মর্যাদা অনুমান করে ব্যস্তভাবেই তিনি এগিয়ে আসেন,—"এই যে বসুন না। এখানেই তো একটা চেয়ার খালি আছে।"

খালি চেয়ারটা তিনি নিজে হাতেই একটু টেনে সরান।

দিলীপ চেয়ারটার দিকে দৃষ্টিপাত করে কি যেন ভেবে বলে,—"আপনার লোকজন একটু কম মনে হচ্ছে?"

মালিক সবিনয়ে তা স্বীকার করে নিয়ে বলেন,—"আজ্ঞে তা বটে। আজকাল কাজের লোক পাওয়া যা মুশকিল। তবে এখন আমার Rush hour কি না, তাই…"

দিলীপ তাঁকে বাধা দিয়ে বলে,—"দু-একজন Extra লোক ত নিলেই পারেন। খদ্দেরের সুবিধাটাই ত আগে দেখা উচিত। তাঁরাই হলেন লক্ষ্মী।"

মালিক সর্বান্তঃকরণে সায় দিয়ে বলেন,—"আজ্ঞে তা আর বলতে! তাঁদের খুশি রাখাই হল আসল।" চেয়ারটা আরেকবার একটু টেনে তিনি খুশি রাখার আগ্রহের প্রমাণ দেন।

দিলীপের কিন্তু চেয়ারে বসবার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। সে আগের কথারই জের টেনে বলে,—"কিন্তু এ রকম service হলে খদ্দের খুশি থাকবে কেন? বিরক্ত হয়ে তাদের অন্য জায়গায় যেতে কতক্ষণ! আর একবার অন্য রেস্তোরাঁয় গেলে তারা কি আর ফিরবে!"

খদ্দের হারাবার সম্ভাবনাটা মালিককে যথাসম্ভব বুঝিয়ে দিলীপ শেষ সদুপদেশ দেয়,—"আমার তো মনে হয়, আপনার অন্ততঃ একজন extra hand engage করা দরকার,—এখুনি!"

খদ্দেরের সব কথাই বেদবাক্য—এই নীতিতে বিশ্বাস রাখা মালিকের পক্ষে বোধ হয় একটু কষ্টকর হয়ে উঠেছে। তবু তিনি যথাসম্ভব ভদ্রতা করে বলেন,—"পেলে ত করি! কিন্তু তেমন লোক এখুনি পাচ্ছি কোথায়?"

"ইচ্ছে করলেই পেতে পারেন।" দিলীপ গম্ভীর মুখে তাঁকে উৎসাহ দেয়।

মালিক হতাশার ভঙ্গি করেন। ভালো জ্বালায় পড়েছেন ত খদ্দেরকে খাতির দেখাতে এসে। কিন্তু এখন একেবারে এক কথায় থামিয়ে দেওয়াও যায় না। তাই একটু করুণ মুখ করে বলেন,—"শুধু ইচ্ছে করলেই যদি পাওয়া যেত! কিন্তু আপনি বসুন!"

ব্যস্ত হয়ে চেয়ারটায় আর একবার নাড়া দিয়ে মালিক বলেন,—"আপনার যা চাই তা আমি নিজে এনে দিচ্ছি!"

কিন্তু দিলীপের তবু বসবার নাম নেই। গম্ভীরভাবে জানায়,—“চা, চপ, কাটলেটের কথা বলছেন? কিন্তু আমি ত সে সব চাই না।”

মালিকের মুখখানা হাঁ হয়ে যায়। হতভম্ব হয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—“তবে?”

“আমি আপনাকে সাহায্য করতে চাই!” দিলীপ উদার ভাবে জানায়, “আমি আপনার extra বয় হতে রাজী। এখুনি।”

খানিকক্ষণ মালিকের মুখ দিয়ে আর কোন কথা বার হয় না। তারপর চোখ মুখ লাল করে তিনি প্রায় তোত্‌লা হয়ে যান,—“আপনি—মানে এটা কি রকম রসিকতা মশাই! এটা কি রসিকতার সময়। মাথার ঘায়ে বলে আমি কুকুর-পাগল…”

দিলীপ তাঁকে সুপরামর্শ দেয়,—“সে জন্যেই ত প্রস্তাবটা করছি। আমায় নিয়ে দেখুন, সব গণ্ডগোল এখুনি মিটে যাবে।” নিজের পোশাকটা দেখিয়ে বলে,—“এই পোশাকের জন্যে ঘাবড়াবার কোন কারণ নেই—এটা ছাড়তে কতক্ষণ। তা ছাড়া পোশাকের নিচে জুতোটা বোধহয় লক্ষ্য করেন নি।”

মালিকের ধৈর্যের সীমা অনেকক্ষণ পেরিয়ে গেছে, ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে তিনি বলেন,—“যান মশাই যান। আমার বাজে বকবার সময় নেই। বিরক্ত করবেন না।”

দিলীপ শেষ চেষ্টা করে বলে,—“আমার offerটা কিন্তু নিলে পারতেন।” সঙ্গে সঙ্গে চেন সুদ্ধ, ট্যালিসম্যানটা বার করে সে আঙ্গুলে ঘোরায়। চাক্ষুষ দেখায়, যদি কোন ফল হয়।

“না, না, না।” মালিকের গলা এবার ঘরের অন্য গণ্ডগোল ছাপিয়ে ওঠে। নিজের টেবিলের দিকে ফিরে যেতে যেতে কপালের ঘাম মুছে তিনি বলেন, “আচ্ছা পাগলের পাল্লায় পড়েছি যা হোক।”

খদ্দেরদের অনেকের কৌতূহলী দৃষ্টিও এখন দিলীপের ওপর পড়েছে। আর বোধ হয় থাকা নিরাপদ নয়।

ট্যালিসম্যানটা চেন ধরে আঙ্গুলে ঘোরাতে ঘোরাতে দিলীপ কিন্তু হাসিমুখেই বেরিয়ে যায়।

কিন্তু আর বুঝি যাবারও জায়গা নেই।

রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে চপ্পলের স্ট্র্যাপটাও ছিঁড়ে যায়। চপ্পলের অবশ্য অপরাধ নেই। তালিতে তালিতে তার আপন চেহারা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে।

বড় রাস্তা ছেড়ে পাশের একটা গলিতে ঢুকে যে মুচির কাছে সেটা সারাতে দেয় সেও একটু হেসে সেই মন্তব্যই করে। চপ্পলটা হাতে নিয়ে একটু ঘুরিয়ে দেখে সে বলে,—"এ চপ্পলে সিরক্ তালি-ই ত আছে বাবু। আউর কি মেরামত করাবেন!"

আর কেউ হলে এ অবজ্ঞায় বোধ হয় চটেই উঠত। দিলীপ কিন্তু গম্ভীর মুখেই বলে—"বাঃ মেরামত করতে হবে না! এ চপ্পল যে এরপর যাদুঘরে থাকবে।"

মুচি বেরসিক নয়! এক গাল হেসে ফেলে বলে,—"হাঁ বাবু যাদুঘরকে লিয়ে! তবতো জরুর মেরামত করনা!"

চপ্পলটা মেরামত হবার পর পায়ে গলিয়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে হঠাৎ পেছনে হর্নের শব্দে দিলীপ চমকে ওঠে। একটা ট্যাক্সি একেবারে গা ঘেঁষে এসে দাঁড়িয়ে আওয়াজ করছে। গাড়ির স্টার্টটা পর্যন্ত বন্ধ করা হয় নি।

মুচির পয়সা চুকিয়ে দিয়ে দিলীপ সেদিকে ফেরে। ট্যাক্সি-ড্রাইভার গাড়ির ভেতর থেকে হাঁকে—"উঠুন উঠুন মশাই! দাঁড়াবার সময় নেই।"

ছেঁড়া চপ্পলের বাবুকে বিনা বাক্যব্যয়ে ট্যাক্সি চড়তে দেখে মুচিই বোধ হয় অবাক হয় সবচেয়ে বেশী।

ট্যাক্সি-ড্রাইভার মিটারের ফ্ল্যাগ নামিয়ে দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে সটান গাড়ি চালিয়ে দেয়।

ভালো করে লক্ষ্য করবার কেউ থাকলে এই দেখে অবাক হত

নিশ্চয় যে দিলীপ সামন্ত আগের দিন যে ট্যাক্সি চড়েছিল আজকের ট্যাক্সির সেই একই নম্বর।

গলি থেকে বড় রাস্তা এবং বড় রাস্তা থেকে আবার গলি-ঘুঁজিতে ঢুকে একেবারে দিলীপের অঞ্চলে।

ইতিমধ্যে ড্রাইভার আর প্যাসেঞ্জারের দু'চারটে যা কথা হয় তা একটু শুনে রাখবার মত।

ট্যাক্সি গলি ছাড়াতেই দিলীপ জিজ্ঞাসা করে, "কি কেষ্ট, হল কি আজ? এর মধ্যেই ঘরমুখো! এখনো তো সন্ধ্যেই হয় নি।"

সামনের একটা গাড়িকে পাশ কাটিয়ে কেষ্ট ড্রাইভার বলে,—"কিন্তু আমার বরাদ্দ পুরে গেছে! আজ যে ট্রাম বন্ধ। এর মধ্যেই ছ আনা বেশী কামিয়ে ফেলেছি!"

দিলীপ হেসে বলে,—"তার মানে কুড়ি টাকা ছ আনা! এখনো তা হলে তোমার সেই এক পণ! কুড়ি টাকার বেশী কামাতে রাজী নও?"

স্টীয়ারিং হুইলটায় একটা পাক দিয়ে সামনের একটা ঠেলাগাড়িকে সুকৌশলে পাশ কাটিয়ে কেষ্ট বলে,—"পাগল! দরকারের বেশী রোজগার করবার চেষ্টা করে মরব নাকি! শেষে কোনদিন বড়লোকই হয়ে যাই যদি!"

দিলীপ হেসে ফেলে বলে,—"বড়লোক হতে তোমার এত ভয়?"

"ভয় নয়, ঘেন্না!" কেষ্ট বেশ গম্ভীরভাবে বলে, "বড় লোক হয়েছি কি মরেছি। পেটে চর্বি যদি বা না হয়, ত প্রাণটা শুকিয়ে কাঠ হবেই।"

দুজনেই এবার হেসে ওঠে।

কেষ্ট তারপর জিজ্ঞাসা করে,—"কিন্তু আমার ত বরাদ্দ পুরেছে, তোমার কিছু জুটল?"

"তা জুটেছে, জুতোয় একটা নতুন তালি!"

কেষ্ট এ কথার জবাবে হেসে যা বলতে যাচ্ছিল তা আর বলা হল না। রাস্তার ওদিক দিয়ে একটা প্রকাণ্ড দামী গাড়ি এসে পথ আটকেছে।

অপ্রশস্ত গলি। দুটি গাড়ি কোন রকমে একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁষে পরস্পরকে পাশ কাটাতে পারে। কিন্তু দামী গাড়িটা রাস্তার প্রায় মাঝখানেই এসে দাঁড়িয়েছে। কোন হোমরা-চোমরা বড়লোকের গাড়ি সন্দেহ নেই। গাড়ির বাহার ড্রাইভারের পোশাক আর ভেতরে যিনি বসে আছেন তাঁর চেহারা থেকেই তা বোঝা যায়।

সূর্যের চেয়ে বালির তাত বেশী। ওই বাদশাহী গাড়ির সামনে পুঁচকে একটা বেবি ট্যাক্সির দাঁড়াবার স্পর্ধা ইউনিফর্ম-পরা ড্রাইভারের বেশী অসহ্য।

সজোরে বাজখাঁই আওয়াজের হর্ন একটানা বাজান থেকেই তার সে দম্ভ ও রাগটা বোঝা যায়। হর্নের আওয়াজের স্পষ্ট মানে—ট্যাক্সি পিছু হটাও।

কেষ্ট কিন্তু হটে না। তার রবারের হর্নের আওয়াজ অনেক ক্ষীণ ও খেলো। কিন্তু দামী গাড়ির বাজখাঁই হাঁকের জবাবে সেও সমানে প্রতিবাদ জানিয়ে চলে।

দুজনের কারুরই নড়বার নাম নেই। হর্ন দিতে দিতে কেষ্ট একবার পিছনে ফিরে বলে,—"চৌধুরী সাহেবের গাড়ি দেখছি। বড় মানুষের ড্রাইভার কি না, তাই ওরকম মেজাজ!

বড়লোকের ড্রাইভার হর্ন ছেড়ে এবার গলাবাজিতেই তার মেজাজ দেখায়।

—"এই ট্যাক্সিওয়ালা, হটাও গাড়ি!"

কেষ্ট চাপা গলায় দিলীপকে শোনায়,—"বাছাধনকে একটু শিক্ষা দেওয়া দরকার।"

ড্রাইভারের কথার জবাব কিন্তু সে হর্ন বাজিয়েই দেয়।

বড় গাড়ির ড্রাইভার এবার ক্ষেপে গিয়ে গাড়ির দরজা খুলে বেরিয়ে

এসে মারমুখী হয়ে ট্যাক্সির কাছে দাঁড়ায়। চাপা গলায় বলে,—"কেয়া অন্ধা হয় কেয়া ? দেখতা নেহি, গাড়ি যা নেহি শক্‌তি। ব্যাক করো জল্‌দি।"

কেষ্টর মুখে তবু রা নেই। কেমন একটু হাসি হাসি মুখেই তাকিয়ে সে দু'বার অদ্ভুতভাবে হর্ন বাজায়—যেন সেইটেই তার ভাষা।

বড় গাড়ির ড্রাইভার চোখ রাঙিয়ে শাসায়,—"কেয়া ব্যাক নেহি করোগে !"

কেষ্ট উত্তর দেয় আর একবার হর্ন বাজিয়ে।

ড্রাইভার এবার কি করত বলা যায় না, কিন্তু পেছন থেকে গম্ভীর গলায় ডাক আসে,—"বাহাদুর !"

বাহাদুর কেষ্টর দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি হেনে মনিবের কাছে ফিরে যায়।

পেছনে কেষ্টর হর্ন বিদ্রূপভরেই তিনবার বেজে ওঠে।

বড় গাড়ির ভেতরে যিনি আসীন তিনি ড্রাইভারকে শান্ত স্বরে আদেশ দেন,—"তুম ব্যাক কর লো।"

কিন্তু এত সহজে হার মানতে কি ড্রাইভার চায়। তার জ্বালাটা সে প্রকাশ না করে পারে না,—পক্কা বদমাশ হয় সাব......"

"ব্যাক কর লো !" শান্ত গম্ভীর আদেশে ড্রাইভারের দ্বিতীয় কথা আর বলা হয় না। তাকে গাড়িতে উঠে মনিবের আদেশ পালন করতে হয়।

বড় গাড়িই পিছু হটে পেছনের গলির বাঁকে অদৃশ্য হয় এবার। গাড়ির মালিক শুধু একবার চকিতে ট্যাক্সির নম্বরটার ওপর যে চোখ বুলিয়ে নেন, কেষ্ট ও দিলীপের তা নজর এড়ায় না।

কেষ্ট হেসে বলে,—"চৌধুরী সাহেবের মাথা কিন্তু ঠাণ্ডাই বলতে হবে। ও ড্রাইভার একা থাকলে অত সহজে ব্যাপারটা মিটত না।"

"কিন্তু ব্যাপারটা মিটল কি এইখানেই ?" দিলীপ সন্দেহ প্রকাশ করে।

কেষ্ট গম্ভীর হয়ে বলে,—"কেন, কি করবে কি ? চৌধুরী সাহেব এ

তল্লাটের রাজা হতে পারেন, কিন্তু তা বলে তাঁর ড্রাইভারের জুলুম সহ্য করব কেন ! রাস্তা জুড়ে ওই আগে দাঁড়িয়েছে।”

দিলীপ হেসে বলে,—“সে ত চোখেই দেখলাম ! কিন্তু রাস্তা জুড়ে দাঁড়ান যাদের অভ্যাস তারা এ রকম হার কি সহজে মানে !”

“বেশ দেখা যাবে !” কেষ্ট গাড়িতে আবার স্টার্ট দেয়।

দিলীপ কিন্তু তাকে থামিয়ে বলে,—“একটু রাখো কেষ্ট !”

কেষ্ট স্টার্ট থামিয়ে একটু অবাক হয়ে বলে,—“কেন কি হল আবার ?”

দিলীপ কথা না বলে পাশের একটা বাড়ির একটা সাইনবোর্ড আঙুল দিয়ে দেখায়।

পুরোনো জরাজীর্ণ একটা বাড়ি, তার দরজায় অত্যন্ত বেমানান একটা ঝকঝকে নতুন সাইনবোর্ডে বড় বড় করে লেখা—

নির্ভীক স্পষ্টবাদী সাপ্তাহিক

‘প্রবাহ’—কার্যালয়

দিলীপ এবার হেসে বলে, “হঠাৎ চোখেই যখন পড়েছে তখন একবার শেষ চেষ্টা করে যাই। নির্ভীক স্পষ্টবাদীর চেহারাটা অন্তত দেখতে পাব।”

দুজনে গাড়ি থেকে নেমে বাড়ির ভেতর ঢুকে প্রথমে কিন্তু কাউকেই দেখতে পায় না।

বাড়ির বাইরেটা যেমন জরাজীর্ণ ভেতরটা ততোধিক। বেশ বড় একটা হলঘরের মত জায়গা। কিন্তু দেয়ালগুলোর বালি পলস্তারা খসে যেয়ো নোংরা চেহারা। ক্ষতবিক্ষত মেঝের ওপর নোংরা কালিমাখা কাগজপত্র ছড়ানো। ঘরের এক পাশে কটা উঁচু কম্পোজিটারের ডেস্ক। আর একদিকে ছোট একটা হাতে চালান ছাপার মেশিন।

দিলীপ ও কেষ্ট এদিক ওদিক চেয়ে কাউকে দেখতে না পেয়ে কি করবে ভাবছে এমন সময় পেছনের একটি ছোট দরজা খুলে অত্যন্ত শীর্ণ চেহারার একটি মাঝবয়েসী লোককে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়।

লোকটির চেহারা পোশাক এই জীর্ণ বাড়িটির সঙ্গেই মানানসই ঃ মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। আধময়লা জামা কাপড়গুলো শীর্ণ চেহারায় যেন টাঙিয়ে রাখা হয়েছে!

দিলীপ নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করে,—"দেখুন 'প্রবাহ' কাগজের মালিক কি সম্পাদকের সঙ্গে একটু দেখা হতে পারে।"

"নিশ্চয় পারে! আসুন বসুন!" বলে লোকটি একধারে পাতা একটা ছোট কেরোসিন কাঠের টেবিলের পাশে টিনের দুটি মরচে ধরা চেয়ার তাঁদের দেখিয়ে দেয়। তারপর হাতলভাঙা একটি কাঠের চেয়ারে নিজে বসে বলেন,—"আমিই সম্পাদক এবং মালিক সবই।"

"ও আপনিই" দিলীপ একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না,—"তা এ কাগজ কি আপনি একাই চালান নাকি?"

লোকটির শীর্ণ মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে।

"হ্যাঁ এই ক'মাস তাই চালাচ্ছি বলতে পারেন। যে দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল রাস্তা বেছে নিয়েছি তাতে কাকে আর সঙ্গী পাব বলুন?"

দিলীপ ও কেষ্ট দুজনে একটু হতভম্ব হয়ে যায়। এই রকম একটি ছাপাখানায় এই চেহারার লোকটির মুখে এরকম নাটকীয় কথা শোনবার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না।

দিলীপ মনের কৌতুকটুকু প্রকাশ না করে গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞাসা করে,—"দুর্গম বিপদের রাস্তা! কেন বলুন ত?"

প্রবাহ সম্পাদক এবার আবেগভরে উঠে দাঁড়ান। তারপর দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত তাঁর কণ্ঠ থেকে ভাষার প্রবাহ বেরিয়ে আসে,—"কেন জিজ্ঞাসা করছেন? অন্যায় অবিচার মিথ্যা ও মূর্খতার বিরুদ্ধে যে পথে হানা দিতে যেতে হয় তা দুর্গম নয়! বিপদ ত সেখানে পদে পদে। এ দুর্গ যারা দখল করে বসে আছে তাদের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আমার মত কীটাণুকীটকে পিষে মারবার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব!"

ভদ্রলোক তিক্তভাবে একটু হেসে আবার বলেন,—'এই ত আজই

চৌধুরী সাহেবের চিঠি পেয়েছি।' মখমলের মত মোলায়েম চিঠি, আর তার তলায় চক্‌চক করছে লুকোন ছুরির ফলা!"

কেষ্ট অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"তাঁর এরকম চিঠি দেওয়ার মানে ?"

"মানে বুঝতে পারলেন না!" প্রবাহ সম্পাদক আবার হাসেন,—"এ অঞ্চলে তাঁর একছত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে কে ? এই আমি! এ অঞ্চলের সব কিছুর তো তিনিই মালিক। যার যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেই বাড়িটারও। আমার মত ক্ষুদ্র মূষিকের বেযাদবির পবিণাম তাই তিনি ইঙ্গিতে একটু বুঝিযে দিয়েছেন। কিন্তু সামান্য মূষিকও যে মহীরুহ ধ্বসিয়ে দিতে পারে এইটুকুই তিনি ভুলে গেছেন।"

দিলীপ সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে। চৌধুরী সাহেবের গাড়ি কেন যে এই সরু গলিতে ঢুকেছিল তাও তার বুঝতে বাকি নেই। গলাটায প্রবাহ সম্প দকেব মতই একটু নাটকীয সুব দিয়ে সে বলে,—"আচ্ছা দেখুন, এই মহীরুহ ধ্বসার কাজে আর একটা মূষিক হলে সুবিধে হয় না ?"

প্রবাহ সম্পাদক একটু বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে বলেন, "আজ্ঞে, আপনার কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পাবছি না আমি।...."

কেষ্ট সোজা মানুষ। গোড়ায় ছাপাখানা ও তার মালিকের চেহারা দেখে মনটা তাঁর একটু নরম হয়ে গেলেও ওই সব কথার মারপ্যাঁচে সে এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। প্রবাহ সম্পাদকের কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে,—"বুঝেছি, নিজে যাই বলুন অন্যের সোজা কথা ছাড়া আপনি বোঝেন না। সোজা কথাটা এই যে আমার এই বন্ধু আপনার এখানে একটা কাজ চান। ওর কলমের জোর আছে, আপনার যদি ইঁদুরের কামড় হয় তো ওঁর একেবারে কুমীরের। কি? রাখবেন ওকে ?"

প্রবাহ সম্পাদক এক মুহূর্তের জন্যে একটু বুঝি অপ্রস্তুত হন, কিন্তু

লোকটির চেহারা পোশাক এই জীর্ণ বাড়িটির সঙ্গেই মানানসই। মুখে খোঁচা খোঁচা কাঁচা পাকা দাড়ি। আধময়লা জামা কাপড়গুলো শীর্ণ চেহারায় যেন টাঙিয়ে রাখা হয়েছে !

দিলীপ নিজে থেকেই জিজ্ঞাসা করে,—"দেখুন 'প্রবাহ' কাগজের মালিক কি সম্পাদকের সঙ্গে একটু দেখা হতে পারে।"

"নিশ্চয় পারে ! আসুন বসুন !" বলে লোকটি একধারে পাতা একটা ছোট কেরোসিন কাঠের টেবিলের পাশে টিনের দুটি মরচে ধরা চেয়ার তাঁদের দেখিয়ে দেয়। তারপর হাতলভাঙা একটি কাঠের চেয়ারে নিজে বসে বলেন,—"আমিই সম্পাদক এবং মালিক সবই।"

"ও আপনিই" দিলীপ একটু বিস্মিত না হয়ে পারে না,—"তা এ কাগজ কি আপনি একাই চালান নাকি ?"

লোকটির শীর্ণ মুখে একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে ওঠে।

"হ্যাঁ এই ক'মাস তাই চালাচ্ছি বলতে পারেন। যে দুর্গম বিপদ-সঙ্কুল রাস্তা বেছে নিয়েছি তাতে কাকে আর সঙ্গী পাব বলুন ?"

দিলীপ ও কেষ্ট দুজনে একটু হতভম্ব হয়ে যায়। এই রকম একটি ছাপাখানায় এই চেহারার লোকটির মুখে এরকম নাটকীয় কথা শোনবার জন্যে তারা প্রস্তুত ছিল না।

দিলীপ মনের কৌতুকটুকু প্রকাশ না করে গম্ভীর ভাবেই জিজ্ঞাসা করে.—"দুর্গম বিপদের রাস্তা ! কেন বলুন ত ?"

প্রবাহ সম্পাদক এবার আবেগভরে উঠে দাঁড়ান। তারপর দম দেওয়া গ্রামোফোনের মত তাঁর কণ্ঠ থেকে ভাষার প্রবাহ বেরিয়ে আসে,—"কেন জিজ্ঞাসা করছেন ? অন্যায় অবিচার মিথ্যা ও মূর্খতার বিরুদ্ধে যে পথে হানা দিতে যেতে হয় তা দুর্গম নয় ! বিপদ ত সেখানে পদে পদে। এ দুর্গ যারা দখল করে বসে আছে তাদের প্রচণ্ড শক্তি দিয়ে আমার মত কীটাণুকীটকে পিষে মারবার জন্যে তারা উদ্‌গ্রীব !"

ভদ্রলোক তিক্তভাবে একটু হেসে আবার বলেন,—'এই ত আজই

চৌধুরী সাহেবের চিঠি পেয়েছি।' মখমলের মত মোলায়েম চিঠি, আর তার তলায় চক্‌চক করছে লুকোন ছুরির ফলা !"

কেষ্ট অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"তাঁর এরকম চিঠি দেওয়ার মানে ?"

"মানে বুঝতে পারলেন না !" প্রবাহ সম্পাদক আবার হাসেন,—"এ অঞ্চলে তাঁর একছত্র সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ধ্বজা তুলেছে কে ? এই আমি ! এ অঞ্চলের সব কিছুর তো তিনিই মালিক। মায় যেখানে দাঁড়িয়ে কথা বলছি সেই বাড়িটারও। আমার মত ক্ষুদ্র মূষিকের বেয়াদবির পরিণাম তাই তিনি ইঙ্গিতে একটু বুঝিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু সামান্য মূষিকও যে মহীরুহ ধ্বসিয়ে দিতে পারে এইটুকুই তিনি ভুলে গেছেন।"

দিলীপ সমস্ত ব্যাপারটা এতক্ষণে বুঝে নিয়েছে। চৌধুরী সাহেবের গাড়ি কেন যে এই সরু গলিতে ঢুকেছিল তাও তার বুঝতে বাকি নেই। গলাটায় প্রবাহ সম্পাদকের মতই একটু নাটকীয় সুর দিয়ে সে বলে,—"আচ্ছা দেখুন, এই মহীরুহ ধ্বসার কাজে আর একটা মূষিক হলে সুবিধে হয় না ?"

প্রবাহ সম্পাদক একটু বিমূঢ়ভাবে তাকিয়ে বলেন, "আজ্ঞে, আপনার কথার মানেটা ঠিক বুঝতে পারছি না আমি।...."

কেষ্ট সোজা মানুষ। গোড়ায় ছাপাখানা ও তার মালিকের চেহারা দেখে মনটা তাঁর একটু নরম হয়ে গেলেও ওই সব কথার মারপ্যাঁচে সে এতক্ষণে বিরক্ত হয়ে উঠেছে। প্রবাহ সম্পাদকের কথা শেষ করতে না দিয়েই সে বলে,—"বুঝেছি, নিজে যাই বলুন অন্যের সোজা কথা ছাড়া আপনি বোঝেন না। সোজা কথাটা এই যে আমার এই বন্ধু আপনার এখানে একটা কাজ চান। ওর কলমের জোর আছে, আপনার যদি ইঁদুরের কামড় হয় তো ওঁর একেবারে কুমীরের। কি ? রাখবেন ওকে ?"

প্রবাহ সম্পাদক এক মুহূর্তের জন্যে একটু বুঝি অপ্রস্তুত হন, কিন্তু

তার পরেই নিজেকে সামলাতে তাঁর দেরী হয় না। অত্যন্ত কৃতজ্ঞভাবে তিনি দিলীপকে উদ্দেশ করেই বলেন, "আপনি নিজে থেকে এই মহৎ ব্রতে সাহায্য করতে চাইছেন এর চেয়ে বড় সৌভাগ্য 'প্রবাহ'এর কিছু হতে পারে না, কিন্তু কি জানেন ..."

বাকিটুকু জানাবাব ধৈর্য থাকলেও তাদেব সময় হয় না।

বাইরে রাস্তায় কে ঘন ঘন হর্ন দিচ্ছে। হর্নটা যে কেষ্টরই ট্যাক্সির তাও বোঝা যায়।

কেষ্ট উঠে পড়ে বাইরে বেরিয়ে যায়। দিলীপও তার পিছু পিছু প্রবাহ কার্যালয়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়ায়।

রাস্তার ধারে রাখা কেষ্টর ট্যাক্সিতে অত্যন্ত অস্থিরভাবে একটি অচেনা মেয়ে হর্ন বাজাচ্ছে।

কিন্তু সত্যি কি অচেনা? মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছে বলে দিলীপের মনে হয়। কেষ্ট ট্যাক্সির কাছে পৌঁছবার আগেই কোথায় দেখেছে তাও দিলীপের মনে পড়ে যায়।

পাঁচ

কেষ্ট ট্যাক্সির কাছে গিয়ে পৌঁছোতেই মেয়েটি ব্যস্তভাবে বলে,—"আপনারই ট্যাক্সি তো। দেখুন আপনাকে…"

কেষ্ট কথার মাঝখানেই বাধা দিয়ে বলে,—"ট্যাক্সি engaged, দেখতে পাচ্ছেন না!"

মিটারের নামানো ফ্ল্যাগটার দিকে চেয়ে মেয়েটি বলে,—"Engaged তো দেখতে পাচ্ছি। কিন্তু গাড়িতে তো কেউ নেই। আমার অত্যন্ত দরকার।"

ট্যাক্সির জন্যে ব্যাকুলতাব কারণটুকুও মেয়েটি তার অস্থিরতায় প্রকাশ না করে পারে না।—"একে ট্রাম স্ট্রাইক, তার উপর আমার অত্যন্ত দেরী হয়ে গেছে!"

কেষ্ট কিন্তু নরম হয় না। গম্ভীর মুখে বলে,—"কি করব বলুন। আমার যাবার উপায় নেই। আপনি অন্য ট্যাক্সি দেখুন।"

"সময় থাকলে কি আর দেখতাম না।"

মেয়েটির গলার স্বর ও মুখের ভাব বদলে গেছে। অনুনয়ের ভঙ্গি ছেড়ে উষ্ণস্বরেই এবার বলে,—"আপনার ট্যাক্সি engaged বলছেন কিন্তু সওয়ারী কোথা? এমনিই তো আপনারা flag নামিয়ে রাখেন।"

"এমনি রাখব কেন?" কেষ্টও একটু রুক্ষস্বরেই জবাব দেয়। তার পর অদূরে দিলীপের দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলে,—"ওই তো সওয়ারী দেখতে পাচ্ছেন না!"

মেয়েটি বেশ সন্দিগ্ধভাবেই দিলীপের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"ওই উনি!"

দিলীপকে এবার কাছে এগিয়ে যেতেই হয়।

সওয়ারীর গাম্ভীর্য নিয়েই সে জিজ্ঞাসা করে,—"কি, হয়েছে কি?"

কেষ্ট তাকেই সমর্থক হিসাবে জানায়—"বলছি ট্যাক্সি এনগেজ্‌ড্‌, তবু ইনি বিশ্বাস করছেন না!"

দিলীপ দস্তুরমত ভারিক্কী চালে আবার জিজ্ঞাসা করে—"তা, উনি যেতে চান কোথায় ?"

কেষ্ট দিলীপের এরকম কথার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। ঈষৎ অপ্রসন্ন স্বরে বলে,—"কোথায়, তা আমি কি করে জানব !"

মেয়েটি দিলীপের কথার সুরে একটু আশা পেয়ে নিজে থেকেই ব্যাকুল ভাবে জানায়,—"আমি যাব হাওড়া স্টেশনে। এখুনি না গেলে নয় !"

"ওঃ ট্রেন ধরতে বুঝি !"—দিলীপ তৎক্ষণাৎ ব্যাপারটা অনুমান করে নিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"কটায় ট্রেন ?"

"না, ট্রেন নয় !"—মেয়েটি দিলীপেব ভুল ভেঙে দিয়ে বলে— "আমার অন্য কাজ আছে ! আপনি যদি দয়া করে ট্যাক্সিটা ছেড়ে দেন !"

দিলীপ এক মুহূর্তের মধ্যেই কি ভেবে নিয়ে বলে,—"না ট্যাক্সি ছাড়বার দরকার নেই। আপনি উঠুন। আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি।"

কেষ্টর দিকে ফিরে সওয়ারীর মেজাজ নিয়েই সে তারপর আদেশ করে,—"চলো হে !"

কেষ্ট এতক্ষণ দিলীপের ভাবগতিকই নীরবে লক্ষ্য করছিল। এবার ভ্রূকুটিটুকু গোপন না করে, সে তার জায়গায় গিয়ে বসে।

দিলীপ অভিনয়টা এখনো চালিয়ে যায়। মিটারের দিকে তাকিয়ে বলে,—"আমার দেড় টাকা হয়ে ছিল তা হলে !"—তারপর মেয়েটির দিকে ফিরে বলে, "কই উঠুন আপনি, উঠুন !"

নিজে সে কেষ্টর পাশে সামনের সীটেই গিয়ে বসে।

মেয়েটি কি যেন বলতে গিয়ে থেমে পেছনেই উঠে বসে দিলীপকে ধন্যবাদ জানায়। তারপর কেষ্টকে অনুরোধ করে,—"একটু তাড়াতাড়ি যদি পৌঁছে দেন।"

"তাড়াতাড়ি !" কেষ্ট ঝাঁঝালো গলায় বলে, "বেশী তাড়াতাড়ি করলে হাওড়ার বদলে অন্য কোথাও পৌঁছে যাব যে !" কেষ্টর গলায় ঝাঁঝের সঙ্গে একটু কৌতুকও মেশানো মনে হয়।

ট্যাক্সি হাওড়া স্টেশনে এসে থামতে না থামতে মেয়েটি ব্যস্তসমস্ত হয়ে নেমে পড়ে। তারপর মিটারটায় একবার চোখ বুলিয়ে কেষ্টর হাতে দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ায় না।

মিটারে উঠেছে তিন টাকা চার আনা। মনে মনে হিসেবটা করে নিয়ে কেষ্ট পেছন থেকে ডাক দেয়,—"এই যে আপনার চেঞ্জটা নিয়ে যান!"

কিন্তু মেয়েটি তখন প্লাটফর্মের ভেতর দ্রুতপদে ঢুকে গেছে।

দিলীপই নিজে থেকে হাত বাড়িয়ে বলে,—"দাও আমি দিয়ে আসছি!"

হাতে সিকিটা দিয়ে কেষ্ট কেমন একটু অদ্ভুত ভাবে চেয়ে বলে,—"হ্যাঁ, তা দিয়ে আসতে হবে বই কি!"

দিলীপ কিন্তু কথা শেষ হবার আগেই গাড়ি থেকে নেমে স্টেশনে ঢুকে পড়েছে।

প্রায় দৌড়োতে দৌড়োতে ভেতরের বিরাট হলে ঢুকেও দিলীপ প্রথমে মেয়েটিকে কোথাও দেখতে পায় না।

এরই মধ্যে মেয়েটি গেল কোথায়?

না, কোন প্ল্যাটফর্মের দিকে যায় নি নিশ্চয়। তাহলে এইটুকুর মধ্যে অদৃশ্য হয়ে যেতে পারত না।

হঠাৎ সে দেখতে পায়, মেয়েটি দক্ষিণের সিঁড়ি দিয়ে দোতলায় উঠে যাচ্ছে।

যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সিঁড়িগুলো এক এক লাফে কয়েকটা ধাপ ডিঙিয়ে উঠে মেয়েটির যখন নাগাল পায়, তখন সে ওপরের একটি অফিস-ঘরে প্রায় ঢুকে পড়েছে।

"এই যে শুনুন!"—দিলীপ বেশ জোর গলাতেই ডাকে।

মেয়েটি চমকে পিছন ফিরে, দিলীপকে দেখে একটু বিরক্ত মুখেই জিজ্ঞাসা করে,—"কি ডাকছেন কেন? ভাড়া তো দিয়ে এসেছি!"

"না, আপনার চেঞ্জটা নিয়ে আসেন নি কি না,"— দিলীপ মেয়েটির হাতে সিকিটা তুলে দেয়।

মেয়েটি সিকিটার দিকে একবার চেয়েও দেখে না। দিলীপের দিকেও ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করে সে তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে যায়।

ঠিক এই রকম ব্যবহারটা দিলীপ বোধ হয় কল্পনা করে নি। মুখে তার কৌতুকের হাসি হলেও ভাবটা একটু অপ্রস্তুত গোছের।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে দিলীপ নেমে আসে। হল দিয়ে বাইরে বেরুতে বেরুতে আর একবার কিন্তু তাকে চমকে দাঁড়াতে হয়।

স্টেশনের লাউড স্পীকারে ঘোষণা শোনা যাচ্ছে,—"নয় নম্বর আপ ট্রেন সাড়ে তিনটের সময়—দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে...."

লাউড স্পীকারটা তেমন ভাল নয়। গলার স্বরটা একটু বিকৃতই শোনাচ্ছে। কিন্তু এ তো ওই মেয়েটির ছাড়া আর কারুর গলা হতে পারে না!

এই জন্যেই তা হলে মেয়েটির স্টেশনে পৌঁছোবার এত তাড়া!

স্টেশনের অগণন যাত্রীকে নির্দেশ দেওয়াই তার কাজ।

ফিরে গিয়ে কেষ্টর ট্যাক্সির কাছে যখন দাঁড়ায় তখন চেন দেওয়া ট্যালিসম্যানটা সে অন্যমনস্ক ভাবে আঙ্গুলে ঘোরাচ্ছে।

কেষ্ট দরজা খুলে দিয়ে বলে,—"কই এসো!" তার পর তার হাতের দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করল,—"ওটা আবার কি?"

"এটা?" দিলীপ হেসে বসে, "এটা বিলিতি তাবিজ। কাছে রাখলে বরাত খুলে যায়! যোশেফ খুড়ো আজ দিয়েছিলেন চাকরির সুবিধে হবে বলে!"

"তাই না কি!" কেষ্টর মুখে এতক্ষণে হাসি দেখা যায়,—"তা তাবিজের গুণ আছে স্বীকার করতেই হবে।"

"হুঁ তাই তো দেখছি!" বলে দিলীপ হঠাৎ যেন গম্ভীর হয়ে যায়।

ছয়

পরের দিন সকাল বেলা কেষ্টর ট্যাক্সিটাকে একটা ছোট মাঠের ধারে দেখা যায়। মাঠটা যে পাড়ায় সেটা ঠিক বস্তি না হলেও তার একটু উন্নত সংস্করণ। পাকা বাড়ি দু'চারটে এদিকে ওদিকে আছে কিন্তু বেশীর ভাগই ছিরি-ছাদ-হীন। অধিকাংশই টিনের বা খোলার ছাউনি। তবে পাড়াটা নতুন। বাড়িঘরগুলোর চেহারা তাই জীর্ণ নয়।

ট্যাক্সির বনেট খোলা। নিচে ইট দিয়ে গাড়িটাও উঁচু করে তোলা। কেষ্ট তার তলায় শুয়ে কি মেরামত করছে।

মাঠের ধারেই তার করোগেট টিনের ছাউনি দেওয়া একটি ছোট পাকা বাড়ি।

সেখান থেকে তার বৌ লক্ষ্মীকে এক হাতে একটা মোটা কাঁচের গ্লাসে চা ও আরেক হাতে একটা কলাই-করা প্লেটে দুটো লেড়ে-বিস্কুট নিয়ে আসতে দেখা যায়।

কেষ্টর বৌএর চেহারা নেহাত সাদা-মাটা হলেও বেশ একটি শ্রী আছে। আপাততঃ মুখটা কিন্তু মেঘলা আকাশের মত থমথমে। ছেলে-পুলে নেই। স্বামী-স্ত্রী নিয়েই সংসার। তাই মান-অভিমানের পালা বোধ হয় একটু বেশী। সম্প্রতি সেই রকম একটা দাম্পত্য পালার জের চলছে মনে হয়।

কেষ্টর মাথা ও শরীরের অধিকাংশই গাড়ির তলায়। শুধু পা দুটোই বাইরে বেরিয়ে আছে।

এ অবস্থায় নিজের অভিমানের মর্যাদা রেখে উপস্থিতি জ্ঞাপন করা সহজ নয়।

লক্ষ্মী কিন্তু উপায় একটা ভালই বার করে। প্রয়োজনের মত যান্ত্রিক গলায় চেঁচিয়ে শুধু ঘোষণা করে—"চা"!

গাড়ির তলা থেকে কালিঝুলিমাখা অবস্থায় কেষ্ট বেরিয়ে আসে সেই এক ভাবেই।

চেহারায় কাটখোট্টা হলেও কেষ্ট মানুষটার ভেতরে যে রসের ফল্গু আছে তা এবার বোঝা যায়।

শণের একটা নুড়ি নিয়ে কালিমাখা হাতটা যথাসম্ভব মোছবার চেষ্টা করতে করতে সে যেন মুগ্ধ স্বরে বলে,—"আহা, কেন যে তোমার নাম লক্ষ্মী হয়েছিল, রোজ নতুন করে বুঝি !"

কেষ্টর এ চাটুবাক্য কিন্তু নিষ্ফল হয়। গাড়ির পাদানির ওপর চায়ের গেলাস ও বিস্কুটের প্লেটটা, নামিয়ে রেখে লক্ষ্মী চলে যাবার উপক্রম করে।

"আরে, শোনো ! শোনো।" কেষ্ট ব্যাকুলভাবে পিছু ডাকে। লক্ষ্মী গম্ভীর মুখে ফিরে দাঁড়াবার পর বলে,—"এই নোংরা হাতে বিস্কুটগুলো খাব কি করে।"

লক্ষ্মী নিরুত্তর। মুখের ভাবের পরিবর্তন নেই।

কেষ্ট মিনতির সুরে বলে,—"দাও না একটু খাইয়ে……"

"কী !"—কেষ্টর কথার ওপরই লক্ষ্মী ফোঁস করে ওঠে। তার জ্বলন্ত দৃষ্টিতে যেটা উহ্য থাকে তা প্রকাশ করে দিয়ে কেষ্ট ভাল মানুষের মত বলে,—"ওঃ খোলা জায়গা, লোকজন দেখবে ভাবছ ? তা দেখুক না। যারা জানে তারা ভাববে পাগল। আর যারা জানে না, তারা ভাববে বেড়ে প্রেম করছে। তুমি—তুমি বরং এক কাজ কর !"

রাগের মধ্যেও কৌতূহলের আভাসটুকু লক্ষ্মীর চোখে গোপন থাকে না।

কেষ্ট মুখ টিপে একটু হেসে বলে,—"তুমি বরং মাথার কাপড়টা খুলে দাও। দূর থেকে সিঁদুর আর কে দেখছে। ভাববে কোন্ আইবুড়ো মেয়ে !"

"থামো"—লক্ষ্মী এবার সরোষে ঝঙ্কার দেয়,—"যেমন ড্রাইভারীর কাজ তেমনি ইল্লুতে রুচি পিরবিত্তি ! এই খোলা মাঠে ঘোমটা খুলে আমি তোমায় হাতে করে বিস্কুট খাওয়াব !"

"আহা বিস্কুটই তো খাওয়াবে",—কেষ্ট একেবারে সরলতার প্রতিমূর্তি,—"বিষ তো না ! কি রকম দৃশ্যটা জমবে বলো তো।"

লক্ষ্মী আর দাঁড়ায় না। মুখ ঘুরিয়ে চলে যায়।

"এই যেও না যেও না, শোন! কাছে এসো।"

লক্ষ্মী ফিরে দাঁড়ায়। কিন্তু কাছে আসে না।

কেষ্ট এবার তার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে,—"বিস্কুট খাওয়া তা হলে আর হল না। এই রইল!"

কেষ্ট শুধু চায়ের গেলাসটা তুলে নিয়ে তার পর বলে,—"আমার আবার সকালে খালি পেটে চা-টা সহ্য হয় না।"

কেষ্ট চায়ের গেলাসে চুমুক দিতেই লক্ষ্মী কিন্তু এগিয়ে আসে। কেষ্টর হাত থেকে চায়ের গেলাসটা কেড়ে নিয়ে ঝাঁঝালো গলায় বলে,—"থাক্ খুব বাহাদুরি হয়েছে! বলি ঘরে গিয়ে হাত মুখ ধুয়ে খাবে, না আমায় এই উদোম মাঠে সত্যি খাইয়ে দিতে হবে!"

"কাজটা না শেষ করে কি করে ঘরে যাই বলো। অবশ্য নেহাত যদি তোমার লজ্জা করে……"

"লজ্জা শরম মান সম্ভ্রম বলে কিছু আমার আর থাকবার জো আছে!" —প্লেট থেকে একটা বিস্কুট তুলে কেষ্টর মুখে তুলে ধরে লক্ষ্মী প্রায় কান্নার সুরে বলে,—"তোমার মত মিস্ত্রী মজুরের হাতে যেদিন থেকে পড়েছি সেদিন থেকেই সব বালাই গেছে!"

হঠাৎ মৃদু একটু কাশির শব্দে দুজনেই চমকে ওঠে। দিলীপ কখন নিঃশব্দে এসে পেছনে দাঁড়িয়েছে কেউ লক্ষ্য করে নি।

লক্ষ্মী লজ্জায় একেবারে জড়সড়। কেষ্ট হো হো করে হেসে উঠে বলে,—"তুমি তো বড় বেরসিক দিলীপ! আসবার আর সময় পেলে না!"

দিলীপ সামনে এসে হাসিমুখে বলে,—"বরং যথাসময়েই তো এসেছি মনে হচ্ছে। এরকম একটা দৃশ্য দর্শক অভাবে যে নইলে মাঠে মারা যেত।"

লক্ষ্মী নিজেকে খানিকটা সামলে কথাটা ঘোরাবার জন্যে বলে,—"তুমি দাঁড়াও ঠাকুরপো। আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসছি।"

লক্ষ্মী চলে যাবার পর কেষ্ট দিলীপের দিকে চেয়ে বলে,—"এত সকালে যে হঠাৎ।"

হাতের কাগজটা তুলে ধরে নিয়ে দিলীপ বলে,—"প্রবাহে ভেসে এলাম।"

"প্রবাহ? তোমার হাতে কি, প্রবাহ না কি!"

"হ্যাঁ প্রবাহ!"—দিলীপ গম্ভীরভাবে বলে,—"তবে নদীর না নর্দমার সেইটে ঠিক বুঝে উঠতে পারছি না।"

কাগজটা খুলে ধরে দিলীপ এবাব বলে,—"কাল এ পাড়ায় কি কাণ্ড হয়ে গেছে খবর তো রাখো না। শোনো।"

দিলীপ প্রবাহেব একটি বড বড শিরোনামা দেওয়া সংবাদ পড়ে শোনায়,—"ট্যাক্সিচালকেব গুণ্ডামি। সম্ভ্রান্ত ভদ্র নাগরিকের উপর জুলুম! বর্তমান যুগ সাম্যের। উচ্চ নীচ ধনী নির্ধনের ভেদ সত্যই এখন বিলুপ্ত হইতে চলিয়াছে। কিন্তু ইতরতা ও যথেচ্ছাচার তা বলিযা ক্ষমাব যোগ্য নয। গতকল্য আমাদের এই পল্লীতেই একজন ইতব ট্যাক্সি-চালক গুণ্ডা, সম্ভ্রান্ত একজন সজ্জন ব্যক্তিকে যে ভাবে অপমানিত লাঞ্ছিত কবিয়াছে তাহাব বিবরণ পাইয়া আমরা স্তম্ভিত হইযাছি......"

"থামো! আর পড়তে হবে না!" কেষ্ট একেবারে আগুন হযে উঠে বাধা দেয। "—এ তোমাব সেই নির্ভীক স্পষ্টবাদী সম্পাদক তো?—একাই একশ হযে যিনি দুনিয়া উদ্ধার করতে নেমেছেন। চল যাবার সময় একবার মোলাকাত করে যাব।"

দিলীপ হেসে বলে,—"তাতে লাভ কি হবে! হয়ত পরের সংখ্যায় বেরুবে—প্রবাহ কার্যালয়ে গুণ্ডাদের হানা। নির্ভীক স্পষ্টবাদিতার পুরস্কার।"

সাত

প্রবাহ কার্যালয়ে সেদিন আর যাওয়া কিন্তু হয় না।

যাওয়ার পথেই এক কাণ্ড।

বড় রাস্তা থেকে একটা গলির ভেতর সবে তখন ট্যাক্সি ঢুকেছে। হঠাৎ প্রচণ্ড একটা আর্তনাদ করে গাড়িটা থেমে গেল। কেষ্ট প্রাণ-পণে ব্রেক কষেছে। দিলীপের মাথাটা হঠাৎ গাড়ি থামানর ঝাঁকানিতে সামনের কাঁচে ঠুকে যায়।

একটি ছোট্ট ছেলে বাচ্ছা একটি কুকুরের গলায় দড়ি বেঁধে রাস্তা পার হচ্ছিল। আর একটু হলে, গিয়েছিল বুঝি চাকার তলায়—কেষ্ট খুব হুঁশিয়ার হয়ে যথাসময়ে গাড়ি থামিয়েছে।

না, ছেলেটির কিছু হয় নি। আঁচড়টি পর্যন্ত লাগে নি গায়ে কিন্তু তবু হৈ চৈ বেধে যায় এক মুহূর্তে।

দুর্ঘটনার নাম না হতেই রাস্তার লোকজন ঠিক যেমন জড় হবার ইতিমধ্যে হয়ে পড়েছে। তারই ভেতর ছোট্ট ছেলেটি আকুল হয়ে চেঁচিয়ে ওঠে—"ভিখু! আমার ভিখু কোথায় গেল!"

তার পরেই কান্না,—"আমার ভিখু মরে গেছে।"

ভিখু মানে যে কুকুরছানাটা তা বুঝতে কারুব দেরি হয় না।

বাচ্চা কুকুরের গলায় বাঁধা দড়িটা সত্যিই ছেঁড়া। গেছে নাকি তা হলে চাকার তলায় থেঁত্‌লে?

না, তাও নয়। বাচ্চা হলে কি হয় সেয়ানা কুকুরছানা। দাড় বাঁধা অবস্থাটা অত্যন্ত অনিচ্ছার সঙ্গেই এতক্ষণ সে সহ্য করেছে। দড়িটা ভাগ্যক্রমে ছিঁড়ে যাওয়ায় সে এখন ভিড়ের ভেতর দিয়ে নিঃশব্দে পালাবার চেষ্টায় ছিল।

দিলীপ এদিক ওদিক চেয়ে তার সন্ধান পেয়ে হাতে করে তুলে নিয়ে এসে ছেলেটির কাছে হাজির হয়।—

"এই তো তোমার ভিখু। কিছু হয় নি ওর।"

কিন্তু ছেলেটি দিলীপের সান্ত্বনায় ভোলে না। কান্নার বদলে এবার তার রাগ দেখা যায়,—"ভিখুর নিশ্চয় লেগেছে, তোমরা ভিখুকে চাপা দিয়েছ। তোমাদের আমি পুলিসে দেব!"

ছোট ছেলেটি চীৎকার করে পুলিস ডাকতে সুরু করে, "পুলিস! পুলিস!"

লোকজন যারা জড় হয়েছিল তাদের কেউ কেউ ভিখুর জন্যে পুলিস ডাকায় হেসে উঠতেই দিলীপ ইশারা করে তাদের থামিয়ে বলে—"তাই তো এখানে কাউকে তো দেখছি না। কিন্তু পুলিস না থাক দারোগা যখন রয়েছে তখন ভাবনা কি! কি করতে হবে বলো তো?"

ছেলেটি দিলীপের দিকে চেয়ে একটু সন্দিগ্ধ ভাবে জিজ্ঞাসা করে—"কই, দারোগা কই এখানে?"

"বাঃ, আমিই তো দাবোগা!"—দিলীপ হেসে জানায়।

"তুমি দারোগা? তোমাব থানা কোথায়?"—ছেলেটি এখনও জেরা করে।

"চলো না সেখানেই নিয়ে যাচ্ছি।"—দিলীপ তার দারোগাগিরির প্রমাণ দেবার জন্যে কেষ্টর দিকে ফিরে কড়া গলায় বলে,—"এই ট্যাক্সি-ড্রাইভার, চল তোমায় থানায় যেতে হবে।"

কেষ্ট লম্বা সেলাম ঠুকে তৎক্ষণাৎ সম্মতি জানায়—"যে আজ্ঞে দারোগা সাহেব।"

ট্যাক্সির দরজাটা খুলে দিলীপ ছেলেটিকে উঠতে বলে, কিন্তু ছেলেটি থানায় যাওয়ার শর্তটা আগে না জানিয়ে উঠতে রাজি নয়। বলে, "আমার ভিখুকেও নিয়ে যেতে হবে কিন্তু!"

"নিশ্চয় নিশ্চয়!"—দিলীপ সায় দিয়ে জানায়,—"ভিখু না গেলে থানায় নালিশ করবে কে?"

ছেলেটির তবু একটু দ্বিধা দেখা যায়,—"কিন্তু ভিখুর যদি কোথাও লেগে থাকে!"

ভিখুর সুস্থ অক্ষত দেহে সে রকম কোন লক্ষণ কোথাও দেখা না গেলেও দিলীপ যেন অত্যন্ত গম্ভীর হয়ে ভেবে বলে,—"সেও একটা কথা বটে।"

ভিখুর পাগুলো তার পর একটু নেড়ে-চেড়ে দিলীপ নিজেই সন্দিগ্ধ হয়ে ওঠে।

"হ্যাঁ, একটা পা যেন একটু জখম হয়েছে মনে হচ্ছে। আচ্ছা তা হলে তোমাদের বাড়িতেই আগে চল। সেখানে ভিখুর পায়ে ওষুধপত্র দিয়ে তার পর থানায় যাওয়া যাবে।"—দিলীপ ভিখুসমেত ছেলেটিকে গাড়ির ভেতর তুলে দিয়ে নিজে তার পাশে উঠে বসে কেষ্টকে ধমক লাগায়—"জলদি চালাও ট্যাক্সি। তোমার আজ কি হয় দেখো না।"

"জি হুজুর।" বলে কেষ্ট কাঁদ কাঁদ মুখে গাড়িতে স্টার্ট দেয়। তার পর মুখ ফিরিয়ে ছেলেটিকেই জিজ্ঞাসা করে,—"কোন্ দিকে যাব হুজুর ?"

ছেলেটির খুশি আর ধরে না। রাস্তা দেখাবার ভার নিয়ে সে ভারিক্কী চালে বলে—চল ডাইনে।

ছেলেটিকে বাড়িতে নামিয়ে পালাবার ফন্দিটা শেষ পর্যন্ত কিন্তু ভেস্তে গেল।

কাছাকাছি একটি নাতিপ্রশস্ত রাস্তার ধারে ছেলেটির বাড়ি। এ অঞ্চলের অধিকাংশ বাড়ির মতই চুন-বালি-ওঠা জরাজীর্ণ চেহারা। তবে সামনে একটু জমি দেয়াল দিয়ে ঘেরা। রাস্তার ওপরই তার দরজা।

ছেলেটিকে ভিখুর সঙ্গে বাড়ির সামনে নামিয়ে দিলীপ তাকে পরম হিতৈষীর মত পরামর্শ দিলে—"যাও, তুমি ভিখুর পায়ে একটু ওষুধপত্র লাগিয়ে এস দেখি।"

"কি ওষুধ লাগাব ?"

এ সমস্যাটা দিলীপের মাথায় আসেনি। একটু ভেবে নিয়ে সে কিন্তু ওষুধ বার করে ফেললে চটপট।

"জল। স্রেফ জলপটি লাগিয়ে দাও দেখি, ব্যস তাতেই সেরে যাবে।"

ছেলেটির এ ওষুধ তেমন পছন্দসই মনে হল না। কিন্তু ভিখুর পায়ের ওষুধ দেওয়ার চেয়েও জরুরী কাজ তখনো বাকি। তাই রাজি হয়ে বাড়ির দিকে যেতে গিয়েও একবার দাঁড়িয়ে পড়ে সে কথাটা স্মরণ করিয়ে দিতে ভুলল না,—"এর পর থানায় যেতে হবে কিন্তু।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়!" দিলীপ তৎক্ষণাৎ আশ্বাস দিলে। কেষ্টর দিকে ফিরে তাকেও সেই সঙ্গে শাসিয়ে দিতেও ভুলল না—"এই ড্রাইভার, তুমি যেন আবার পালিয়ে যেও না।"

কেষ্ট একেবারে ভয়ে কাঁটা। "না হুজুর পালাব কোথায়! আপনি নম্বর নিয়ে নিন। আর আপনি তো নিজে খাড়া আছেন।"

"হ্যাঁ, নম্বর নিয়ে আমি দাঁড়িয়ে আছি, আর পালাবে কোথায়!—" দিলীপ ছেলেটিকে একেবারে নিশ্চিন্ত করে দিয়ে ভেতরে পাঠিয়ে দিলে।

কিন্তু তাতেও শেষ রক্ষা হল না। কয়েক পা গিয়ে ছেলেটি হঠাৎ ফিরে এসে বললে—"না তুমিও এস।"

"আমি যাব!"—দিলীপ বেশ বিপন্ন।—"কিন্তু হঠাৎ দারোগা ঢুকলে তোমাদের বাড়িতে সবাই ভয় পায় যদি? তার চেয়ে তুমিই আগে গিয়ে খবর দাও।"

"আচ্ছা তা হলে তুমি—তুমি এই দরজার কাছে এসে দাঁড়াও।—" ছেলেটি দিলীপকে হাত ধরে টেনে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড় না করিয়ে ছাড়লে না।

নিরুপায় হয়ে দিলীপকে সেখানে দাঁড়াতেই হল। ছেলেটি তখন দরজা ঠেলে ভেতরে ঢুকে গেছে। সেখানে তার উত্তেজিত চীৎকারটাও শোনা গেল—"মণি মণি, শীগ্‌গির এসো, কি হয়েছে দেখে যাও।"

দিলীপ আর এক মুহূর্ত সেখানে দাঁড়ায় না। এক ছুটে এসে কেষ্টর পাশে উঠে বসে হেসে বলে,—"নাও, চালাও তাড়াতাড়ি—"

কেষ্টকে আর দুবার বলবার দরকার নেই সে কথা। কিন্তু ভাগ্য নিতান্তই বিরূপ কিংবা অভিপ্রায়ই তার অন্য রকম।

গাড়ি স্টার্ট আর কিছুতেই নেয় না। কেষ্টর সমস্ত চেষ্টা ও কৌশল অগ্রাহ্য করে গাড়িটা শুধু সশব্দে প্রতিবাদ জানিয়ে অচল হয়ে থাকে।

ওদিকে বাড়ির ভেতর ছেলেটির ডাকে যে মেয়েটি বেরিয়ে এসেছে তাকে দেখার পর কেষ্টর ট্যাক্সি হঠাৎ অচল করার মধ্যে ভাগ্যের অভিসন্ধিটা যেন আর অস্পষ্ট থাকে না।

"কি, হয়েছে কি বেণু?"—মেয়েটি বেশ একটু অবাক।

বেণু হাঁপাতে হাঁপাতে উত্তেজিত ভাবে গুরুতর ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করে—"এখ্খনি থানায় যেতে হবে যে। দারোগাবাবু এসেছে। ওই দরজার কাছে দাঁড়িযে আছে।"

"থানায় যেতে হবে!"—রহস্যটা ভেদ করতে না পেরে মেয়েটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"কি বলছিস কি?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ সত্যি বলছি। তুমি দেখবে এসো না। দারোগাবাবু দরজায় দাঁড়িয়ে আছে।"—বেণু নিজের কথাটা প্রমাণ করতে ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

মেয়েটি এবার রহস্যভেদের চেষ্টায় হতাশ হয়ে হেসে বলে,—"দাঁড়িয়ে আছে থাকুক। এখানে এসেছে কি করতে?"

"তুমি কিছু বুঝতে পার না।"—বেণু অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ স্বরে ব্যাপারটা বোঝাবার চেষ্টা করে,—"ভিখুকে গাড়ি চাপা দিয়েছে যে। তাই তো থানায় যাচ্ছি। তুমি এস না।"

নিজের কথাটা প্রমাণ করবার আগ্রহে মেয়েটিকে সে আবার বাইরেই টেনে নিয়ে যায়। মেয়েটির তখন সঙ্গে না গিয়ে আর উপায় নেই।

ট্যাক্সিটা এতক্ষণ বাদে তাদের উপহাস করবার জন্যেই যেন সবে স্টার্ট নিয়েছে।

হঠাৎ বাইরে বেরিয়েই বেণুর চীৎকার—"ওকি, চলে যাচ্ছ কেন?"

চলে যাওয়া এখন আর অসম্ভব। শুধু বেণুর ডাকের দরুনই নয়,

যে মেয়েটি তার সঙ্গে বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে তার প্রতি দৃষ্টি পড়ার দরুনও বটে।

দিলীপ গাড়ি থেকে নেমে দাঁড়ায়। বেণু ততক্ষণে মেয়েটিকে টানতে টানতে সেখানে নিয়ে গেছে।

প্রথমেই বেণুর অভিযোগ—"চলে যাচ্ছিলে যে বড়।"

"না,—মানে ভাবলাম,"—দিলীপ বেশ একটু অপরাধীর মত কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা করে,—"ভাবলাম তুমি হয়ত আর থানায় যেতে চাও না। তাই ড্রাইভারকেই ধরে নিয়ে যাচ্ছিলাম।"

এ কৈফিয়তে বেণু সন্তুষ্ট হতে পারে না।

"বা রে! আমি না গেলে হয় নাকি!"—বলে দিলীপের ত্রুটি ধরিয়ে দিয়ে সে মেয়েটিকে ব্যাপারটা বোঝাবার জন্যে ব্যস্ত হয়ে ওঠে।

"দেখেছ মণি, আমি ঠিক বলেছি কি না। এই তো দারোগাবাবু। ওঁর সঙ্গেই থানায় যাচ্ছি। ভিখুকে চাপা দেবার মজা বার করে দেব ড্রাইভারেব।"

দিলীপ ও মেয়েটির পবস্পরকে চিনতে বোধ হয় দেরি হয় নি। ব্যাপারটা অনুমান করে ফেললেও কি থেকে সুরু সেইটুকুই শুধু জানবার কৌতূহলে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করলে,—"কি হযেছে বলুন তো?"

"ওঃ গুরুতর ব্যাপার।"—বেণুর দিকে একবার চেয়ে নিয়ে দিলীপ গম্ভীরভাবে ব্যাখ্যা সুরু করে, "রাস্তায় serious accident. আপনাদের ভিখু প্রায় মারা যাবার যোগাড়, সামনের ডান পায়ের একটা নখ বোধ হয় খসেই গেছে।"

"ঈস্, এত বড় সাংঘাতিক কাণ্ড!"—মেয়েটি কোন রকমে হাসি চেপে যেন শিউরে ওঠে,—"তাই ভাবছি থানা পুলিস দরকার হল কেন। তা আপনি—এখান থেকেই তো আমাদের নালিশটা টুকে নিয়ে যেতে পারেন। থানায় যাবার আর দরকার কি?"

দিলীপ তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলে,—"হ্যাঁ থানায় আর কেন যাবেন?"

কিন্তু বেণুর তাতে ঘোর আপত্তি দেখা যায়,—"না সে হবে না। ভিখুকে নিয়ে থানায় আমি যাবই।"

"দূর বোকা।"—মেয়েটি এবার বেণুকে ভোলাবার ব্রহ্মাস্ত্র প্রয়োগ করে,—"আমাদের মত বড় লোকেরা কি থানায় যায়? দারোগাবাবু নিজেই তো এসেছেন আমাদের নালিশ শুনতে। আমাদের থানায় যেতে বয়ে গেছে।"

বেণুকে আর প্রতিবাদ জানাবার অবসর না দিয়েই মেয়েটি দিলীপকে তাড়াতাড়ি অনুরোধ জানায়—"নিন দারোগাবাবু, আপনার যা টুকে নেবার নিন।"

"হ্যাঁ, তাই নিচ্ছি।"—বলে দিলীপ পকেট হাতড়াতে লাগল। একটা নোটবই পেন্সিল না পেলে আর মান থাকে না।

কেষ্টকেই সুতরাং তার গাড়ির ভেতর থেকে একটা পেন্সিল আর পেট্রোলের হিসাব লেখার খাতাটা এগিয়ে দিতে হল—"এই যে নিন স্যার।"

"হ্যাঁ দাও," বলে খাতা পেন্সিল নিয়ে দিলীপ গম্ভীরভাবে তার বিবরণ লেখা সুরু করলে—"হুঁ, প্রথমে হচ্ছে, দুর্ঘটনার জায়গা আর সময়। নফর ঘোষ লেন, সকাল সাতটা পঞ্চান্ন মিনিট। তার পর যে জখম হয়েছে তার নাম। হ্যাঁ, কি নাম ওর?"

"ভিখু।"—থানায় না যেতে পাওয়ার দুঃখটা বেণু এখনো সম্পূর্ণ ভোলে নি মনে হল।

"শুধু ভিখু আর কিছু পদবী নেই?"—দিলীপ বিবরণ একেবারে নির্ভুল করতে চায়।

"পদবী আবার কি?"—বেণু অবাক।

"এই যেমন আমার নাম দিলীপ সামন্ত।" ওই সামন্তটা হল পদবী।

দিলীপের এত বিশদভাবে ব্যাখ্যা না করলেও হয়ত চলত। অন্ততঃ ব্যাখ্যা করবার সময় বেণুর বদলে মেয়েটির দিকেই তাকিয়ে থাকবার কোন প্রয়োজন নিশ্চয় ছিল না।

মেয়েটির ওপর পদবী সমেত নামটা অমন ফলাও করে জানাবার যে প্রতিক্রিয়াই হোক, বেণু পদবীর ব্যাপারে মোটেই উৎসাহী নয় দেখা যায়।

সে তাড়াতাড়ি আসল প্রসঙ্গেই ফিরে আসে, বলে—"না, না, ওসব কিছু ওর নেই। ও শুধু ভিখু।"

"ও শুধু ভিখু! আচ্ছা তাই লিখলাম।"—ভিখুর নামটাই বোধ হয় লিখে দিলীপ আবার প্রশ্ন করে—"এখন তোমার নাম?"

"বেণু হালদার।"

"হুঁ,"—দিলীপের প্রশ্ন দেখা যায় অনেক—"বাড়িতে কে আছে?"

মেয়েটির ভ্রূ কুঞ্চিত হয় বুঝি একটু, কিন্তু বেণু সরল ভাবেই উত্তর দেয়—"বাবা আছে, এই মণি আছে ··।"

দিলীপ বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা করে,—"মণি! মণি কি?"

দারোগার কর্তব্যবোধের সঙ্গে এতটা কৌতূহল খাপ খায় কি না মণির সন্দেহ হয়। সে একটু ঠোঁট বাঁকিয়ে জিজ্ঞাসা করে—"এসবও আপনার দরকার না কি, দারোগাবাবু?"

"বাঃ দরকার বই কি!"—দারোগা হিসেবে দিলীপ জোর গলায় কথাটা জানায়।"

"হুঁ,"—মণি এবার গম্ভীর হয়েই ব্যাখ্যা করে বোঝায়—"বেণু আমার ভাইপো, ছোটবেলা পিসিমণি বলতে পারত না বলে মণি বলেই ডাকত। এখনও তাই বলে।"

"ওঃ!"—বলে দিলীপ যেন কি কারণে একটু খুশি হয়ে উঠে আসল কাজটাই ভুলে যায়।

বেণুই সেটা তাকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে বলে—"কই লিখছেন না তো।"

"এই যে লিখছি।"

তাড়াতাড়ি খাতায় পেন্সিল চালিয়ে দিলীপ মণিকে আবার জিজ্ঞাসা করে,—"আপনার নামটা?"

মণি জবাবটা তৎক্ষণাৎ দেয় না। সোজা ভ্রূকুঞ্চিত করে দিলীপের

দিকে তাকিয়ে একটু রুক্ষ স্বরেই জিজ্ঞাসা করে—"নামটার কি দরকার ? বেণুর পিসি লিখলেই তো পারেন।"

"না, না তা কখনো হয়। আসল নামটা নইলে রেকর্ড যে ভুল হয়ে যাবে।"—সে যে কর্তব্যের প্রতিমূর্তি দিলীপের গলার স্বরে তার আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না।

"ও, রেকর্ড ভুল হয়ে যাবে! বেশ লিখুন,—মায়া হালদার।"

গলার স্বরটা রুক্ষ হলেও মায়ার চোখের দৃষ্টিতে কৌতুকের আভাসটা এবার প্রচ্ছন্ন থাকে না।

দিলীপ সেটুকু লক্ষ্য করেই বোধ হয় প্রসন্ন মনে খাতা বন্ধ করে বলে,—"হুঁ সবই তো ছিল। এখন দরকার শুধু একজন সাক্ষীর।"

"সাক্ষী আবার কি ?"—বেণুর বিস্মিত প্রশ্ন।

"সাক্ষী মানে যে ভিখুকে চাপা দেওয়াটা দেখে থানায় গিয়ে সব বলবে। তা আমি তো দারোগা, আমার তো সাক্ষী দেওয়া আর চলবে না। তুমিও ভিখুর মালিক, তোমারও না, তা হলে—?"

সমস্যাটা তুলে দিলীপ নিজেই তৎক্ষণাৎ সমাধান করে ফেলে,—"দাঁড়াও ঠিক হয়েছে, এই ড্রাইভার!"

কেষ্ট তৎক্ষণাৎ তটস্থ হয়ে সাড়া দেয়,—"জি হুজুর।"

"তোমাকেই সাক্ষী দিতে হবে, বুঝেছ। কি রাজী ?"—দিলীপ ধমকের সুরেই জিজ্ঞাসা করে।

"খুব রাজী হুজুর!" কেষ্ট যেন কৃতার্থ।—"আমিই যখন আসামী হুজুর, তখন আমার চেয়ে ভাল সাক্ষী আর কোথায় পাবেন ?"

দিলীপ এ জবাবে সন্তুষ্ট হয়ে খাতা পেন্সিল কেষ্টকে ফেরত দিয়ে বেণুকে আশ্বাস দিয়ে বলে,—"তোমার কোন ভাবনা নেই। ভিখুকে চাপা দেওয়ার মজা আমি ড্রাইভারকে দেখিয়ে দেব। জেল যদি নাও হয় ফাঁসি কি দ্বীপান্তর নির্ঘাত হবে জানবে।"

আশ্বাসের ফলটা যেন একটু উল্টো হয়। বেণু মায়াকেই জিজ্ঞাসা করে,—"দ্বীপান্তর কি মণি ?"

ব্যাপারটা মণি বুঝিয়ে দেয়,—"দ্বীপান্তর মানে একেবারে অনেক দূরে সমুদ্রের মাঝখানে এক দ্বীপে গিয়ে থাকা।"

বেণুর চোখ দুটো এবার বিস্ময়ে আনন্দে বিস্ফারিত হয়ে ওঠে। হাততালি দিয়ে উঠে সে বলে,—"বাঃ ড্রাইভারের কি মজা!"

দিলীপ ও মায়া হাসি চেপে পরস্পরের দিকে বুঝি একবার না তাকিয়ে পারে না। দিলীপকে বেশ কষ্ট করেই এবার গম্ভীর হয়ে বলতে হয়।—"তাই তো ভাবছি, সাজাটা শেষ পর্যন্ত ওর মজাই না হয়ে যায়।"

বেণুর তাতে কিন্তু এখন খুব আপত্তি আছে মনে হয় না। খুশি মনে জিজ্ঞাসা করে,—"কিন্তু দ্বীপান্তরে ঠিক পাঠাবে তো?"

"নিশ্চয়! আচ্ছা আসি তাহলে, নমস্কার!"—বলে দিলীপ মায়াকে যে ভাবে নমস্কার জানায় তাতে যেন সন্দেহ হয় এই বিদায় নেওয়াটা এই আলাপের দাঁড়ি টানা ঠিক নয়।

আট

ফ্রেণ্ডস গ্যারেজ কারখানাটার অস্তিত্ব আসল ঠিকানার বেশ একটু দূর থেকেই পাওয়া যায়। শুধু কারখানার আওয়াজে নয়, লজঞ্চুষের মত মিষ্টি একটা গন্ধে। সেটা যে কারখানার কাজে দরকারী একটি রাসায়নিক অ্যাসিডের গন্ধ, পাড়ার অনেক ছোট ছেলে মেয়েকে তা বোধ হয় অনেক দুঃখে বুঝতে হয়েছে।

প্রকাণ্ড একটা করোগেটেড টিনের ছাউনির নিচে কারখানা। এ অঞ্চল ভাল কাজের জন্যে কারখানার নামডাক আছে। আছে অন্য একটি কারণেও। কারখানার সঙ্গে লাগাও একটি ছোট প্রেস। প্রেসের যিনি মালিক এককালে বিদেশী শাসনের বিরুদ্ধে যুঝতে গিয়ে অনেক নিপীড়ন তাঁকে সহ্য করতে হয়েছে। দেশ স্বাধীন হবার পর সে সব দুঃখের দিনের দাম তিনি সরকারী সম্মানে কি অনুগ্রহে উসুল করবার চেষ্টা করেন নি। নিজের যৎসামান্য পুঁজি দিয়ে এই ছোট 'জব' প্রেসটি বসিয়ে তাই দিয়েই জীবিকা নির্বাহ করেন। কিন্তু বয়স হলেও ভেতরের সে আগুন তার নেভে নি। এককালে ব্যায়ামবীর হিসাবে তাঁর যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। প্রৌঢ় বয়সেও তাঁর শরীরের বাঁধুনিতে তার সাক্ষ্য আছে। প্রেসের সঙ্গে কারখানার পেছনের খানিকটা খালি জমিতে তিনি একটি জিমন্যাসিয়মও করেছেন। এ অঞ্চলের বহু ছেলে-ছোকরা সেখানে এসে ব্যায়ামচর্চা করে। শুধু শরীর গড়বার জন্যেই নয়, পাঁচুদার সদা-হাস্যময় মুখের দু-চারটে মজার কথা শোনবার জন্যেও তারা নিয়মিত সেখানে জড় হয়। পাঁচুদা বক্তৃতা-দেওয়া নেতাগিরিতে বিশ্বাস করেন না। তিনি সকলের রসিক বন্ধু। কথা বেশী বলেন না, কিন্তু ছেলেরা তাঁর সান্নিধ্যে নিশ্চয় এমন কিছু পায় যার আকর্ষণ উপদেশ-উদ্দীপনার চেয়ে অনেক বেশী।

কেষ্টর ট্যাক্সি এই কারখানার কাছে এসেই থামল।

গ্যারেজের একজন মিস্ত্রীকে ডেকে কেষ্ট হুকুম করলে—"এই, ব্রেকটা একবার দেখে দে শীগ্‌গির!"

কেষ্টর হুকুমের ধরনেই বোঝা গেল, এ কারখানায় তার আধিপত্য বড় কম নয়। সম্পর্কটাও সকলের সঙ্গে মধুর।

মিস্ত্রী ছেলেটি অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে—"এই সকালে বেরিয়েই আবার কি হল? সব তো ঠিক ছিল।"

"ঠিক ছিল বলেই এখানে দেখতে পাচ্ছ"—কেষ্ট খিঁচিয়ে ওঠার ভান করলে,—"নইলে এতক্ষণে হাজতে খুঁজতে যেতে হত।"

"হাজতে?"—মিস্ত্রী অবাক।

এবার হেসে ফেলে মিস্ত্রী ছেলেটির পিঠ চাপড়ে কেষ্ট বললে—"হ্যাঁরে, —অ্যাকসিডেণ্ট হয়ে প্রায় লাইসেন্সটি গেছল। নে শোন, ব্রেকটা যেন একটু বেশী কষে গেছে। ঠিক করে দে তাড়াতাড়ি। আমরা ততক্ষণ একবার হাজিরা দিয়ে আসি।"

হাজিরাটা অবশ্য পাঁচুদার প্রেসে। কারখানার পেছন দিকের দেওয়ালেই একটা ছোট টিনের দরজা।

দিলীপ আর কেষ্ট সেই দরজা দিয়ে সেখানে গিয়ে ঢুকতেই পাঁচুদা নাকের ওপর ঝোলানো কানে সুতো বাঁধা চশমার ওপর দিয়ে চোখ তুলে তাকিয়ে হাতে যেন স্বর্গ পাওয়ার মত বলে উঠলেন—"এই যে দিলীপ ভায়া। মনে মনে তোমাকেই স্মরণ করছিলাম। একটু উদ্ধার করে দাও তো ভাই।"

পাঁচুদার সারা মাথায় টাক, মুখেও প্রৌঢ়ত্বের রেখা পড়েছে। কিন্তু শরীর যেন এখনো জোয়ান ছেলের মত মজবুত। গায়ে শুধু একটি আধময়লা ফতুয়া। কোমর-বেঁধে পরা কাপড়টাও ধোপার বাড়ি বুঝি আর না দিলে নয়।

ছেলে-ছোকরারা এখনও অনেকে সেখানে আড্ডা ছাড়ে নি। পাড়াগাঁয়ে চেহারার দুজন ভদ্রলোক প্রেসে কিছু ছাপাবার উদ্দেশ্যেই পাঁচুদার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন। পাঁচুদা এতক্ষণ তাদেরই হাতের

লেখা কাগজটি দেখছিলেন। ওই ছাপাবার বিষয়টি নিয়েই দিলীপের সাহায্য তাঁর দরকার বোঝা গেল।

"দাঁড়াও দাদা"—সরাসরি সে সাহায্যে না এগিয়ে দিলীপ বললে,—"আগে খাজনাটা দিয়ে ফেলি।"

ঘরের এক পাশে দেয়ালের গায়ের একটি শেল্‌ফে একটি বড় গোছের টিনের কৌটো। তার গায়ে আঁটা কাগজে কালি দিয়ে লেখা 'খুশির খাজনা'। কৌটোর ঢাকনির ছিদ্র দিয়ে দিলীপ একটি সিকি ফেলে দিতেই ছেলের দল সবাই হৈ হৈ করে উঠল।

"বল কি দিলীপদা! একেবারে নগদ একটা সিকি?"

"কেষ্টদার তো রোজ এক সিকি বাঁধা, কিন্তু তুমি হঠাৎ এমন রোজগেরে হয়ে উঠলে কি করে। টাকায় দু পয়সা হলে তার মানে হল আট টাকা তোমার রোজগার। খুব মোটা দাঁও কোথাও মেরেছ বলতে হবে।"

ছাপার কাজ যাঁরা দিতে এসেছেন তাঁদের এসব দেখে শুনে একটু যেন হতভম্বই মনে হল। তা নতুন লোকের পক্ষে একটু ফাঁপরে পড়া আশ্চর্য নয়। পাঁচুদার প্রেস আর ব্যায়ামের আখড়ার এ একটি মজার ব্যবস্থা।

পাঁচুদার প্রেসে ও আখড়ায় যারা হাজিরা দেয় তারা বেশির ভাগই সাধারণ ঘরের ছেলে। কাজকর্মের সুবিধে যে বেশির ভাগেরই নেই তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু পাঁচুদার আখড়ার একটি নিয়ম সবাই মেনে চলে সানন্দে। রোজগার যখন যার যা কিছু হয় তা থেকে টাকায় দু পয়সা 'খুশির খাজনা' তহবিলে সবাইকে দিতে হবে এই এখানকার নিয়ম। এই তহবিল অবশ্য তাদের নিজেদের কাজেই লাগে। মাঝে মাঝে খাওয়া-দাওয়া স্ফূর্তি এই পয়সা থেকে হয় বটে কিন্তু আসলে যা হয় তা নিজেদের মধ্যে যে যখন বিপদে পড়ে তার কিঞ্চিৎ সাহায্যের চেষ্টা। সাহায্যটা নিজেদের জমানো পুঁজি থেকে নেওয়া বলে তাতে গ্লানি থাকে না।

দিলীপ এ তহবিলে নিয়মিত খাজনা দেওয়ার সুযোগ খুব কমই পায় বলে সকলের আজ এত বিস্ময় কোলাহল।

দিলীপকে নিয়ে হাসি-তামাসা আরও হয়ত চলত, কিন্তু পাঁচুদাই সকলকে ধমক দিয়ে থামিয়ে বললেন—"আচ্ছা এখন একটু থামবি তোরা। তোদের জ্বালায় কি প্রেসের কাজ-টাজ সব বন্ধ করে দেব।"

"আরে না, না, কি বল পাঁচুদা!"—ছেলেরা ধমক খেয়ে হেসে উঠল, —"প্রেস বন্ধ হলে আমরা যাব কোথায়! আমরা হলাম তোমার ছাপাখানার ভূত!"

"আচ্ছা ভূতেরা এখন চুপ!"—বলে পাঁচুদা দিলীপকে কাছে ডাকলেন। বললেন,—"এই ঠেলা একটু সামলে দাও তো দিলীপ। শোন, এঁরা এই হ্যাণ্ডবিল ছাপাতে এসেছেন……,"

পাঁচুদা হ্যাণ্ডবিলটা পড়তে সুরু করলেন—"আর ভাবনা নাই অনায়াসে বিনা মূলধনে ব্যবসা করিয়া পয়সা রোজগার করুন—"

এই পর্যন্ত পড়া হতেই ছেলেরা হৈ হৈ করে উঠল।

—"আহা কি শোনালে পাঁচুদা। এই হ্যাণ্ডবিলের জন্যেই তো এতদিন বসে আছি কাল গুণে। বিনা মূলধনে রোজগার! আহা!"

পাঁচুদাকে আবার ধমক দিতে হল—"আহা শোনোই না সবটা।" পাঁচুদা আবার বিজ্ঞাপন পড়তে সুরু করলেন,—"আমাদের পেটেণ্ট করা গভর্নমেণ্ট রেজিস্টার্ড, দাঁতের মাজন, হজমীগুলি, স্নো, পাউডার, টাকের মহৌষধ এক ডজন করিয়া বিক্রয় করিলেই টাকা পিছু তিন আনা করিয়া কমিশন। নিজের পরিশ্রমে বিনা মূলধনে প্রভূত আয়ের এ সুযোগ হেলায় হারাইবেন না। রোজগারের এই নতুন পথ আপনাদের জন্য অবারিত। আসুন, দলে দলে আসুন।"

ছেলেরা সমস্বরে সোল্লাসে এবার চীৎকার করে উঠল—"হুররে! আমাদের সব মুশকিল এইবার তা হলে আসান!"

পাঁচুদার পক্ষেও তাদের থামানো এখন কঠিন। দিলীপই হাত তুলে সকলকে চুপ করিয়ে বললে—"তা আমার কোন ঠেলাটা সামলাতে

হবে বুঝতে পারছি না তো পাঁচুদা! দাঁতের মাজন বা টাকের তেল যদি বিক্রি করতে বল তো রাজী আছি।"

"না, না, তা নয়!"—পাঁচুদা ব্যাখ্যা করে বোঝালেন,—"এঁরা এ বিজ্ঞাপনের একটা ভালো শিরোনামা চাইছেন। সেইটে তোমায় বলতে হবে। শিরোনামা না হলে বিজ্ঞাপন ছাপা যাবে না।"

ছেলেদের মধ্যে একজন বলে উঠল,—"তা মুশকিল আসান দাও না।"

বিজ্ঞাপন যাঁরা ছাপাতে এসেছেন তাঁরা এখানকার কাণ্ডকারখানায় এতক্ষণ একটু থ হয়েই গেছলেন বোধ হয়। এবার তাঁদের একজন সাহস করে মুখ খুললেন,—"আজ্ঞে ওটা বড় সেকেলে খেলো শোনায়।"

"তা হলে 'বেকার সমস্যার সমাধান' দিন"—পরামর্শ দিলে আর একটি ছেলে।

পাঁচুদাই এবার আপত্তি জানিয়ে বললেন,—"না না, চলনসই একটা কথা চাই। ওই দিলীপই পারবে। বল না দিলীপ!"

"বলব?"—দিলীপ একটু হেসে পরোপকারী ব্যবসাদারদের দিকে তাকাল,—"কিন্তু পছন্দ হবে না যে আপনাদের!"

"আচ্ছা আগে বলুনই না।"—দাঁতের মাজন ইত্যাদির মহাজনদের একজন অনুরোধ জানালেন।

দিলীপ সকলের মুখের দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে গম্ভীরভাবে বললে—"পা বাড়ালেই রাস্তা।"

শুনে মহাজন ব্যবসায়ীরা শুধু নয়, সবাই একটু তাজ্জব।

"ওটা আবার কি হল?"—জিজ্ঞাসা করলে একজন মহাজন।

একজন বললেন, —"না মশাই ও নাম চলবে না।"

"চলবে না কি রকম?"—দিলীপই যেন অবাক—"ও তো চলবারই নাম! পা বাড়ালেই রাস্তা! অর্থাৎ পা বাড়াও, রাস্তা আপনি মিলে যাবে-ই।"

ব্যাপারী মহাজনেরা তবু নারাজ।—"না মশাই, নাম নিয়ে ও সব ইয়ার্কি ফাজলামি ঠিক নয়।"

"ইয়ার্কি ফাজলামি!"—দিলীপ এবার গরম,—"পা বাড়ালেই রাস্তা আপনাদের কাছে ইয়ার্কি! তা হলে বলুন গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক রোড আপনাদের কাছে একটা ঠাট্টা, হাওড়া ব্রীজ একটা মুখ-ভেংচি।"

কারখানা থেকে একজন মিস্ত্রী ছেলে এসে এই সময় কেষ্টকে না ডাকলে দিলীপের বক্তৃতা বোধ হয় আরো চলত।

কেষ্টকে ডেকে পাঠিয়েছে তার ট্যাক্সির মালিক গোষ্ঠ সরকার—কেষ্ট তো শুনেই প্রায় খাপ্পা।

—"ডেকে পাঠাবার কি হয়েছে। এখানে আসতে পারে না। মালিক এসেছে বলে কি আমায় সেলাম দিতে যেতে হবে নাকি!"

যে ছেলেটি খবর এনেছিল সে কেষ্টর মেজাজ জানে। একটু ভয়ে ভয়েই বললে,—"না ওখানে কি যেন দরকার। তাই গ্যারেজেই ডাকছে।"

"দরকার যে কি তা জানি,"—বলে কেষ্ট এবার হাসি মুখে উঠে দাঁড়াল, "সেই পুরনো ঝগড়াই আবার করতে হবে। সব ট্যাক্সি-ড্রাইভার এত কামায় আর আমি কেন কুড়ি টাকার বেশী রোজগার করতে রাজী নই।"

কেষ্ট যে রকম মুখ করে বেরিয়ে গেল তাতে মালিকের সঙ্গে এ ঝগড়াকে সে বিশেষ গ্রাহ্য করে বলে মনে হল না।

গ্যারেজে গিয়ে গোড়ায় সে তো গোষ্ঠ সরকারের দিকে দৃক্‌পাত পর্যন্ত করলে না। বড় মিস্ত্রীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি? ব্রেক ঠিক হয়ে গেছে?"

"হ্যাঁ হয়েছে। তবে লাইনিংগুলো—" বড় মিস্ত্রী আরো কি বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু গোষ্ঠ হালদার বাধা দিলে।

"ও সব এখন থাক হে!" কেষ্টর দিকে ফিরে সে আবার বললে—"কই গাড়ির চাবিটা দেখি?"

গোষ্ঠ সরকারের ধরন-ধারন আজ একটু যেন আলাদা। রোগা শুকনো মানুষটা। গলার আওয়াজ সরু কর্কশ। সাধারণতঃ সব কথাই নালিশের সুরে বলাই স্বভাব। দুনিয়া যেন চারদিকে তাকে ঠকাবার ষড়যন্ত্র সাজিয়ে রেখেছে। সে শুধু কাঁদুনে গলার করাতে সে সব জাল কেটে বেরুচ্ছে। নিজেই মালিক হলেও কেষ্টকে সে অন্য সময় বেশ একটু সমীহ করেই চলে! আজ কিন্তু গলার স্বরটা তার একটু বেশী তীব্র নয় সুরও যেন অন্য রকম।

চাবি চাওয়ার ধরনটাই কেষ্টর ভাল লাগে নি। বিরক্তের বদলে সে একটু অবাক হয়েই জিজ্ঞাসা করলে,—"চাবি, চাবি নিয়ে আপনি কি করবেন?"

"তুমি দাও না আগে।"—গোষ্ঠ সরকার তার কাঁদুনে গলায় যথা-সম্ভব ভারিক্কী ভাব আনবার চেষ্টা করলে। কেষ্ট ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে চাবিটা তার হাতে দিতেই গোষ্ঠর আসল মতলব বোঝা গেল।

চাবিটা হাতে পেয়েই কয়েক পা এগিয়ে বেশ খানিকটা ব্যবধান রেখে গোষ্ঠ সাহস করে জানিয়ে দিলে—"গাড়ি তোমাকে আর চালাতে হবে না তাই চাবি নিলাম।"

গ্যারেজের সবাই কেষ্টর মতই অবাক। গোষ্ঠ হালদার ট্যাক্সির রোজগার নিয়ে কেষ্টর সঙ্গে যতই ঝগড়া করুক কেষ্টকে ছাড়িয়ে আর কাউকে বহাল করবার মত বোকা সে নয় বলেই সবাই জানে। কেষ্ট রোজগার বেশী করে না যেমন তেমনি তার হাতে গাড়ি দিয়ে চুরি বদমায়েশি অযত্ন অবহেলায় লোকসানেরও ভয় নেই। গাড়ি একেবারে তার বুকের হাড়। মেরামতী খরচ পর্যন্ত নেই বললেই হয়। সেই কেষ্টকে হঠাৎ গোষ্ঠ সরকার এক কথায় বিনা কারণেই বরখাস্ত করছে!

কেষ্টর নিজের কাছেও ব্যাপারটা অবিশ্বাস্য। সে তার স্বভাবমাফিক ধমক দিয়ে ওঠে,—"গাড়ি চালাতে হবে না মানে? শুনলেন তো, ব্রেক ঠিক হয়ে গেছে।"

গোষ্ঠ তখন আরো খানিকটা দূরে সরে গেছে। তীক্ষ্ণ স্বরে বললে,

—"ব্রেক ঠিক হয়ে গেছে তো হয়েছে কি। তোমাকে দিয়ে আর গাড়ি চালাব না।"

কথাটা একেবারে স্পষ্ট হলেও কেষ্টর ঠিক মত সমঝে নিতে একটু সময় লাগে। দিলীপ ও প্রেসের আর কয়েকজন তখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে।

দিলীপই কেষ্টর হয়ে বললে,—"গাড়ি যখন আপনার তখন আপনি যাকে খুশি দিয়ে চালাতে পারেন। কেষ্টরও গাড়ির অভাব হবে না, আপনারও ড্রাইভারের। কিন্তু হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই কেষ্টর হাত থেকে গাড়ি কেড়ে নেওয়ার কারণটা তো জানা দরকার।"

"কারণ জানতে চান?"—এবার উত্তেজনায় গোষ্ঠর গলা যেন স্টীম রোলারের হুইস্‌ল্‌। "জানেন, কেষ্টর জন্যে আমার গাড়ির লাইসেন্স পর্যন্ত যেতে বসেছে। নেংটি ইঁদুর হয়ে উনি গেছেন নেকড়ের পেছনে খোঁচা দিতে। তা ওঁর সাহস থাকে উনি যান। আমি ছাপোষা সামান্য মানুষ। আমি ওঁর জন্যে পথে বসতে পারব না।"

"ওঃ, চৌধুরী সাহেব কল টিপেছেন বুঝি?"—কেষ্টই এবার মন্তব্য করলে। তার স্বর ধারালো বিদ্রূপ থেকে ক্রমশঃ ঝাঁঝাল হয়ে উঠল রাগে—"এটা মগের মুল্লুক বোধ হয় নয়। আইন ভাঙবেন তিনি আর সাজা পাবে অন্যে!"

"ওসব বড় বড় কথা পার্কে দাঁড়িয়ে বক্তৃতায় বলো গে যাও।" গোষ্ঠ সরকার খেঁকিয়ে উঠল,—"আমায় শুনিয়ে লাভ কি!"

"আচ্ছা, যেখানে শোনাবার সেখানে শুনিয়ে আসব।" কেষ্টর গলা এখন ঠাণ্ডা কিন্তু কঠিন।—"তবে আপনার কাছেও একটা ভুল স্বীকার করছি।"

"নিজের ভুল তাহলে বুঝেছ!"—গোষ্ঠ সরকার বিদ্রূপ করবার চেষ্টা করলে।

"হ্যাঁ বুঝেছি। তবে ভুলটা এই যে, গলাটা মেয়েলি হলেও আপনাকে সত্যি বেটাছেলে ভেবেছিলাম।"

গোষ্ঠ সরকার একেবারে চিড়বিড়িয়ে উঠল এ-কথায়।—"কি! মুখ সামলে কথা বলবে কেষ্ট!"

কেষ্ট হাসল। "সামলে আছি বলেই তো শুধু ওইটুকু বললাম। নইলে—"

নইলে সে কি বলত কে জানে। কিন্তু দিলীপ এগিয়ে এসে কেষ্টকে এবার থামিয়ে দিলে। বললে, "কাকে মিছি মিছি কথা শোনাচ্ছ কেষ্ট। কেঁচো হঠাৎ মাথা তুলে দাঁড়াবে তুমি আশা কর। দুনিয়ায় এত কেঁচো না থাকলে দুশমনের জুতো তাদের মাড়িয়ে যেতে সাহস পায়!"

"ও, কেঁচো! আমি কেঁচো। আচ্ছা কেঁচোর কামড়ই আমি বুঝিয়ে দেব!" মুখে আস্ফালন করলেও গোষ্ঠ সরকার ট্যাক্সিতে উঠে সরে পড়তে দেরি করল না।

কেষ্টকে তার পরই বেরিয়ে যেতে দেখে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে,—"তুমি আবার কোথায় যাচ্ছ?"

তিক্তভাবে হেসে কেষ্ট বললে,—"না, ও কেঁচোর পেছনে নয়, যাচ্ছি একেবারে খোদ দুশমনের ডেরায়।"

নয়

কেষ্টকে তার গন্তব্য স্থানে রওনা করে মায়াদের বাড়ির সামনে এখন একটু যাওয়া যায়।

সেখানেও একটি ট্যাক্সি এসে সবে থেমেছে। ট্যাক্সি থেকে যিনি নামলেন তাঁকে বেশ সুবেশ সুপুরুষ ভদ্রলোক বলা চলত কিন্তু পোশাকের মত তাঁর চেহারাতেও কোথায় এমন একটা খেলো জীর্ণতার ছাপ আছে যে একটু ভাল করে লক্ষ্য করলেই বাইরের চাকচিক্যের ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায়। ভদ্রলোকের পরনে হাওয়াই শার্ট আর প্যান্ট, পায়ে একটা বাহারী চপ্পল। কিন্তু পোশাকের কাপড় থেকে জুতোর বাহারে পর্যন্ত সস্তা চটকটাই সুস্পষ্ট।

ভদ্রলোক ট্যাক্সি থেকে নেমে মিটারটা একবার দেখে নিয়ে বাড়ির ভেতর গিয়ে ঢোকেন।

"মায়া! মায়া কোথায় গেলি!"

তাঁর ডাকে মায়ার আগে বেণুই প্রথম ছুটে এসে তাঁকে জড়িয়ে ধরে বলে,—"বাবা! বাবা! আজ কি হয়েছে জানো?"

ভদ্রলোকের পরিচয় আর বেশী কিছু দেবার নেই। বোঝাই যাচ্ছে তিনি মায়ার দাদা ও বেণুর বাবা! নাম নির্মল হালদার।

ছেলের উচ্ছ্বাসের প্রতি বিশেষ মনোযোগ না দিয়ে নির্মল হালদার মায়াকে হুকুম করেন—"দুটো টাকা দে তো শীগগির।"

ব্যাপারটা যেন কিছু নয়—হুকুমের সুরটা সেই রকম হলেও মায়ার তাতে ভ্রূকুঞ্চিত হয়ে উঠেছে দেখা যায়।

"কেন? এখুনি দু টাকার আবার কি দরকার হল?"—বলে মায়া দাদার দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকায়।

"আঃ বড় বাজে বকিস্ তুই! এদিকে আমার ট্যাক্সির মিটার চড়ছে।"—নেহাত হাল্কাভাবে কথাগুলো বলার চেষ্টা করলেও নির্মলবাবু

বোনের মুখের দিকে সোজাসুজি তাকাতে পারেন না। অন্য দিকে চোখ ফিরিয়েই তাচ্ছিল্যের সুরে বলেন,—"দুটো টাকা তো মাত্র চাইছি।"

"ট্যাক্সির ভাড়ার জন্যে নিশ্চয়।"—মায়ার স্বর অত্যন্ত গম্ভীর। দাদার উত্তরের অপেক্ষা না করেই সে আবার তিক্ত স্বরে বলে,—"তা দুদিন বাদে ট্যাক্সি চড়ে বাড়ি আসতে পারো আর ভাড়াটা নিজে দিতে পারো না।"

"এই দেখো!"—নির্মল বোনের অনুযোগের সুরটাকে আমলই দেন না। হেসে বলেন,—"এই দুটো টাকা আর আমি দিতে পারি না। আমার কাছে খুচরো ভাঙানি নেই যে।"

মায়ার মুখ কিন্তু আরো কঠিন হয়ে ওঠে।—"কেন মিছে কথা বলছ দাদা! কি করে এ সংসার চলছে তুমি ভাল করেই জানো। তবু নবাবী করে ট্যাক্সি চড়ে এসে আমার কাছে ভাড়া চাইতে লজ্জা করে না।"

নির্মলবাবু এবার অন্য সুর ধরেন। ক্ষুব্ধ হবার ভান করে বলেন,—"ওই জ্বালায় তো বাড়ি আসতে ইচ্ছে করে না। এলেই শুধু তোর বক্তৃতা আর বক্তৃতা! দিবি তো মাত্র দুটো টাকা! বলছি আমার ভাঙানি নেই, তাই—

দাদার কথায় মায়া এবার বাধা দেয়,—"বেশ দাও তোমার কি আছে, আমি ভাঙিয়ে দিচ্ছি।"

"হ্যাঁ আমি কড়কড়ে নোটটা তোকে দিই, আর তুই মেরে নিস্!—" নির্মলবাবু আবার হাল্কা পরিহাসের সুরে ফিরে যান,—"সেটি হচ্ছে না বাবা! আমি অত কাঁচা ছেলে নই!"

"আশ্চর্য, দাদা আশ্চর্য!"—মায়ার ভৎ্সনার স্বর বেদনাতেই এবার গাঢ়!—"তুমি যে কত কাঁচা ছেলে তা যদি সত্যি তুমি জানতে! এই বয়সে জীবনটাকে কি করে ফেললে বল তো? মা-মরা এই ছেলেটা,— তার কথাও কি একবার মনে হয় না? একবারও ভাবো না, কি করে সে বাঁচবে কি করে মানুষ হবে—"

বাইরে ট্যাক্সির হর্নের আওয়াজ শুনে একটু থেমে মায়া আবার হতাশ-ভাবে বলে,—"এসব কথা তোমায় আর বলে লাভ নেই জানি। তবু কেন যে বলি—"

কথাটা শেষ না করেই—মায়া ঘরের ভেতর চলে যায়।

বাবা ও পিসিমণির এরকম ঝগড়ার দৃশ্যে বেণু বোধ হয় অভ্যস্ত। এতক্ষণ কথা বলবার ফাঁক না পেয়েই সে বুঝি চুপ করেছিল। কিন্তু আর কতক্ষণই বা থাকা যায়! কত কথা তার জমা হয়ে আছে বাবাকে শোনাবার। তার জীবনের আশ্চর্যতম ঘটনা সম্বন্ধে কেউ উদাসীন হতে পারে সে ভাবতেই পারে না।

উচ্ছ্বসিতভাবে সে আবার তাই সুরু করে,—"জানো বাবা, আজ আমাদের ভিখু একটু হলে মারা পড়ত,—"

কিন্তু ভিখুর প্রায় মারা পড়ার রোমাঞ্চকর কাহিনীতে বাবার কোন আগ্রহই দেখা যায় না। মায়া তখন ভেতর থেকে দুটি টাকা নিয়ে এসে দাদার হাতে দিয়েছে। টাকাটা হাতে নিয়েই নির্মল হালদার বাইরে চলে যান।

দরজার বাইরে গিয়েই তাঁর আরেক চেহারা! ধীরে সুস্থে বড়মানুষী চালে ট্যাক্সির কাছে গিয়ে দাঁড়িয়ে একটু বিরক্তির সুরেই জিজ্ঞাসা করেন —"কত হয়েছে কত?"

"দেড় টাকা!"—এতক্ষণ অপেক্ষা করতে হওয়ার জন্যেই ড্রাইভারের মেজাজ বোধ হয় একটু রুক্ষ।

নির্মলবাবু দুটো টাকা তার হাতে তাচ্ছিল্য ভরে দেন। ড্রাইভার বাকি চেঞ্জ দেবার জন্যে ব্যাগ খুলতে যে রকম উদারভাবে হাত নেড়ে তা প্রত্যাখ্যান করেন তাতে তার বনেদী বদান্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ করবার কোন অবকাশ রাখেন না বলেই তাঁর বিশ্বাস।

তারপর চলে আসতে গিয়ে হঠাৎ যেন কি মনে পড়ায় তিনি ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করেন,—"অত হর্ন দিচ্ছিলে কেন? ভাড়া না দিয়ে পালাব ভেবেছিলে?"

আট আনা বকশিশ পেয়ে ড্রাইভারকে একটু খোশামোদ তখন করতেই হয়।

—"আজ্ঞে কি বলছেন স্যার! চেহারা দেখে আমরা মানুষ চিনি না।"

পয়সা যেখান থেকেই আসুক এইটুকুর জন্যেই নির্মলবাবুর ট্যাক্সি চড়া। ভেতরে গলে গেলেও মুখে একটা ক্ষীণ বিদ্রূপের আভাস রেখে তিনি বলেন,—"সবাই চেনে না কিনা!"

বাড়ির ভেতর ঢুকতে না ঢুকতে বেণু আবার এসে তাঁকে দখল করে।

"শোনো না বাবা, ওই রকম একটা ট্যাক্সি ভিখুকে চাপা দিয়েছিল। দারোগাবাবু নিজে সব নালিশ টুকে নিয়ে গেছে।"

"দারোগাবাবু।"—মেজাজটা নির্মল হালদারের এখন অত্যন্ত প্রসন্ন বলে উৎসাহভরে তিনি সুরু করেন,—"এই থানার দারোগাবাবু! আরে আমার নাম বলিস্ নি কেন? সে আমার চেনা বন্ধু লোক!"

বাবার কথা একবার সুরু হলে আর থামবে না জেনে বেণু তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ জানাবার চেষ্টা করে,—"না বাবা এ সেরকম দারোগাবাবু নয়। দাড়ি গোঁফ নেই, খুব ভালো লোক।"

দারোগা মাত্রেই দাড়ি গোঁফ থাকবে এবং মানুষ হিসেবে ভালো না হওয়াটাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক এ ধারণা বেণুর যেখান থেকেই হোক নির্মল হালদার তার মর্যাদা রাখেন না। নিজের কথাতেই মশগুল হয়ে বলতে সুরু করেন—"আরে জানি জানি। এ থানার দারোগার কথা আমায় কি বলবি! দু'বেলা ওখানে আড্ডা দিই আর দারোগাবাবুকে চিনি না!"

ক্ষুব্ধ মন নিয়ে এ প্রসঙ্গে কোন কিছু বলার ইচ্ছেই মায়ার ছিল না। কিন্তু বেণুর হতাশ মুখটার দিকে চেয়ে তার দুঃখ ও রাগ হয়। বেশ একটু রূঢ়ভাবেই সে বলে—"না দাদা এ দারোগাকে তুমি চেনো না।"

"চিনি না, বলিস্ কি রে?"—নির্মল হালদার এরকম অবিশ্বাস্য কথা যেন কখনো শোনেন নি।

কিন্তু মায়া আজ নির্মম। কঠিন স্বরে বলে, "না দাদা সত্যি তুমি চেনো না। কিন্তু সেটা কথা নয়। তোমার বানানো বাহাদুরীর গল্পও রোজই শুনছি। ছেলেটা অত আগ্রহ করে যা বলতে চাইছে তা না হয় একবার একটু শুনলে।

নির্মল হালদারের প্রসন্নতা কিন্তু অত সহজে নষ্ট হবার নয়। বিন্দুমাত্র অপ্রস্তুত না হয়ে তিনি বললেন—"আচ্ছা, শুনব না কেন? শোনবার জন্যেই তো বসছি। হ্যাঁ বল বেণু শুনি।"

বেণুকে অবশ্য আর বলবার দরকারই ছিল না। ভিখুব চাপা পড়ার পর আশ্চর্য কাহিনী সে সোৎসাহে সুরু করে দেয়।

দশ

পরের দিন সকাল বেলা।

যোশেফ খুড়ো সাধারণতঃ একটু বেলাতেই ওঠেন। ঘুম ভাঙলেও বিছানায় শুয়ে শুয়ে যা হোক একটা ইংরিজি কাগজ উল্টে পাল্টে পড়া তাঁর অভ্যাস। সে কাগজও আনকোরা দৈনিক নয়। রাস্তার ধারের পুরানো বই কাগজের স্টল থেকে ফেরত দেবার কড়ারে সামান্য কিছু মাশুল ধরে দিয়ে আনা বিলাতের সস্তা সাপ্তাহিক। বেশীর ভাগই 'নিউজ অফ দি ওয়ার্লড' জাতীয় কাগজ। দিলীপ এই নিয়ে তাঁকে ঠাট্টা করে মাঝে মাঝে,—"Uncle বুঝি Home-এর খবর পড়ছেন ?" যোশেফ সাধারণতঃ হাসেন কিন্তু মাঝে মাঝে চটে ওঠেন,—"হ্যাঁ তা নয় তো কি তোমাদের ঐ জোলো insipid কাগজগুলো পড়ব। শুধু কোন্ মন্ত্রী কোথায় কি করলেন আর কি বক্তৃতা দিলেন, তারই report !" দিলীপ আরো চটাবার জন্যে হয়ত বলে,—"হ্যাঁ তা বটে, এদেশে এখনো খুন জখম শয়তানীর মত রোমাঞ্চকর ব্যাপারেই মশগুল হতে কাগজ-গুলো শেখে নি।" তর্কে কোণঠাসা হয়ে যোশেফ খুড়ো ভিন্ন যুক্তি দিয়ে সামলাবার চেষ্টা করেন,—"কেন এসব পড়ি তা তোমায় কি বোঝাব ! পুলিসে চাকরি কখনো করো নি তাহলে বুঝতে Crime কত বড় একটা scientific subject."

"ও, আপনার আসল interest হল scientific ? সেইটে মনে থাকে না।"—বলে দিলীপ কথাটা আর বাড়তে দেয় না খুড়োর মেজাজ বুঝে।

আজ কিন্তু আগাগোড়া পড়া কাগজটায় যোশেফ খুড়োর বিশেষ মনোযোগ নেই, শুয়ে শুয়ে কাগজ পড়ার ছুতোয় দিলীপের দিকেই তিনি মাঝে মাঝে দৃষ্টি দিচ্ছিলেন।

দিলীপ রোজ তাঁর চেয়ে অনেক সকালে ওঠে সত্যি কিন্তু এত ভোরে দাড়ি কামাবার উৎসাহ তার তো বড় দেখা যায় না।

নিজের গাম্ভীর্য ও মর্যাদা বজায় রেখে কিছু জিজ্ঞাসা করতে যোশেফ খুড়োর বাধে কিন্তু আসল ব্যাপারটা না জেনেও স্বস্তি পান না।

দাড়ি কামান শেষ করে মুখটা ছেঁড়া তোয়ালেতে ঘষে নিয়ে আলনাতে ঝোলান কাপড়টায় দিলীপ এবার টান দেয়। একে পুরানো জীর্ণ কাপড় তার ওপর দিলীপের পোড়া বরাতে আনলার একটা পেরেকে না কিসের খোঁচায় আটকে গিয়ে কাপড়টা ছিঁড়ে যায়।

খোঁচ থেকে ছাড়িয়ে দিলীপ কাপড়টার দিকে তাকিয়ে একবার মুখভঙ্গি করে যেন নিজের মনেই বলে,—"ছিঁড়লেই রেহাই পাবে ভেবেছ! ভুলে যাও ওসব আবদার! এখনো ক'ধোপ তোমায় চালাই দেখো। দেখি uncle, আপনার ছুঁচ-সুতোটা।"

শেষ কথাগুলো যোশেফের দিকে ফিরেই সে বলে।

আগাগোড়া সব কিছু লক্ষ্য করলেও যোশেফ-খুড়ো এতক্ষণ সাড়াশব্দ দেন নি। দিলীপের কাপড়টা হঠাৎ ছিঁড়ে যাওয়ায় তাঁর মুখে কিন্তু হাসি ফুটে উঠেছিল একটু।

সেটা চেপে তিনি ভ্রূকুটি করে জিজ্ঞাসা করেন,—"ছুঁচ-সুতো কি হবে?"

"কি হবে বুঝতে পারছেন না!"—ছেঁড়া কাপড়টা তাঁকে দেখিয়ে দিলীপ বলে,—"সেলাই করতে হবে!"

"You want to mend, that rotten rag!"—যোশেফের গলায় এবার সত্যিকার ঝাঁঝালো বিদ্রূপ—"ওই ছেঁড়া পচা কানি আবার কেউ সেলাই করে! ফেলে দাও আঁস্তাকুড়ে, Throw it away."

"খুব তো সাহেবী মেজাজে বললেন, Throw it away! তার পর কি পরে বার হব শুনি? ধুতি তো সর্বসাকুল্যে দুইখানি মাত্র। তার একটি সম্প্রতি রজকালয়ে"—দিলীপের মুখে কৌতুকের হাসিটা ঠিক স্বতঃস্ফূর্ত নয়।

"কতবার তোমায় বলেছি,"—যোশেফ খুড়ো বিছানায় উঠে বসে

চড়া গলায় বলেন,—"Dont use those dirty native dhoties. Try one of my pants."

দিলীপ হেসে ওঠে।—"আপনার প্যাণ্ট পরব? আপনারই wardrobe-এ কটা প্যাণ্ট আছে?"

"সে তোমার ভাবতে হবে না!"—যোশেফ উঠে দাঁড়িয়ে হ্যাঙ্গারে সযত্নে পাট করে ঝোলান একটা প্যাণ্ট নামিয়ে এনে দিলীপের খাটের ওপর রেখে গম্ভীরভাবে বলেন,—"Here try this."

দিলীপ একবার প্যাণ্টটা ও একবার যোশেফ খুড়োর দিকে তাকিয়ে মুচকে মুচকে হেসে বলে,—"হুঁ, বুঝেছি।"

"কি বুঝেছ?"—যোশেফ জ্বলে ওঠেন।

"বুঝেছি আপনার মতলব!"—দিলীপ মুখখানা যথাসাধ্য গম্ভীর করে বলে,—"একটু একটু করে এই ভাবে প্যাণ্ট ধরানো থেকে সুরু করে শেষে একদিন একেবারে গির্জায় নিয়ে গিয়ে তুলতে চান, কেমন?"

"তা যদি তুলি, তাহলে তুমি, কি বলে, কি বলে"—রাগেই যেন যোশেফের মুখ দিয়ে আর কথা বার হয় না। দিলীপ তাঁর হয়ে বাকি কথাটা জুগিয়ে দেয়,—"তরে যেতাম এই তো!"

"আলবৎ!"—যোশেফ খুড়োর গলার ঝাঁজের সঙ্গে চোখের কৌতুক-টুকুও লুকোন থাকে না।

দিলীপ এখনো পরম গাম্ভীর্যের ভান করে বলে,—"সেই ভয়েই তো আছি। আপনার সঙ্গে থাকতে থাকতে কোন দিন কৃষ্ণ কৃষ্ণ আর খৃষ্ট খৃষ্ট এক করে ফেলি—! যাক্ প্যাণ্টটায় একটু গঙ্গাজল ছিটিয়ে নিতে হবে।"

দুজনেই এবার যেভাবে হেসে ওঠে তাতে বোঝা যায় এ রসিকতা তাদের পুরানো।

দরজার বাইরে দিয়ে কাকে যেতে দেখে যোশেফ এবার হাঁক দিয়ে ওঠেন—"এই ছোকরা!"

ময়লা হাফ প্যাণ্ট ও ছেঁড়া গেঞ্জি পরা একটি ছেলে ভেতরে এসে

সাড়ম্বরে সেলাম করে দাঁড়ায়। পোশাক থেকে মুখভঙ্গি পর্যন্ত সব কিছুতে একেবারে মার্কামারা ঝানু চায়ের দোকানের 'বয়'-এর চেহারা।

যোশেফ আমিরী চালে বলেন,—"ব্রেকফাস্ট কাঁহা ?"

"লাতা হুঁ সাব।" বলে ছোকরা পিছন ফিরতেই যোশেফ আবার ডাক দিয়ে বলেন,—"জলদি লানা দোনোকে লিয়ে।"

ছোকরা যে রকম মুখভঙ্গি করে আবার সেলাম করে বেরিয়ে যায় তাতে যোশেফ সাহেবের ব্রেকফাস্ট ব্যাপারটা সামান্য নয় বলেই মনে হয়।

দিলীপ কিন্তু এ ব্রেকফাস্টে আপত্তি জানায়।

"দুজনের জন্যে কেন বললেন ? আমি কিছু খাব না।"

"ওঃ খাবে না,"—যোশেফ খেঁকিয়ে ওঠেন,—"তোমার জন্যে Grand কি Great Easterr-এ ব্রেকফাস্ট অর্ডার দেওয়া আছে বোধ হয়।"

"না তা নেই।"—দিলীপ যোশেফ-খুড়োর প্যাণ্টটা পরতে পরতে হেসে বলে,—"তবে আমি Dieting করছি কি না ! বেশী খাওয়া একটা বড়মানুষী বর্বরতা বলে আমার ধারণা। কত কম খেয়ে শরীর ভাল রাখা যায় আমি তারই Experiment করছি।"

"বাজে বোকো না ! Don't talk rot।"—এক ধমকে যোশেফ-খুড়ো দিলীপকে থামিয়ে দেন।

দিলীপ ধমক খেযে অন্য সুর ধরে—"বেশ বাজে বকব না, কিন্তু আমার চক্ষুলজ্জা বলে একটা কিছু তো আছে। খাওয়াপরা সব আপনার ওপর কতদিন চালাব !"

"চালিয়ো না। কে তোমাকে চালাতে বলছে ?"—যোশেফ খুড়োর গলা একেবারে যেন রসকষহীন। "Get a good job and get out।"

চায়ের দোকানের ছোকরা ব্রেকফাস্ট সমেত চায়ের ট্রে নিয়ে না ঢুকলে যোশেফের বকুনি বোধ হয় আরো খানিকক্ষণ চলত।

ছোকরা বেশ কেতাদুরস্তভাবে যোশেফ-খুড়োর ছোট টেবিলের ওপর দুটি চায়ের পেয়ালা আর দুটি কাগজের ঠোঙা সাজিয়ে রেখে হেসে সেলাম করে বেরিয়ে যায়।

যোশেফ এবার গম্ভীরভাবে ডাক দেন—"এসো।" সে ডাক আর অবজ্ঞা করবার নয় দিলীপ বোঝে। প্যাণ্ট পরা সেরে অগত্যা তাকে এসে ব্রেকফাস্টে বসতেই হয়। যোশেফ সাহেব একটি ঠোঙা তার হাতে তুলে দেন।

"বাঃ আজ তো তোফা Menu দেখছি।"—দিলীপ মুখ চোখের অদ্ভুত ভঙ্গি করে বলে,—"parched rice a la Bengalaise !"

যোশেফ সাহেব হেসে বলেন,—"হ্যাঁ cheap and nourishing."

তা যোশেফ সে কথা বলতে পারেন। ঠোঙায় মুড়ি আর ছোলাসেদ্ধ !

কয়েক গ্রাস খেয়ে যোশেফ এতক্ষণে আর আসল প্রশ্নটা না করে পারেন না !—"তা আজ এত সকালে কোথায় বেরুন হচ্ছে ?"

"ওঃ সেইটেই বুঝি আপনাকে বলা হয়নি !" দিলীপ নাটকীয়ভাবে জানায়,—"I am now the agent of a big pharmaceutical firm—মস্তবড় ওষুধের কারখানা !"

"বটে ! তা কাজটা কি !"—যোশেফ ভ্রু-কুঁচকে জিজ্ঞাসা করেন।

"কাজ ? কাজ পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ তিনটি মহৌষধির নাম প্রচার। ধন্বন্তরি মাজন, ধন্বন্তরি মলম আর ধন্বন্তরি মাথার তেল। ধন্বন্তরি কোম্পানির নাম এখনো বোধহয় শোনেন নি। কিন্তু বেশী দিন অপেক্ষা করতে হবে না। দুদিন বাদেই দেখবেন দুনিয়ার ঘরে ঘরে ধন্বন্তরি ওষুধ। ধন্বন্তরি দুনিয়া থেকে আধি ব্যাধি দূর করতে বেরিয়েছে, তার স্লোগ্যান হল পা বাড়ালেই রাস্তা !"

দিলীপের কথার ধরনে যোশেফ না হেসে পারেন না। দিলীপ গম্ভীর হবার ভান করে বলে,—"আপনি হাসছেন ! ধন্বন্তরির জয়যাত্রাটা খুব শুভ মনে হচ্ছে না তো !"

এগারো

দিলীপের অনুমান মিথ্যে নয়। সারা সকাল নানা জায়গায় হানা দিয়েও ধন্বন্তরির আশ্চর্য মহৌষধি সম্বন্ধে কাউকেই সে আগ্রহান্বিত করতে পারে নি। চেষ্টার ত্রুটি তার ছিল না। কিন্তু কেউ যোশেফ খুড়োর মত হেসেছে, কেউ সরাসরি বিরক্ত মুখে দরজা দেখিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু তবু অত সহজে হাল ছাড়লে তো চলে না। বেলা এগারোটা নাগাদ তাকে বেশ একটি বড় মনিহারী দোকানে ঢুকতে দেখা গেল। হাতে তার একটা বড ক্যাম্বিসের ব্যাগ। তার গায়ে মোটা মোটা বড হরফে লেখা—ধন্বন্তরি মহৌষধি।

বেশ চালু বড় দোকান। খদ্দেরের ভিড় এত বেলাতেও কম নয়। দিলীপ কাউণ্টারের ধারে এসে দাড়াতে দোকানের এক কর্মচারী তার কাছে যথারীতি এগিয়ে এল।

"কি চাই ?"

উত্তর না দিয়ে দিলীপ ব্যাগটা খুলে তার ভেতর থেকে একটি পিচবোর্ডের ওপর ছাপানো বিজ্ঞাপনের কাঠামো বার করে কাউণ্টারের ওপর রাখল।

বড় বড় জ্বলজ্বলে হরফে তার ওপব লেখা—ধন্বন্তরির তিনটি মহৌষধি, ধন্বন্তবি মলম, ধন্বন্তরি মাজন, ধন্বন্তরি মাথার তেল।

কর্মচারী কিছু বলার আগে দোকানের মালিকই ভ্রুকুটি করে এগিয়ে এলেন—"এসব কি ?"

গলার স্বরেই অভ্যর্থনার স্বরূপটা দিলীপের বোঝা উচিত ছিল। কিন্তু সে নির্বিকার। ব্যাগ থেকে একটা হ্যাণ্ডবিল বার করে প্রসন্নমুখে মালিকের হাতে সে দিয়ে বললে,—"পড়েই দেখুন না ?"

একবার হ্যাণ্ডবিলটার দিকে দৃষ্টি দিয়েই মালিক সেটা দিলীপের

দিকে ঘৃণাভরে ছুঁড়ে দিলেন—"যান যান মশাই। বেচাকেনার সময়ে বাজে ঝামেলা করবেন না।"

দিলীপ ততক্ষণে ব্যাগ থেকে তার ওষুধপত্র বার করে ফেলেছে। মালিকের কথাগুলো যেন শুনতেই পায় নি এইভাবে দুটি কৌটো ও একটি শিশি কাউণ্টারের ওপর সাজিয়ে রেখে সে অম্লানবদনে পরিচয় দিতে সুরু করলে,—"এই হল ধন্বন্তরি দন্তরুচি—এক কৌটো চার আনা তিন নয়া পয়সা। এক ডজন নিলে দারুণ সুবিধে—নয়া পয়সার হিসেব আর করতে হবে না। মোট তিন টাকা!"

খদ্দেরদের কেউ কেউ তখন হাসতে সুরু করেছে।

মালিক কিন্তু জ্বলে উঠলেন,—"আচ্ছা বেয়াড়া লোক তো মশাই আপনি! এটা কি মুদিখানা পেয়েছেন! হটান এসব!"

মালিকের হাত নাড়ায় বিজ্ঞাপনের বোর্ডটা কাউণ্টার থেকে দোকানের মেঝেতেই পড়ে গেল।

দিলীপ তবু প্রশান্তির প্রতিমূর্তি। মেঝে থেকে বিজ্ঞাপনটা তুলে আবার কাউণ্টারের ওপর রেখে যেন পরম সহিষ্ণুতার সঙ্গে সে বললে,—"ছিঃ অত অধৈর্য হলে কি দোকানদারি চলে! শান্ত হোন!"

মালিক আগুন হয়ে উঠলেন,—"কি! আবার উপদেশ ঝাড়ছেন! আমারই দোকানে ঢুকে আমায় উপদেশ!"

দিলীপ তাঁর রাগটা যেন এতক্ষণে লক্ষ্য করে অবাক।

"আপনি যেন বিরক্ত হচ্ছেন মনে হচ্ছে।"

"মনে হচ্ছে!"—মালিক একেবারে বোমার মত ফেটে পড়লেন,—'আপনার এতক্ষণে মনে হচ্ছে আমি বিরক্ত হচ্ছি। এত সূক্ষ্ম আপনার বুদ্ধি যে আমার বিরক্ত হওয়াটা ধরে ফেলেছেন!"

অতি কষ্টে নিজেকে সামলে মালিক তারপর কড়া গলায় বললেন,—"আপনি! আপনি যাবেন কিনা এখান থেকে?"

"নিশ্চয় যাবো!" দিলীপের মুখে সেই অবিচলিত প্রসন্নতা।—"তার

জন্যে আপনি একটুকুও ব্যস্ত হবেন না। শুধু আমার কথাগুলো শেষ না করে যাওয়া কি উচিত হবে !"

মালিকের মুখ দিয়ে রাগে তখন আর কথাই বার হচ্ছে না। সেই সুযোগটুকু নিয়ে দিলীপ আবার সুরু করলে,—"দেখুন যে সৌভাগ্য আপনি আজ হেলায় দরজা থেকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, একদিন হয়ত তারই জন্যে আফসোসের আপনার—নমস্কার !"

নমস্কারটা মালিককে নয়, দোকানের দরজা দিয়ে সবেমাত্র ঢুকে যে খরিদদার তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তাকেই। খরিদদার আর কেউ নয় স্বয়ং মায়া।

মায়া সামান্য একটু হাত তুলে দিলীপের নমস্কারের জবাব দিয়ে দোকানে নিজের প্রয়োজন জানাল,—"একটা নীল পেন্সিল দেবেন তো।"

একজন কর্মচাবী পেছনের শেলফ থেকে নীল পেন্সিলের বাক্সটা মায়ার সামনে ধরার আগেই দিলীপ প্রথম অবাক হওয়ার ধাক্কাটা সামলে নিয়েছে।

মালিকের বদলে মায়াকেই উদ্দেশ করে কাউণ্টারের ওপর থেকে ওষুধগুলো তুলে নিয়ে সে অনুরোধ জানাল,—"নেবেন নাকি একটা ? সব একেবারে ধন্বন্তরি !"

উদাসীন হয়ে অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকা এর পর আর সম্ভব নয়। মায়া যথাসম্ভব গম্ভীরভাবে দিলীপের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলে—"কি এগুলো ?"

"কি দেখতে পাচ্ছেন না ! আশ্চর্য সব মহৌষধি, বিংশ শতাব্দীর বিস্ময়। আপনি যে কোন একটা—আচ্ছা এই দন্তরুচিটাই নিয়ে দেখুন, মাত্র চার আনা তিন নয়া পয়সা। যাক্‌গে ও নয়া পয়সা না দিলেও চলবে।"

এর পর গাম্ভীর্য আর বজায় রাখা যায় ! মায়া তবু যথাসাধ্য হাসি চেপে বললে,—"বেশ ওইটে দিন তাহলে !"

মায়া পেন্সিল ও মাজন নিয়ে দুইটিরই দাম চুকিয়ে চলে যাবার পর মালিক আবার নিজমূর্তি ধরে গর্জে উঠলেন। দোকানে মহিলা খরিদদারের উপস্থিতিতেই তাঁকে এতক্ষণ রাগ সামলে থাকতে হয়েছে।

"আপনি এখন যাবেন, না—?"

মালিকের উহ্য ইঙ্গিতটা তাঁর মুখের ভাবেই তখন বোঝা যাচ্ছে। জিনিসপত্রগুলো চটপট ব্যাগের ভেতর ভরে নিয়ে দিলীপ একগাল হেসে বললে—"আর বলতে হবে না।"

দিলীপ দু পা বাড়াতেই মালিক আবার পেছন থেকে চেঁচিয়ে উঠলেন —"এই চোতা তেলের শিশিটা ফেলে গেলেন কি জন্যে ?"

"ওটি আপনার মাথা ঠাণ্ডা রাখতে !"—বলে দিলীপ হাওয়া।

রাস্তায় বেরিয়ে এসে দিলীপ উৎসুকভাবে এদিক ওদিক চেয়ে দেখলে।

কই, মায়ার কোন চিহ্নই নেই।

কিন্তু এরই মধ্যে সে যাবে কোথায় ? কাছাকাছি এমন কোন ট্রাম-বাসও দেখা যাচ্ছে না যাতে হঠাৎ উঠে চলে যেতে পারে।

ব্যস্ত হয়ে দিলীপ একটু এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের রাস্তাটায় ঘুরল।

তার অনুমান ভুল নয়। মায়া মোড় ঘুরে এই পথেই এসেছে। দূরে তাকে ডানদিকের আর একটা গলিতে ঢুকতে দেখা গেল।

এই ধন্বন্তরি মার্কা ব্যাগ নিয়ে রাস্তায় দৌড়োলে লোকে পাগল কিম্বা চোর ভাববে নিশ্চয়। দিলীপ ঠিক দৌড়ে যেতে তাই পারলে না কিন্তু যেভাবে সে পা চালাল তাতে হাঁটার প্রতিযোগিতায় নামলে সে নাম করতে পারত মনে হয়।

ডানদিকের গলিটায় কিছু দূর গিয়েই সে মায়াকে প্রায় ধরে ফেললে। কি ভাগ্যি এ গলিটা একটু নির্জন।

"শুনুন ! শুনছেন !"

মায়া ফিরে দাঁড়াল। মুখে বিস্ময়। কিন্তু যতটা স্বাভাবিক তার চেয়ে একটু বেশী নয় কি ?

দিলীপ কাছে এসে দাঁড়াল।

"আপনাকে একটু বিরক্ত না করে পারলাম না। কিছু মনে করবেন না।"

"আপনি বিরক্ত করলেও কিছু মনে করব না ?—কঠিন হবার চেষ্টা-সত্ত্বেও মায়ার গলার স্বরে বিস্ময়ের সঙ্গে কৌতুকের একটু আভাস যেন পাওয়া গেল।

"না আমার একটা গাফিলি হয়ে গেছে কিনা! সেইটেই শোধরাতে চাই।"

"কি গাফিলি ?"—মায়া একটু কৌতূহলী না হয়ে পারল না।

"আপনাকে ধন্যবাদটা তখন দেওযা হয নি।"—দিলীপ অপরাধীর মত জানালে।

"তারই জন্যে এতদূর ছুটে এলেন !"—মায়ার মুখে এবার বুঝি একটু বিদ্রূপের হাসি দেখা গেল।—"কিন্তু ধন্যবাদ দেওয়াব মত কিছু করেছি কি ?"

"নিশ্চয় করেছেন!"—দিলীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—'কি করেছেন আপনি নিজে জানেন না। শুধু আমায় নয় ধন্বন্তরিকে পর্যন্ত ধন্য কবেছেন ওই একটি দন্তরুচি নগদ পয়সায় কিনে। জানেন আজ সমস্ত সকাল বকে বকে মুখে ফেনা তুলেও একটা জিনিস কাউকে গছাতে পারি নি!"

"তাই যদি হয় তাহলে ধন্যবাদটা প্রাপ্য বলেই নিলাম।"

ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার চলতে সুরু করে মায়া। বোধহয় বোঝাতে চাইলে যে প্রসঙ্গটা ওইখানেই শেষ করা তার অভিপ্রায়।

কিন্তু দিলীপের অভিপ্রায় তা নয়।

সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে সে বললে,—"দেখুন, শুধু ধন্যবাদ নয়, আপনাকে একটু কৈফিয়ৎ দেওয়াও আমার দরকার মনে হচ্ছে!"

"কৈফিয়ৎ! কিসের?"—মায়াকে বাধ্য হয়েই দাঁড়িয়ে পড়ে জিজ্ঞাসা করতে হল।

"কৈফিয়ৎ আমার চালচলন আর চরিত্রের!" দিলীপের মুখের ভাবটা মনে হল বেশ করুণ।

মায়া একটু ভুরু কুঁচকে তার দিকে তাকাতেই দিলীপ যেন ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করলে,—"আমার চালচলন বা চরিত্র সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র কৌতূহল হয়ত আপনার নেই। তবু নিজের হেঁয়ালিটা পরিষ্কার না করে আমি যেন ঠিক শান্তি পাচ্ছি না।"

"যা বলছেন তাও তো হেঁয়ালি মনে হচ্ছে!"—মায়ার গলার স্বরে তাকে বেশ অপ্রসন্নই ভাবা উচিত।

"সেই হেঁয়ালি এখুনি পরিষ্কার করে দিচ্ছি।"—দিলীপ সোৎসাহে বলতে সুরু করলে,—'ধরুন, আমাকে আপনি কি না ভাবতে পারেন। আমায় ট্যাক্সি নিয়ে চলাফেরা করতে দেখেছেন, দেখেছেন আমায় দারোগা সাজতে। আজ আবার দাঁতের মাজন মলম ফিরি করতে দেখলেন। এই বহুরূপী সাজের পেছনে গোলমেলে কিছু একটা আছে বলে সন্দেহ করা আপনার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু বিশ্বাস করুন বাইরের সাজটা গোলমেলে হলেও ভেতরে কোন গলদ নেই। নেহাৎ দায়ে পড়েই মাঝে মাঝে ভোলটা পাল্টাতে হয়।"

"শুনে খুশি হলাম।"—হাসি চাপতে মায়াকে এবার বেশ বেগ পেতেই হল বোধহয়,—"কিন্তু এসব কথা আমাকে শোনাবার কোন দরকার ছিল না বলেই মনে হচ্ছে!"

মায়া আবার হাঁটতে সুরু করলে।

"দাঁড়ান, দাঁড়ান!"—দিলীপ আবার তার সামনে গিয়ে প্রায় রাস্তা আগলেই দাঁড়িয়ে পড়ে বললে,—"দরকার ছিল না বলছেন! আপনি Fate মানেন? নিয়তি?"

"নিয়তি!"—মায়া হেসে ফেলল।—"নিয়তির কথা আবার কোথা থেকে আসছে?"

"কোথা থেকে আসছে বুঝতে পারছেন না! ঘুরে ফিরে কতবার আপনার সঙ্গে দেখা হল জানেন?"

"অত গুণে রাখি নি।"—মায়া গম্ভীর হবার চেষ্টা করলে।

"আমি রেখেছি!" দিলীপ দ্বিধাহীন,—"চারবার!"

"চারবার! না তিনবার।"—মায়া প্রতিবাদ না জানিয়ে পারল না।

"উঁহুঃ, চারবার!"—দিলীপ জোর দিয়ে জানালে।

"যাক্ চারবারই না হয় হল।"—মায়া এ প্রসঙ্গ বন্ধ করবার জন্যেই যেন দিলীপের কথা মেনে নিতে প্রস্তুত।

"না হয় হোল না, চারবারই দেখা হয়েছে। প্রমাণ দেব?"

"দিন তাহলে!"—মায়া এখন বুঝি নিরুপায়।

"ছোটদের ছবিওয়ালা একটা বই একদিন হারিয়েছিলেন মনে আছে?"

"মনে আছে!"—মায়া তার পরই সবিস্ময়ে বলে উঠল,—"কিন্তু আপনি কি করে জানলেন?"

"না, না, হঠাৎ ভুল বুঝে বসবেন না। সে বই আমি হাতাইনি। তবে ঘটনাটার আমি সাক্ষী ছিলাম আর চোর ধরেছিলাম।"

"ধরেছিলেন, তারপর?"—মায়া এবার স্পষ্টই কৌতূহলী।

"তারপর আর কি, মানুষের ভালমানষির ওপর একটা বাজি ধরেছিলাম।"

"মানে?"—মায়ার স্বর এবার খুব প্রসন্ন নয়।

"মানে, বইটা ফেরত দিতে চোরকেই পাঠিয়েছিলাম। হয় সে আপনাকে খুঁজে পায় নি। নয় আমারই সে বাজিতে যথারীতি হার হয়েছে। কিন্তু সে কথা থাক। এই চার চার বার দেখা করিয়ে দেবার ভেতর নিয়তির হাত আপনি দেখতে পাচ্ছেন না এখনো?"

"না।"—মায়ার উত্তর দিতে কিন্তু একটু বিলম্ব হল,—"দেখা তো কতজনের সঙ্গেই কতবার হয়।"

দিলীপ একদৃষ্টে মায়ার দিকে খানিক চেয়ে থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন গলায়

ধীরে ধীরে বললে,—"ঠিকই বলেছেন। কতজনের সঙ্গেই তো কতবার দেখা হয়।"

কয়েক মুহূর্ত দুজনেই তার পর নীরব। দিলীপই প্রথম যেন অকারণ হেসে ফেলে বললে,—"চলুন,—আপনার বাড়ি তো কাছেই।"

"হ্যাঁ!"—এক মুহূর্ত দ্বিধা করে মায়া বললে,—'কিন্তু আপনার আর আসবার দরকার নেই।"

"দরকার নেই বলছেন?"—দিলীপের গলার স্বরে অবিশ্বাস, চোখে কৌতুক।

"না," বলে মায়া এবার বেশ দ্রুতপদেই এগিয়ে গেল। বেশী দূর যাওয়া তার অবশ্য হল না।

'কিন্তু ভিখু?"—পেছন থেকে দিলীপের ব্যাকুল জিজ্ঞাসার ধরনে মায়াকে হাসি চেপে ফিরে দাঁড়াতেই হল।

দিলীপ ততক্ষণে কাছে এসে পড়েছে।

মায়া বেশ রূঢ় ভাবেই বলবার চেষ্টা করলে,—"ভিখুর জন্যে হঠাৎ এত ব্যাকুল হলেন কেন?"

"বাঃ! হঠাৎ মানে? ভিখুর ভাবনায় আমার বলে ভাল করে ঘুমই হয় না।"—দিলীপের স্বর আন্তরিকতায় গাঢ় হয়ে উঠল।

"ভিখুর জন্যে ভাববার কিছু নেই। সে ভালো আছে। একেবারে সেরে গেছে।"

"সত্যি!"—দিলীপের বুক থেকে মস্ত বড় বোঝা যেন নেমে গেল।—"তাহলে তো একবার তাকে দেখে আসতেই হয়। ব্যাপার কি জানেন যত অসুবিধাই হোক কর্তব্যের ত্রুটি—আমি কোথাও রাখি না। চলুন।"

মায়ার সম্মতির অপেক্ষায় না থেকে দিলীপ নিজেই এগিয়ে গেল।

বারো

মায়াদের বাড়ির দবজার কাছে এসেই দিলীপ ও মায়া দুজনকেই উদ্বিগ্ন-ভাবে থামতে হল।

বাড়ির বাইরে একটা দেযালে ঠেসান দিয়ে করুণ মুখে দাঁড়িয়ে বেণু চোখ মুছছে।

মায়াই ব্যাকুলভাবে প্রথম এগিযে গিয়ে তাকে কোলের মধ্যে টেনে নিলে।

"কি, হয়েছে কি বেণু? কাঁদছ কেন?"—মায়ার গলার স্বরেই বোঝা গেল এই মা-মরা ভাইপোটি তার কাছে কতখানি আদরের।

বেণুব কাঁদবার কারণটা এবাব জেনে অবশ্য আশ্বস্ত হওয়া গেল। তবু সেটা গুরুতর ব্যাপাবই বলতে হবে।

ভিখুকে খুঁজে পাওযা যাচ্ছে না।

মায়া বেণুব পিঠে হাত বুলিযে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলে—"ওমা! তাতে কাঁদবার কি হয়েছে? নিশ্চয কাছাকাছি কোথাও আছে?"

কিন্তু এ আশ্বাসে বেণু শান্ত হতে পারল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে বললে,—"না নেই। আমি সব খুঁজে এসেছি!"

"তাহলে কোথাও লুকিয়ে-টুকিয়ে আছে বোধহয়।"—দিলীপ ভরসা দেবার চেষ্টা করলে, খানিক বাদেই ফিরে আসবে।

বেণু কিন্তু তবু প্রবোধ মানল না। হতাশভাবে বললে,—"না সে আসবে না আমি জানি। সে রাগ করে চলে গেছে। আর আমাদের বাড়ি আসবে না।"

ভিখুর চরিত্রে এতখানি বিশেষত্ব ছিল তা মায়া আর কোথা থেকে জানবে! কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"রাগ করে যাবে কেন?"

"বাবা যে তাকে মেরেছে!"—করুণ স্বরে বেণু এবার ব্যাপারটা বুঝিয়ে দিলে,—"বাবার একটা মোজা টেনে নিয়ে এসে দাঁত দিয়ে

ছিঁড়ে খেলা করছিল, তাই। আমি কত বললাম, বাবা মেরো না। ভিখু তো মোজা পরে না। মোজা কাকে বলে ও কি করে জানবে! বাবা তবু শুনল না!"

বেণু আবার ফুঁপিয়ে উঠল।

বেণুর এ দুঃখ না ভুলিয়ে দিলে নয়। দিলীপই তার হাত ধরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যেতে যেতে ভারিক্কী চালে আশ্বাস দিলে,—"ঠিক আছে, আমি এখুনি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।"

বেণু এতক্ষণে যেন একটু সত্যিকার ভরসা পেল। উৎসুকভাবে দিলীপের মুখের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি করবেন?"

"এই দেখো না। তুমি শীগগির একটা কাগজ পেন্সিল নিয়ে এসো তো!"—দিলীপের গলার স্বর রহস্যময়।

সবাই তখন বাড়ির ভেতর ঢুকে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছে। বেণু খুশী মুখে কাগজ পেন্সিল আনতে ঘরের ভেতর যাবার পর মায়া একটু হেসে জিজ্ঞাসা করলে,—"কাগজ-পেন্সিল নিয়ে কি করবেন আবার?"

"দেখুন না!"

বেণু ততক্ষণে উত্তেজিতভাবে কাগজ পেন্সিল নিয়ে হাজির।

"এই নিন। এবার?"—বেণু ভোজবাজি দেখবার জন্যে যেন উৎসুক।

"এবার?"—গম্ভীরভাবে কাগজ পেন্সিল নিয়ে বারান্দার তক্তপোশটায় বসে দিলীপ বললে,—"এবার বিজ্ঞাপন লিখতে হবে!"

"বিজ্ঞাপন?"—বেণু অবাক এবং একটু যেন হতাশ।

"হ্যাঁ বিজ্ঞাপন জান না?"—দিলীপ বুঝিয়ে দিলে,—"খবরের কাগজে ছাপা হয়। কত লোকে পড়ে। সেইরকম বিজ্ঞাপন লিখতে হবে, নিরুদ্দেশের বিজ্ঞাপন!"

ব্যাপারটা সম্পূর্ণ বুঝতে না পারার দরুনই বেণুর উৎসাহ আবার ফিরে এল। সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি লিখবেন?"

"এই ধর প্রথমে লিখব,—নিরুদ্দেশ! তার পর লিখব, ভিখু, যেখানেই থাকো ফিরিয়া আইস। আর অভিমান করিয়া থাকিও না। তোমার জন্য

আমি মণি বাবা সবাই অন্নজল ত্যাগ করিয়াছি। আমাদের বাড়ি অন্ধকার। বাবা আর তোমায় মারিবেন না। তোমার জন্য ভালো বিস্কুট কিনিয়া আনিব। ইচ্ছা করিলে আর একটি মোজাও তুমি ছিঁড়িতে পার। শীঘ্র ফিরিয়া আসিয়া আমাদের দুর্ভাবনা দূর কর। ইতি—

বেণু—'

সবটা শুনে বেণু আনন্দে হাততালি দিয়ে উঠেই তার পর কেমন মুষড়ে পড়ল। হতাশভাবে বললে,—"কিন্তু ভিখু কি করে পড়বে! সে তো পড়তে পারে না!"

দিলীপকেও চিন্তিত হয়ে উঠতে হল। এ সম্ভাবনাটা মনে না থাকার জন্যে সে যেন লজ্জিত।

"তাই তো! সেও একটা কথা বটে!"—বলেই সে যেন আর একটা উপায় বার করে ফেলে উৎসাহিত হয়ে উঠল,—"ঠিক আছে! আমি থানার সমস্ত পুলিসদের ভিখুব চেহারা জানিয়ে দিচ্ছি। তারা যেখান থেকে হোক ঠিক ধরে আনবে!"

"ঠিক আনবে তো!"—বেণুর মুখে আবার হাসি ফুটেছে।

"তা আর আনবে না!"—দিলীপ নিঃসংশয়,—"ধরে আনতে বললে বেঁধে আনবে। তুমি যদি চাও ভিখুর বদলে একটা বাঘাও আনতে পারে! খুব সুন্দর একটা বড় কুকুর।"

কিন্তু এরকম বদলাবদলিতে যত লাভই থাক বেণুব কোন আগ্রহ নেই দেখা গেল।

"না, না"—সে প্রবল প্রতিবাদ জানালে,—"সুন্দর কুকুর আমি চাই না, আমার ভিখুকেই এনে দিতে হবে।"

"তথাস্তু।"—বলে দিলীপ এবার মায়ার দিকে ফিরল। পরম উদারতার সঙ্গে তাকে যেন বরাভয় দিয়ে বললে,—"আপনি হয়ত কি আতিথ্য করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। কিন্তু আপনার কোন ভাবনা নেই। শুধু এক কাপ চা হলেই আমি সন্তুষ্ট। আর তাতে যদি হাঙ্গামা থাকে তাহলে স্রেফ এক গ্লাস জল।"

"চা-ই আনছি।"—বলে মায়া হেসে রান্না ঘরের দিকে যেতে, দিলীপ পেছন থেকে তাকে কৃতার্থ করবার কারণটাও জানিয়ে দিলে,—"বাধ্য হয়েই এটুকু কষ্ট আপনাকে দিতে হচ্ছে। অতিথি হয়ে শুধু মুখে ফিরে গিয়ে গৃহস্থের অকল্যাণ তো করতে পারি না।"

"আপনার মহত্ত্বের জন্যে ধন্যবাদ!"

দিলীপের চা খেতে চাওয়ার যথার্থ কারণ এতক্ষণে যেন বুঝতে পেরে মায়া আর একবার হেসে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

ঢোকবার আগে যে হাসিটুকু তার মুখে দেখা গেল তাতে কৃতজ্ঞতার বদলে কৌতুকই যদি ফুটে উঠে থাকে তাহলেই বা দিলীপের লোকসানটা কি?

ঠিক এই মুহূর্তে বাইরে থেকে নির্মলের প্রবেশ।

আজ তিনি ট্যাক্সি করে আসেন নি। এসেছেন পদব্রজেই। মনের মত ট্যাক্সি পান নি বলেই বোধ হয়।

দিলীপের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় নি। মাঝখানে বেণু উপস্থিত না থাকলে বেশ একটু অস্বস্তিকর অবস্থারই সৃষ্টি হত নিশ্চয়। অপরিচিত এক ভদ্রলোককে বাড়ির ভেতর অসঙ্কোচে বসে থাকতে দেখে তাঁর যেমন বিস্মিত বিরক্তি, নির্মলের পরিচয় অনুমান করে দিলীপেরও তেমনি প্রথমটা একটু বিব্রত অবস্থা।

বেণুই এ সমস্যার সমাধান করে দিলে। নির্মলকে দেখবামাত্র উত্তেজিতভাবে তার ও ভিখুর অবিশ্বাস্য সৌভাগ্যের কথা জানিয়ে।

"বাবা! বাবা! দারোগাবাবু পুলিস দিয়ে ভিখুকে খুঁজে আনবেন! তুমি কিন্তু আর মারতে পারবে না!"

"দারোগাবাবু?"—নির্মলের মুখের বিরক্তি মুছে গিয়ে বিস্ময়ের সঙ্গে আপ্যায়ন ফুটে উঠল।—"আপনি সেই দারোগাবাবু!"

নির্মল হালদার নিজের পর্দায় পৌঁছে গেছেন এবার—"বেণু তো আপনার নামে নামতা পড়ে। কিন্তু কি লজ্জার কথা বলুন তো! আপনাকে ওই লেড়ি কুত্তার বাচ্চাটার জন্যে ডেকে এনেছে।"

বিপদ এখন দিলীপের। বেণুর সামনে নিজের সঠিক পরিচয়টা দিয়ে কি করে তার অত সাধের ভুলটা ভাঙা যায়! অথচ এক আঁচড়ে যা চিনেছে তাতে এ ভদ্রলোকের কাছে পরিচয় ভাঁড়ানোও বিপদ।

সে আমতা আমতা করে কোন রকমে দুদিক সামলাবার চেষ্টা করলে—"না, মানে ডাকে নি কেউ। আমি—কি বলে নিজেই একবার খোঁজ নিতে এসেছিলাম।"

নির্মল হালদার এখন অবশ্য নিজের কথা বলবার জন্যেই ব্যস্ত। দিলীপের অস্বস্তি তাঁব নজরেই পড়ে না।

"বেশ করেছেন! বেশ করেছেন। দাঁড়ালেন কেন? বসুন।—" বলে নিজেই একটা ভাঙা টুল কোণ থেকে টেনে নিয়ে বসে তিনি আবার সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলেন,—"তা এখানকার থানায় কতদিন আপনি এসেছেন?"

দিলীপও তখন বসেছে, তক্তপোশের বদলে যেন কণ্টকশয্যায়। বেণুর সরল বিশ্বাসে ঘা না দিয়ে সত্যটাকে কোন রকমে এড়িয়ে থাকার চেষ্টায় সে বললে, "এসেছি মানে যদি সত্যি কথা বলতে হয় কি জানেন—"

কিন্তু নিজের প্রশ্নের জবাব শোনবার ধৈর্যটুকুও নির্মল হালদারেব কোথায়? নিজেকে জাহির করবার জন্যেই তিনি তখন ব্যাকুল।

দিলীপের কথার মাঝখানেই তিনি বলতে সুরু করলেন,—"আপনাদের ডেপুটি কমিশনারের সঙ্গে আমার অবশ্য অনেক দিনের আলাপ। মাঝে মাঝে লালবাজারে গিয়ে আড্ডা না দিয়ে এলেই রাগ।"

হঠাৎ গলাটা নামিয়ে যেন গোপন কথা জানবার মত ভঙ্গিতে নির্মল হালদার বললেন—"তবে, এমনি কি আর খাতির করে মশাই। সেই সুন্দরলাল মগনরাম কেসের কথা মনে আছে তো,—বছর তিন আগের সেই Sensation?"

দিলীপ অকপটভাবে জানালে,—"কই মনে পড়ছে না তো!"

নির্মল হালদার যেন আরো খুশী হয়ে উঠলেন,—"পড়ছে না? আশ্চর্য! যাই হোক, সেই case-এ তদ্বির করেই তো ওই post পেলেন।

আর ও case-এর আসল শেকড় কোথায়, কে চিনিয়ে দিয়েছিলেন জানেন ?

দিলীপ ইতিমধ্যে নির্মল হালদারের চরিত্র বুঝে ফেলেছে। বিস্ময়ে যেন অভিভূত হয়ে বললে,—"আপনি ?"

"আবার কে ? এই নির্মল হালদার !"—যেন বাধ্য হয়েই নিজের বিরক্তিটুকু প্রকাশ করে নির্মল যেন তাচ্ছিল্যভরে দিলীপকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"সিগারেট আছে ?"

"না, সিগারেট তো খাই না।"—দিলীপকে লজ্জিত মনে হল।

"সিগারেট খান না ?"—প্রায় অভিযোগের সুরে কথাটা বলে নির্মল হালদার একটু যেন থমকে গেলেন।

মায়া চা করে নিয়ে এসে দাঁড়িয়েছে—দিলীপের সঙ্গে দাদার হাতেও সে চায়ের কাপ এগিয়ে দিল।

ক্ষণিক যে অস্বস্তিটুকু দেখা গেছল, চায়ে একবার চুমুক দিতেই নির্মল হালদারের তা কেটে গেল।

"সিগারেট আপনি তাহলে খান না। ভালো ভালো। আমিও ছেড়ে দিয়েছি একরকম। তবে চরিত্র শোধরাতে নয়, এই পোড়া মুখের জ্বালায়।"—নিজের দুর্বোধ রসিকতায় নিজেই একলা হেসে উঠে নির্মল হালদার বললেন,—"বুঝতে পারলেন না বুঝি ! আরে মুখখানি যে একেবারে পাশ-করা শৌখিন। ওই toasted American ছাড়া কিছু রোচে না। তা ও সব এখন আর তো সহজে পাবার জো নেই !"

এমন জমিয়ে তোলা আলাপটার মাঝে বেণু অমন রসভঙ্গ করে বসবে কে জানত।

হঠাৎ সে বলে বসল,—"তোমার বিড়ি আনব বাবা ? কুলুঙ্গিতে কটা আছে।"

নির্মল হালদার প্রথমটা একেবারে নির্বাক নিস্পন্দ। তার পর আগুনে যেন কেরাসিন পড়ল।—"বিড়ি ! বিড়ি ! এবাড়িতে বিড়ি কোথা থেকে এল ?"

সবাই নীরব। মায়া শুধু কঠিন মুখে রান্নাঘরের দিকেই চলে গেল।

দুরূহ প্রশ্নের জবাবটা কারুর কাছে না পেয়ে নির্মল হালদার নিজেই সমাধান করে ফেললেন এবার,—"ও হ্যাঁ, বিড়ি ডীলার্স এসোসিয়েশন কটা sample পাঠিয়েছিল বটে, Central Tobacco Board-এ একটা সুপারিশ লিখে দেবার জন্যে। তারই কটা পড়ে আছে বোধ হয়। আচ্ছা নিয়ে আয় একটা। দেখি চেখে।"

বেণু চলে যাবার পর মায়া আবার রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে কাছে এসে দাঁড়াল। জিজ্ঞাসা করলে,—"তোমার না সকালবেলা কোথায় যাবার কথা ছিল দাদা ?"

মায়ার গলার স্বরটা খুব বুঝি প্রসন্ন নয়। কিন্তু দিলীপের মত নতুন শ্রোতা পেয়ে তাঁর মেজাজ এখন খোশ হয়ে গেছে, ওসব তুচ্ছ জিনিস লক্ষ্যের বাইরে। নির্মল হালদার সোল্লাসে বলে উঠলেন,—"আরে সেখান থেকেই তো এলাম। কাম ফতে ! বুঝেছিস কাল থেকেই Agencyটা পাচ্ছি।"

দিলীপের দিকে ফিবে নির্মল হালদার এজেন্সীটা কি দরের তাও বুঝিয়ে দিলেন,—"বুঝেছেন দাবোগাবাবু, একেবারে এ-ওয়ান অ্যামেরিকান মাল। কিন্তু ম্যানেজারটা সারা সকাল বকিয়ে বকিয়ে একেবারে মাথা ধরিয়ে দিয়েছে।"

"মাথা ধরেছে নাকি ?"—দিলীপ ব্যাকুল হয়ে উঠল। এই তার সুযোগ। বেণু এখনও বোধ হয় বাবাব বিড়ি খুঁজছে। সে ফেরবার আগেই যদি দায়টা সেরে ফেলা যায়।

দিলীপের আকস্মিক ব্যাকুলতায় একটু অবাক হয়েই নির্মল বললেন —"হ্যাঁ সত্যিই বেশ ধরেছে !"

দিলীপ ততক্ষণে তক্তপোশের নিচে রাখা ব্যাগটা তুলে ফেলেছে। সেখান থেকে একটি কৌটো বার করে নির্মলের হাতে দিয়ে বিনীত অনুরোধ জানালে,—"তাহলে একটু কপালে ঘষে দেখুন না।"

কৌটোটা নিয়ে নির্মল হালদার বিমূঢ়।—"এটা আবার কি !"

"ধন্বন্তরি মলম! মাথা ধরায় অব্যর্থ।" দিলীপ যেন শাস্ত্রবাক্য বলল।

কৌটোটা ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখে নির্মল হালদার বললেন—"হ্যাঁ তাই লেখা রয়েছে দেখছি। তা আপনি এ কৌটো কোথায়—"

বলতে বলতেই দিলীপের হাতের ব্যাগটার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়ল। অবাক হয়ে বললেন—"আপনার ব্যাগও তো দেখছি ধন্বন্তরী কোম্পানীর। তাহলে—"

দিলীপই রহস্যটা ঘুচিয়ে দিলে এবার,—"হ্যাঁ আমি ওদের জিনিসই বিক্রি করি।"

"বিক্রি করেন!"—নির্মল হালদারের মাথাটা শুধু ধরে ছিল এবার ঘোরাও সুরু হল বুঝি!—"তার মানে? দারোগাবাবু—"

দিলীপ হাসল—"দারোগাবাবু আমি শুধু বেণুর জন্যে। নইলে আমার বংশে ও মর্যাদা কেউ পায় নি।"

যাক্ কথাটা সুযোগ মতই বলে ফেলা গেছে। ঠিক তার পরেই বেণু ছুটতে ছুটতে এসে বাবার হাতে একটা বিড়ি দিয়ে বললে,—"এই একটাই পেলুম বাবা!"

নির্মল তখনও ঠিক ধাতস্থ হন নি। অন্যমনস্কভাবে বিড়িটা অসঙ্কোচেই ধরিয়ে ফেলে বললেন,—"তাহলে আপনি মানে—এই সব ওষুধের—কি বলে এজেণ্ট?"

'ক্যানভ্যাসারই বলুন না!''—দিলীপ এখন অকুতোভয়। বেণুর জগতে দারোগাদেব অত বাঁধাবাঁধি নিশ্চয় নেই। দাঁতের মাজন কি মাথার তেল বেচে একটু উপরিব চেষ্টা করলে তাদের বোধহয় জাত যায় না।

নির্মল হালদার এখন কিন্তু একটু যেন কৌতূহলী। জিজ্ঞাসা করলেন—"তা, হচ্ছে কিছু?"

"সুরু হিসেবে মন্দ কি!"—দিলীপ মায়ার দিকে একবার কৌতুক'তে তাকিয়ে জানালে, "আজই তো এক কৌটো নগদ বিক্রি করেছি।"

"এক কৌটো।"

"হ্যাঁ, এই আপনার ভগিনী মায়া দেবীকেই।"

মায়ার মুখে একটু হাসি দেখা দিয়েই মিলিয়ে যায়। কিন্তু নির্মল হালদার বেশ উচ্চস্বরেই খানিক হেসে আবার তাঁর মুরুব্বিয়ানা চাল ধরলেন,—"আরম্ভ তো আপনার ভালোই বলতে হবে। তবে ও কাজই যদি করতে হয়, তাহলে ওই ধন্বন্তরি কেন ? বড় বড় Pharmaceutical firm কত রয়েছে। যদি বলেন তো introduce করে দিতে পারি।"

দিলীপ কৃতজ্ঞভাবে জানালে,—"বেশ তো দরকার হলে আপনার সাহায্য নেব। আচ্ছা চলি।"

দিলীপ মায়াকেও নমস্কার জানিয়ে উঠে পড়ল। আবহাওয়াটা ক্রমশঃ অস্বস্তিকর হয়ে উঠতে পারে বলেই তার আশঙ্কা।

সঙ্গে সঙ্গে নির্মলও উঠলেন,—"চলুন না, আমিও আপনার সঙ্গে যাচ্ছি।"

"তোমার বাইরের কাজ তো হয়ে গেছে দাদা!"—স্বাভাবিক ভাবে বলার চেষ্টা সত্ত্বেও মায়ার স্বর একটু যেন বেশী তীক্ষ্ণ—"এখন আর বেরুবার কি দরকার।"

"দরকার আছে, আছে!"—নির্মল যেন বেণুকেই বোঝাবার জন্যে স্নেহের স্বরে বললেন,—"একটা আমেরিকান এজেন্সি পাওয়া কি চারটিখানি কথা। হ্যাঁ আমার বালিশের তলায় গোটা চল্লিশ টাকা রেখে ছিলাম। তা থেকে টাকা দশেক এনে দে তো।"

মায়ার মুখের দিকে একবার তাকিয়ে দিলীপ নিজেই কুণ্ঠিত ভাবে চোখ ফিরিয়ে নিলে। আত্ম-সংবরণের প্রবল চেষ্টা সত্ত্বেও চোখ মুখ তার নিরুপায় রাগে দুঃখে রাঙা হয়ে উঠেছে। এই একান্ত অস্বস্তিকর পারিবারিক ব্যাপারের বাধ্য হয়ে সাক্ষী হতে হবে জানলে সে নিশ্চয় আজ এমন করে নাছোড়বান্দা হয়ে মায়ার সঙ্গ নিত না।

বেশ কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে মায়া স্বাভাবিক গলাতেই বলতে পারল,—"টাকা ওখানে কিছু নেই।"

কিন্তু দিলীপ সামনে থাকায় যে দুর্লভ সুযোগ পাওয়া গেছে নির্মল হালদার কি তা আর ছাড়েন! প্রসন্ন স্নেহের হাসি হেসে বললেন,—"আছে, আছে, তুই দশটা টাকা এনে দে না। বাকি সবই তো রইল।"

কঠিন মুখে মায়া এবার তাড়াতাড়ি ভেতরে চলে গেল। আর এখানে থাকলে সকলের সামনেই বোধ হয় চোখ ফেটে তার জল বার হত।

নির্মল হালদার কিন্তু নির্বিকার ভাবে দিলীপের দিকে ফিরে একটু হেসে বললেন,—"এই সংসারের খরচ, বুঝেছেন দারোগাবাবু—থুড়ি—মাপ করবেন,—আপনার নামটা।"

"দিলীপ।"—ঠিক রাগ নয় যেন নিজেরই কি রকম লজ্জায় দিলীপ নির্মল হালদারের মুখের দিকে না চেয়েই উত্তর দিলে।

"ওঃ দিলীপ—হ্যাঁ কি বলছিলাম—বড় এজেন্সী নেওয়ার ঝামেলা যে কি?—এই ধরুন—"

নির্মল হালদারের কথাটা শেষ করবার দরকার হল না। মায়া এসে তাঁর হাতে দশ টাকার একটা নোট দিতেই তিনি খুশী মনে আগের প্রসঙ্গ ভুলে নোটটা পকেটে রেখে বললেন,—"আসুন দারোগাবাবু—মানে দিলীপবাবু।"

দিলীপ একবার মায়ার দিকে চেয়ে তাঁকে অনুসরণ করলে। বেণু শুধু শেষ মুহূর্তে দরজার কাছে ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বললে,—"আমার ভিখুকে কিন্তু খুঁজে আনবেন ঠিক! কিছুতেই ভুলবেন না!"

"পাগল! আমি তা ভুলতে পারি!"

মায়া তখনও বারান্দার ধারে একটা থাম ধরে নিস্পন্দভাবে দাঁড়িয়ে। দিলীপ সে দিকে ফিরে আর একবার বিদায় নিলে,—"আজ তা হলে চলি।"

একটু থেমে তার পর বললে,—"আশা করি আবার দেখা হবে।"

"আশা করি, না।" কথাগুলো নিষ্প্রাণ একটা যন্ত্রের ভেতর থেকে যেন বেরিয়ে এল।

দিলীপ এর পর হয়ত কিছু বলত, কিন্তু বাইরে পৌঁছে নির্মল তখন তাড়া দিলেন,—"কই আসুন দিলীপবাবু, মানে দারোগাবাবু।"

দিলীপকে মায়াব ওই শেষ কথা কানে নিয়েই বেরিয়ে যেতে হল।

বাইরে বেরিয়েও নির্মল সরকারের সঙ্গ তখুনি ছাড়ানো গেল না। বেশ কিছুদূর সঙ্গে যেতে যেতে তিনি নিজের ক্ষমতা প্রতিপত্তির গল্প শোনালেন এবং শেষে বিদায় নেবার সময় আর একবার উপদেশ দিয়ে গেলেন,—"যা যা বললাম ভুলবেন না কিন্তু। আর কোন ফার্ম-এ intioduction যদি দরকার হয়, তা হলে শুধু আমায় একবার অসঙ্কোচে জানাবেন।"

"অনেক ধন্যবাদ! নমস্কার!" বলে দিলীপ নিষ্কৃতির আনন্দে দু'পা বাড়াতেই তিনি আবার ডাক দিলেন,—"হ্যাঁ দিলীপবাবু, কি আপনার মলমের কথা বলছিলেন না? দেখি একটা কৌটো। একটা পরীক্ষাই করে দেখা যাক।"

দিলীপ ব্যাগ খুলে ধন্বন্তরি মলম এক কৌটো তাঁর হাতে দিতে তিনি ব্যাগটার ভেতর উঁকি দিয়ে বললেন,—"মাথার তেলও তো আছে দেখছি। আমার আবার কি বলে, বাজে তেল একেবারে সয় না। তবু দিন একটা। ভাল হলে একটা সার্টিফিকেট পাবেন।"

দিলীপ যেন কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে বললে,—"সে সৌভাগ্য কি আমার হবে! কিন্তু একটা তেল তো ছিপি খুলতেই ফুরিয়ে যাবে। আপনি বরং দুটো রাখুন। তেল জবজবে না হলে সার্টিফিকেট কখনো ভাল হয়!"

"একেবারে দুটো দিচ্ছেন!" একটু হতভম্ব হয়ে আর কিছু বলবার আগেই দিলীপ দেখা গেল বেশ খানিকটা হন হন করে এগিয়ে পাশের একটা গলিতে ঢুকে পড়েছে।

সেখান থেকেই নির্মল সরকাবের হাঁক সে শুনতে পেল।

না তাকে আর নয়, তিনি ভারিক্কী চালে ট্যাক্সি ডাকছেন।

তেরো

নির্মল সরকারের হাত থেকে কোন রকমে ছাড়া পেয়ে দিলীপ সোজা ওদের গ্যারেজের আড্ডায় গিয়েই উঠল।

কিন্তু সেখানে পৌঁছোবামাত্র খবর যা পেল তাতে একেবারে চক্ষুস্থির।

গ্যারেজের বড় মিস্ত্রী ভূষণই প্রথম কথাটা শোনালে—"দুদিন কোথায় ছিলেন দিলীপদা। এদিকে কি হয়েছে জানেন?"

যা হয়েছে সেটা সাধারণ ব্যাপার যে নয় ভূষণের মুখ-চোখের চেহারা থেকেই তা বোঝা গেল।

দুদিন সে ধন্বন্তরির ওষুধ প্রচারের উৎসাহে এখানে আসবার সময় পায় নি বটে, কিন্তু তার মধ্যে কি এমন হতে পারে।

"কি হয়েছে কি? আখড়ায় পুলিস-টুলিস হামলা করেছিল নাকি?" নিজের একমাত্র অনুমানটা দিলীপ জানাল।

"না, না তাহলেও তো ভাল ছিল। কেষ্টদা আজ দুদিন নিখোঁজ।"

"কেষ্ট নিখোঁজ!"—দিলীপ নিজের কানকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না।

গ্যারেজের আরো দু'চার জন তখন তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে। তাদের মধ্যেই একজন বললে,—"হ্যাঁ, সেই যে গোষ্ঠবাবুর সঙ্গে ঝগড়ার পর এখান থেকে গেল, তার পর আর নাকি বাড়ি ফেরে নি। কেষ্টদার বৌ তো সকালেই এসেছিল কাঁদতে কাঁদতে। পাঁচুদা থানায় হাসপাতালে খোঁজ নিতে পাঠিয়েছে। কিন্তু এখনও তো কোথাও কিছু খবর পাওয়া যায় নি।"

দিলীপ এতক্ষণ গম্ভীর হয়ে আর কি যেন ভাবছিল। বললে, "না, পাওয়া যাবেও না।"

সবাই অবাক হয়ে দিলীপের দিকে তাকাল।—"বল কি দিলীপদা? কি হয়েছে তা হলে জান নাকি?"

মুখে তাদের উৎকণ্ঠা।

"ঠিক জানি না।"—দিলীপ কঠিন মুখে বললে,—"তবে সেদিন তার যা মেজাজ ছিল তাতে এক জায়গাতেই সে যেতে পারে মনে হচ্ছে। সেখানে আমি যাচ্ছি।"

দিলীপ পা বাড়াবার আগেই সবাই প্রায় এক সঙ্গে জিজ্ঞাসা করলে—"কোথায় দিলীপদা ?"

"চৌধুরী সাহেবের কাছে।"—দিলীপ নিজেকেই যেন যুক্তি দিয়ে বোঝাবার জন্যে বললে,—"গোষ্ঠবাবুর কাজটা তার চৌধুরী সাহেবের জন্যেই গেছে। সেদিনই সে রোখ্ করে বলেছিল চৌধুরী সাহেবকে যা শোনাবার সে শুনিয়ে আসবে। সুতরাং তাঁর কাছেই সে যে গেছল এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। খবরটা জানতে সেখানেই আগে যেতে হবে।"

ভূষণ তার সংশয় ও আশঙ্কাটুকু প্রকাশ করে বললে,—"কিন্তু সেখানেই যদি গিয়ে থাকে, তার পর একেবারে নিখোঁজ হওয়ার মানেটা কি !"

"সেই মানেটাই তো বুঝতে যাচ্ছি।"—দিলীপ দৃঢ়পদে বেরিয়ে গেল।

তার চোখ-মুখের এ চেহারা আগে বুঝি কেউ এখানে দেখে নি।

যে মন নিয়ে দিলীপ সেদিন চৌধুরী সাহেবের কাছে গেছল তাতে বাইরের কোন কিছু বিশেষ লক্ষ্য করার কথা নয়। তা না হলে চৌধুরী ইনডাস্ট্রিজ সিণ্ডিকেটের এলাকার মধ্যে ঢুকে বেশ একটু বিস্মিত মুগ্ধ না হয়ে সে পারত না।

বিরাট একটি ছোটখাটো শহরের মত জায়গা চারিদিকে উঁচু মজবুত দেওয়াল দিয়ে ঘেরা। দোতলা সমান লোহার গেট দিয়ে সেখানে ঢোকবার সময় বন্দুক হাতে পাহারাদারের নজর এড়িয়ে যাবার উপায় নেই।

লোহার গেট অবশ্য সারাদিন খোলাই থাকে। পাহারাদারও আসতে

যেতে বাধা দেয় না। কিন্তু সে যে শুধু গেটের শোভা নয় আগন্তুক মাত্রকেই এক নজরে দেখে নেওয়ার ধরনে তা বোঝা যায়।

গেট দিয়ে ঢোকবার পর বিরাট এক কলকারখানার রাজত্ব। আটা ময়দা বনস্পতির মত খাদ্যসংক্রান্ত জিনিস তৈবী ও বিক্রিই চৌধুরী সিণ্ডিকেটের বিশেষত্ব।

মিনিটে মিনিটে বড় বড় লরী বোঝাই মাল নানা রাস্তায় আসছে যাচ্ছে।

কলকারখানার জগৎ হলেও চারিদিক যথাসম্ভব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চওড়া সব লাল্ সুরকিব রাস্তা। বড় বড গুদাম থেকে কারখানা বাড়ি পর্যন্ত সব যেন ঝকঝকে তকতকে। চৌধুরী সাহেবের যেদিকে নিজের থাকবার জায়গা ও সিণ্ডিকেটের অফিস সেদিকটা তো একেবারে ছবির মত সাজানো বলা যায়।

চৌধুবী সাহেবের সঙ্গে দেখা না কবে কিছুতেই এখান থেকে ফিবরে না এই প্রতিজ্ঞা নিযেই দিলীপ এসেছিল। কিন্তু দেখাটা অত সহজে সম্ভব হয়ে যাবে ভাবতেই পারে নি।

অফিসের বাইরের একটি বড ঘর কাজকাববারে বাইবে থেকে যাঁরা আসেন তাঁদের বসবাব জন্যে নির্দিষ্ট। একধাবেব একটি টেবিলে একজন কর্মচারী জিজ্ঞাসাবাদের জবাব দেবার জন্যে বসে আছেন।

দিলীপ সেখানে গিয়ে বেশ রুক্ষস্বরেই চৌধুবী সাহেবের সঙ্গে দেখা কবতে চাওয়ার কথা জানালে।

রুক্ষস্বরের কোন প্রতিক্রিয়া কিন্তু কর্মচারীটির মুখে দেখা গেল না!

একটু স্মিত হাস্যে একটি কাগজের স্লিপ দিলীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে তিনি বললেন—"আপনার পরিচয় আর দেখা করতে চাওয়ার কারণটা অনুগ্রহ করে লিখে দিন।"

নামটা লিখে প্রয়োজনের বেলা একটু ভেবে নিয়ে দিলীপ শুধু লিখলে—"চাকরির উমেদারি নয়।"

স্লিপটার ওপর একবার চোখ বুলিয়ে তেমনি স্মিতহাস্তে কর্মচারীটি বললেন—"একটু অপেক্ষা করুন।"

ঘণ্টা টিপতেই একজন বেয়ারা এসে দিলীপের স্লিপটি নিয়ে ভেতরে চলে গেল।

বসবার ঘরে বেশ দামী আরামের গদি দেওয়া সব সোফা-সেটি এধারে ওধারে সাজানো।

সেখানে দীর্ঘ অপেক্ষার জন্যে প্রস্তুত হয়েই দিলীপ গিয়ে বসে সামনের টেবিল থেকে একটা খবরের কাগজ তুলে নিল কিন্তু প্রথম পাতায় খবরের শিবোনামাগুলো পডতে না পড়তেই বেয়ারা ফিরে এসে জানালে চৌধুরী সাহেব ডেকেছেন।

দিলীপ শক্ত ধাতুতেই তৈরী। তার ওপর কঠিন একটা সংকল্প নিযেই এসেছে, তবু বেয়ারার সঙ্গে চৌধুরী সাহেবের কামরার দিকে যেতে যেতে কিরকম একটা অস্বস্তি যেন কিছুতেই সে ভুলতে পারছে না মনে হল।

বেয়ারা সঙ্গে নিযে গিযে যে ঘরটিতে তাকে ঢুকিয়ে দিল তার আয়তন ও আসবাবপত্রই বেশ একটু স্তম্ভিত বিস্ময় জাগাবার মত। সাধারণ একটি গরীব গৃহস্থেব সপরিবারে থাকবার জায়গাই তার মধ্যে এঁটে যায় ঘরটা লম্বায় চওড়ায় এমনি বিশাল। আসবাবপত্রে চটক-দার শৌখিনতা নেই কিন্তু এমন ভাবগাম্ভীর্য আছে যে এ ঘরে যিনি বসেন তাঁর মূল্য ও মর্যাদা সম্বন্ধে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। ঘরের একদিকে নানা যন্ত্রপাতিসমেত চৌধুবী ইনডাস্ট্রিজ সিণ্ডিকেটের প্রায় সমস্ত কারখানাব ক্ষুদে মডেল প্রকাণ্ড একটি নিচু বেদীর ওপর সাজান। তার দুপাশের দেওয়ালে কয়েকটি বিরাট মানচিত্র। একটি কারখানার সমস্ত এলাকার, অন্যগুলি চৌধুরী সিণ্ডিকেটের নিজস্ব বাড়িঘর ও নূতন সব বসতি-নির্মাণ-পরিকল্পনার। সিণ্ডিকেটের এও একটি ব্যবসার ক্ষেত্র।

ঘরের এত সব খুঁটিনাটি সেই প্রথম ঢোকবার সময়ে দিলীপ অবশ্য লক্ষ্য করে নি। এ সুযোগ হয়েছে তার পরে।

আপাততঃ বিরাট একটি টেবিলের ওপারে স্বয়ং চৌধুরী সাহেবের ওপর তার দৃষ্টি নিবদ্ধ।

সেদিন কেষ্টর ট্যাক্সিতে দূর থেকে যেটুকু দেখেছে, তা ছাড়া মাঝেমাঝে খবরের কাগজের ছবি থেকেই চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে তার পরিচয়।

ছবির চেয়ে আসল চেহারা আরো অনেক জমকালো। ক্ষমতা অর্থ প্রতিপত্তি চৌধুরী সাহেবের যে কতখানি তা তাঁর দীর্ঘ নাতিস্থূল শক্ত সমর্থ দেহ থেকে সুরু করে ধীর গম্ভীর রাজকীয় ভাবভঙ্গীতে পর্যন্ত স্পষ্ট।

দিলীপ ঘরে ঢোকবার পর তিনি কিন্তু প্রসন্নমুখেই তাকে সম্ভাষণ করে বললেন—"বসুন।"

দিলীপ ইতিমধ্যে তার সাময়িক অস্বস্তিটুকু কাটিয়ে উঠেছে। চৌধুরী সাহেবের অনুরোধ অগ্রাহ্য করে সে বেশ কঠিন স্বরেই বললে,—"বসবার আমার দরকার নেই। যা জানতে এসেছি সেটুকু জানতে পারলেই আমি চলে যাব।"

চৌধুরী সাহেব একটু হেসে বললেন,—"বেশ। কি জানতে চান বলুন।"

চৌধুরী সাহেবের এ হাসি ও গলার স্বরে আর কেউ হলে বোধ হয় কৃতার্থ হত। কিন্তু দিলীপ প্রায় জেরার ভঙ্গিতেই জিজ্ঞাসা করলে,—"জানতে চাই, কেষ্ট দাস বলে কেউ আপনার সঙ্গে দিন তিনেক আগে দেখা করতে এসেছিল কি না।"

"এটা একটু অন্যায় অত্যাচার হচ্ছে না কি!"—চৌধুরী সাহেবের স্বরে সামান্য একটু অনুযোগের সুর ছাড়া তাঁর মুখে অপ্রসন্নতার কোনো ছায়া কিন্তু দেখা গেল না—"দিনে অন্ততঃ দু শ লোকের সঙ্গে দেখা করার সৌভাগ্য আমার হয়। তার মধ্যে তিন দিন আগের কোন একজনের নাম মনে রাখা একটু কঠিন নয় কি।"

"এ নামটা অন্ততঃ নয়।" দিলীপের নরম হবার কোন লক্ষণ নেই।—

"কারণ কলকাঠি নেড়ে কেষ্ট দাসের ট্যাক্সির কাজটা আপনিই খতম করিয়েছেন আর সেই জন্যেই সে আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল বলে আমার বিশ্বাস।"

চৌধুরী সাহেব একটু কি যেন ভাবলেন। তার পর দিলীপের রূঢ়তাটুকু সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে শান্ত ভাবেই বললেন,—"আপনার অনুমান বোধ হয় ঠিক। এখন মনে হচ্ছে যে ওই রকম একটা আজগুবী নালিশ নিয়ে কেষ্ট দাস বলে কেউ একজন সেদিন এসেছিল।"

একটু থেমে দিলীপের দিকে চেয়ে হেসে তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন,—"কিন্তু যদি এসেই থাকে সে খবরটা আমার মুখ থেকে শোনবার এত গরজ কেন? সত্যিই ব্যাপারটা বুঝতে পারছি না।"

"বুঝতে পারছেন না!"—দিলীপের কণ্ঠ এখনও কঠিন কিন্তু তার মধ্যে একটু দ্বিধার আভাসও যেন আছে।—"আমার গরজ এই জন্যে যে আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসার পরই আজ দুদিন ধরে কেষ্ট দাস নিখোঁজ। সে গেল কোথায়?"

এবার চৌধুরী সাহেবের মুখে স্পষ্ট কৌতুক দেখা গেল।—"সে জবাবটাও কি আমায় দিতে হবে! দেখুন যে কেউ আসুক দেখা না করে আমি ফেরাই না। এইটুকু আমার অপরাধ, কিন্তু তার জন্যে এই রকম জেরার জবাব যদি আমায় দিতে হয়, সেটা একটু বেশী রকম জুলুম হয় না কি?"

কথাগুলো বলতে বলতে চৌধুরী সাহেব টেবিলের ধারের কলিং বেলটা কবার টিপেছেন দিলীপ লক্ষ্য করেছে।

চৌধুরী সাহেবের কথা শেষ হতেই, দরজায় একজন বেয়ারা এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল।

চৌধুরী সাহেব তাকে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আসানসোলে যে গাড়ি গিয়েছিল, ফিরেছে?"

"হাঁ হুজুর।"—বেয়ারা জবাব দিলে।

তাকে উপেক্ষা করে এটা বিদায় দেবার ইঙ্গিত ভেবে দিলীপ উষ্ণ

হয়ে কি বলতে যাচ্ছিল, চৌধুরী সাহেব হাত তুলে তাকে থামিয়ে বেয়ারাকে হুকুম দিলেন,—"ড্রাইভারকে পাঠিয়ে দাও।"

বেয়ারা চলে যাবার পর চৌধুরী সাহেব দিলীপের দিকে যখন ফিরলেন তখন মুখের চেহারা তাঁর একেবারে অন্যরকম। তাঁর গলাতেও সকৌতুক পরিহাসের সুর।

"কেষ্ট দাস আপনার বিশেষ বন্ধু নিশ্চয়।" দিলীপের ভ্রূকুটিটুকু অগ্রাহ্য করেই তিনি হেসে কথাটা শেষ করলেন—"মেজাজের দিক দিয়ে তাই যথেষ্ট মিল দেখছি।"

এ পরিহাসে কিন্তু আগুনে যেন ঘি-এর ফোঁটা পড়ল। দিলীপ মুখের বিরক্তিটা গোপন করবার চেষ্টামাত্র না করেই তিক্ত স্বরে বললে,—"আমার মত সামান্য লোকের সঙ্গে এসব বাজে কথা আলোচনা করে লাভ কি? কেষ্ট দাস এখান থেকে কোথায় গেছে তাহলে আপনি জানেন না?"

দিলীপকে একেবারে অবাক করে দিয়ে চৌধুরী সাহেব স্মিত মুখে বললেন,—"জানি।"

তার পর একটু থেমে নাটকীয় ভাবেই অঙ্গুলি নির্দেশ করে বললেন,—"পেছনে একটু তাকিয়ে দেখুন তো, আপনার বন্ধুকে চিনতে পারেন কি না!"

পেছনে সচকিত ভাবে তাকিয়ে দিলীপ একেবারে বিমূঢ়।

কেষ্ট দাস সত্যিই হাসিমুখে সেখানে দাঁড়িয়ে। শুধু তার উপস্থিতি-ই নয়, বাহারে ড্রাইভারের পোষাকটাও চমকে দেবার মত।

কেষ্ট দাস এগিয়ে এসে চৌধুরী সাহেবকে সেলাম দিলে।

দিলীপ সবিস্ময়ে এতক্ষণে বলে উঠল,—"কেষ্ট! আমরা সবাই তো —তার কথাটা শেষ করতে না দিয়েই চৌধুরী সাহেব ঠাট্টার সুরে বললেন —"তা হলে আপনার বন্ধু সত্যি গায়েব হয়ে যায় নি!"

ঠাট্টার সুরটা এবার আর মোটেই খারাপ লাগল না দিলীপের। খুশী মুখে একটু লজ্জিতভাবেই সে বললে, "না, দিব্যি বহাল তবিয়তে

আছে দেখছি। ভুল বুঝে আপনাকে যা বলেছি তার জন্য সত্যিই দুঃখিত। আচ্ছা নমস্কার।"

"নমস্কার", বলে চৌধুরী সাহেব যেভাবে হেসে তাকে বিদায় দিলেন তাতে সমস্ত ব্যাপারটা সহজ ভাবেই তিনি নিয়েছেন বোঝা গেল।

দিলীপ কেষ্টকে সঙ্গে নিয়ে বাইরে যাবার সময় একথা অন্ততঃ ভাবে নি যে খানিক বাদেই চৌধুরী সাহেবের ঘরে আবার তাকে যেতে হবে, এবং সে যাওয়ার সঙ্গে তার জীবনের কতখানি পরিবর্তন জড়িত।

বাইরে বেরিয়েই দিলীপের প্রথম বিস্মিত প্রশ্ন হল—"কি ব্যাপার কেষ্ট? ঝগড়া করতে এসে চাকরি হয়ে গেল?"

তার পোষাকের ওপর হেসে একবার চোখ বুলিয়ে দিলীপ আবার বললে,—"চাকরিটা ছোটখাট নয় বলেই তো মনে হচ্ছে!"

"না চাকরি ভালোই!"—কেষ্ট দাসের গলায় একটু উচ্ছ্বাসের সুরই শোনা গেল,—"মানুষটা অদ্ভুত বুঝেছ দিলীপ। প্রথম তো দেখাই করবে না ভেবেছিলাম। দেখা তো পেলামই। রাগের মাথায় যা খুশি বলেও ফেললাম।—সব শুনে কি বললে জান?"

দিলীপের কৌতূহলী মুখের দিকে চেয়ে একটু থেমে কেষ্ট দাস আবার বললে,—"বললে,—ট্যাক্সির কাজ গেছে, কিন্তু তার চেয়ে ভাল কাজ কি নেই! রেগে বললাম—'দিচ্ছে কে?' তাতে বললে,—'আমি!' ব্যস্ সঙ্গে সঙ্গে কাজ পেয়ে গেলাম।"

"সত্যিই আশ্চর্য!"—দিলীপ এবার রীতিমত অভিভূত স্বরেই বললে,—"কিন্তু চাকরি পাওয়ার আহ্লাদে বাড়িতে যেতে ভুলে গেছলে নাকি?"

"আরে না।"—কেষ্ট প্রতিবাদ জানালে,—"তখুনি গাড়ি নিয়ে আসানসোলে যেতে হল যে! এই তো ফিরছি।"

"তা হলেও খবরটা তো বাড়িতে দিতে হয়। বৌদির অবস্থাটা বুঝতে পারছ?"

"সে কি!"—কেষ্ট একেবারে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "বাড়িতে খবর যায় নি?"

"গেলে আমি ছুটে আসি!"

"তার মানে?"—কেষ্টর খড়ের আগুনের মেজাজ এক মুহূর্তে গরম হয়ে জ্বলে উঠেছে বোঝা গেল। দিলীপকে টেনে চৌধুরী সাহেবের ঘরের দিকেই যেতে যেতে সে বললে,—"চল তো একবার দেখি?"

চৌধুরী সাহেব খবর না দিয়ে দুজনকে হঠাৎ ঢুকতে দেখে অবাক ও বিরক্ত যদি একটু হয়ে থাকেন তাঁকে দোষ খুব বোধ হয় দেওয়া যায় না।

"আর একটু বিরক্ত করতে এলাম স্যার!"—বলে কেষ্ট দিলীপকে নিয়ে টেবিলের কাছে এসে দাঁড়াতে তিনি একটু গম্ভীর ভাবেই মুখ তুলে তাকিয়ে নীরস কণ্ঠেই বললেন,—"বেশ কর!"

সে স্বর লক্ষ্য করলেও কেষ্ট তার অভিযোগ জানাতে দ্বিধা করলো না—"আমার বাড়িতে তো কোন খবর যায় নি! আসানসোলে পাঠাবার সময় আপনি সে ব্যবস্থা করবেন কিন্তু বলেছিলেন।"

"বলে থাকলে করেছি।"—চৌধুরী সাহেবের স্বর এখনো মধুর বলা চলে না। কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে কলিং বেলটা তিনি টিপছেন।

বেয়ারা সে ডাকে এসে দাঁড়াতেই তিনি হুকুম দিলেন,—"সরকার বাবুকে ডেকে দাও।"

বেয়ারা হুকুম নিয়ে চলে যাবার পর দুজনের দিকে ফিরে তিনি একটু সহজ ভাবেই বললেন, "খবর না যাবার তো কোনো কারণ নেই।"

পর মুহূর্তেই তাঁর মুখের যে চেহারা দেখা গেল তা একেবারে অন্য ও অপ্রত্যাশিত।

দরজায় একজন কর্মচারী এসে সসম্ভ্রমে তখন দাঁড়িয়েছে। তার দিকে চেয়ে হঠাৎ এক মুহূর্তে জ্বলে উঠে তিনি বললেন,—"আপনাকে কে ডেকেছে? সরকারবাবু কোথায়!"

গলা খুব চড়ায় তোলা নয় কিন্তু তাতে চাপা গর্জনের তীব্রতা।

কর্মচারী এ স্বরে বোধ হয় অভ্যস্ত। খুব বেশী বিচলিত না হয়ে একটু কাছে এগিয়ে এসে বিনীত অথচ স্পষ্ট কণ্ঠে জানালে,—"আজ্ঞে, তিনি কদিন ধরে আসছেন না। জ্বর হয়েছে শুনলাম।"

"হুঁ, খবরটা তাই পৌঁছোয় নি।"—বলে চৌধুরী সাহেব কর্মচারীর ওপরই যেন দোষারোপ করলেন,—"কিন্তু এরকম জ্বরের ছুতো আর কতদিন শুনব? বছরে ছ-মাসই তো কামাই!"

কর্মচারী নিরুত্তর।

চৌধুরী সাহেবের চেহারা ও কণ্ঠস্বর এবার বজ্রকঠিন হয়ে উঠল এক মুহূর্তে,—"মাইনে চুকিয়ে দিয়ে আজই তাঁকে একটা চিঠি দিন। আর তাঁকে আসতে হবে না।"

"যে আজ্ঞে!"—বলে কর্মচারী চলে গেল।

দিলীপ এক দৃষ্টিতে চৌধুরী সাহেবকেই এতক্ষণ সবিস্ময়ে লক্ষ্য করছিল।

"আচ্ছা আমরাও আসি।"—বলে যেতে গিয়েও সে আবার কি ভেবে ফিরে দাঁড়াল। তার পর একটু থেমে বললে,—"একটা কথা কিন্তু না বলে পারছি না।"

"বলুন।"—চৌধুরী সাহেব একটু যেন কৌতূহলের সঙ্গেই মুখ তুলে তাকালেন।

"আপনার কাছে চড়া মেজাজ দেখালে পুরস্কার মেলে"—দিলীপের স্বর একটু তিক্ত।—"আর রোগ বালাই হলে গলা ধাক্কা! অর্থাৎ আপনি রোখা লোকদের দাম দেন আর নিরুপায় দুর্বলের বেলাতেই নির্মম!"

চৌধুরী সাহেবের মুখ নয় যেন কঠিন দুর্বোধ একটা মুখোশ। শুধু দুই চোখে কি একটা যেন বিস্ফোরণের ইঙ্গিত।

বিস্ফোরণ কিছু হল না। বিরাট দেহ নিয়ে চৌধুরী সাহেব ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন। তাঁর চোখে মুখে কৌতুক-হাস্যেরই ভাঁজ পড়েছে।

অদ্ভুত ভাবে দিলীপের দিকে চেয়ে তিনি শান্ত নিরুত্তাপ কণ্ঠে বললেন,—"একটা ভুল আগে করেছিলেন, এখন আবার একটা করছেন বোধ হয়।"

কথাগুলো ভালো করে বিঁধিয়ে দেবার জন্যেই যেন একটু থেমে তিনি আবার বললেন,—"একটা কথা শুধু জেনে যান যে, নিজের কাজে যার ফাঁকি নেই অন্যের ফাঁকি সে সহ্য করে না।"

দিলীপকেও এ কথার পর কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে হল। তার পর কেমন একটু অভিভূত ভাবেই—আচ্ছা নমস্কার—বলে সে দরজার দিকে পা বাড়ালে।

কিন্তু এবারও যাওয়া তার হল না।

চৌধুরী সাহেব পেছন থেকে ডাক দিলেন,—"শুনুন।"

দিলীপ কেষ্টর সঙ্গে একটু বিস্মিতভাবেই ফিরে দাঁড়াল।

"আমায় ডাকছেন!"—দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে।

"হ্যাঁ।"—চৌধুরী সাহেব এবার সশব্দে হেসে উঠলেন—"আপনাকেই আমার দরকার।"

চৌদ্দ

যোশেফ সাহেব একা একা ঘরে বসে তাস নিয়ে Patience খেলছিলেন। হঠাৎ শিসের শব্দে মুখ তুলে তাকিয়ে বেশ একটু অবাকই হলেন।

দিলীপই শিস দিতে দিতে ঘরে ঢুকল। তার চোখমুখে যে খুশি ধরছে না তাই যেন শিসের সুরে উথলে উঠছে।

ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করার কৌতূহল দমন করে যোশেফ শুধু বললেন—"In high spirits, eh ?"

দিলীপের মুখে কোন কথা নেই। সমানে শিস দিয়ে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে সে টেবিলের ধারে দাঁড়িয়ে পাতা তাসগুলো দেখতে লাগল। তার পর নিজে একটা তাস উল্টে অন্য জায়গায় সাজিয়ে দিলে।

"Hey ! stop ! সব মাটি করলে।"—যোশেফ হাঁ হাঁ করে উঠলেন।

"কিছু মাটি হবে না"—শিস থামিয়ে দিলীপ নির্বিকার ভাবে জানালে—"কাম ফতে। তাস একেবারে সাজান পড়ে আছে।"

নিজের কথাটা প্রমাণ করবার জন্যে দিলীপ আরো কয়েকটা তাস চিৎ করে সাজিয়ে দিতেই যোশেফ প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন,—"আরে, আরে, কি করছ কি ! That will be disastrous !"

"Wait and see" - দিলীপ তাসের পর তাস চিৎ করে মিলিয়ে দিতে দিতে গম্ভীরভাবে জানাল, "আজ যা ছোঁব তাইতেই success !"

যাদুকরের ভঙ্গিতে একটা ওল্টানো তাস ধরে দিলীপ তার পর যেন সাধ্যসাধনা সুরু করলে,—"আয় বাবা, এবার একটা লাল আটা। লাল আটা, এই লাল আটা।"

তাসটা উল্টোতে সত্যিই একটা লাল আটা দেখা গেল। দিলীপ যোশেফের দিকে চেয়ে গর্বভরে বললে,—"কি বলেছিলাম ? I can't fail today."

"হুঁ, কিন্তু ব্যাপারটা কি ?"—যোশেফ হেসে দিলীপের দিকে তাকালেন। "সকালে তো শুনেছিলাম ওষুধের ফিরিওয়ালা। শহর শুদ্ধু তোমার ওষুধ কিনছে নাকি ?"

"ওষুধ"—দিলীপের গলায় অবজ্ঞা।—"ও সব ওষুধ-টষুধ বেচা এখন beneath my dignty বুঝেছেন। এখন real property নিয়ে আমার কারবার। চান তো যে কোন রকম বাড়ি আপনাকে দিতে পারি। পনেরো থেকে পাঁচশ যে কোন ভাড়ায়।"

"তার মানে ?" যোশেফ সত্যি একটু অবাক।

"মানে, এখন আমি সেই বিখ্যাত চৌধুরী কোম্পানীর বাড়িঘর ইত্যাদি real estates-এর তদারক করি।"

"You mean you have got a job with Chowdhury the multimillionaire! you must be joking"—বিস্ময়ে যোশেফের মুখ দিয়ে এবার ইংরেজী ছাড়া আর কিছু বেরুল না।

"না, রসিকতাটা আমার নয়, ভাগ্যের। হঠাৎ ভাগ্য আমার সঙ্গে এই রসিকতাটি করেছে। এ রসিকতা কতদূর গড়াবে তাই ভাবছি। হয়ত কালই চৌধুরী কোম্পানীর ময়দার কল কি তেলের কারবারের ম্যানেজার হয়ে যেতে পারি। নিজেকে তাই শুধু বলছি বারবার, ধীরে বন্ধু ধীরে। মাথাটা একটু ঠাণ্ডা রাখ।"

বক্তৃতার ঢঙে কথাগুলো বলে দিলীপ আবার যাবার উপক্রম করতে যোশেফ বলে উঠলেন—"যাচ্ছ কোথায় আবার এখুনি ?"

"যাচ্ছি ?"—দিলীপ ভারিক্কী চালে বললে,—"যাচ্ছি বাড়ি তদারক করতে। জরুরী তদন্ত।"

শেষ কথাটায় নিজেই হেসে ফেলে দিলীপ বেরিয়ে গেল।

জরুরী তদন্তে বাড়ি তদারক করতে দিলীপ যে বাড়ির দরজায় এসে দাঁড়াল সেটি আমাদের চেনা।

দরজাটা আপাততঃ বন্ধ। দিলীপ দুবার টোকা দিতে ভেতর থেকে মায়ার গলাই শোনা গেল,—“কে ?”

যথাসম্ভব গলাটা অন্যরকম করবার চেষ্টা করে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে,—“নির্মলবাবু আছেন ?”

দরজার ওধার থেকে মায়া গলাটা সত্যিই প্রথম চিনতে পারেনি। “না তিনি বাড়ি নেই” বলে সে ফিরে যাচ্ছিল কিন্তু দ্বিতীয়বার দিলীপের প্রশ্নটা শুনে সে দাঁড়াল।

“তিনি বাড়ি ফিরবেন কখন ?”—গলাটা বদলাবার চেষ্টা সত্ত্বেও প্রশ্নকর্তা কে বুঝতে এবার মায়ার দেরী হল না।

কৌতুকটুকু গোপন করে সেও গম্ভীর ভাবে জানালে,—“জানি না।”

দরজা খোলবার তার কোন গরজই যেন নেই।

ওদিক থেকে প্রশ্ন হল,—“আচ্ছা, বেণু বাড়ি আছে ?”

এ প্রশ্নে হেসে ফেলেও মায়া গম্ভীর স্বরেই জানালে,—“না বেণুও নেই।”

এ জবাব দেওয়ার পরও মায়ার কিন্তু দরজা ছেড়ে যাবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

ওধারে দিলীপ তখন জিজ্ঞাসা করবার মত আর কিছু খুঁজে না পেয়ে বুঝি একটু মুস্কিলে পড়েছে। কিন্তু সেটা ক্ষণিক। প্রশ্ন সে একটা ঠিক বার করে ফেললে।

“আচ্ছা ভিখু ? ভিখু ফিরেছে ?”

“না ভিখুও ফেরে নি।”—মায়ার কণ্ঠস্বরের কৌতুকটুকু এবার কিন্তু আর সম্পূর্ণ চাপা গেল না।

ওধার থেকে শোনা গেল,—“তাই তো বড় মুস্কিল হল।”

হেসে দরজাটা এবার খুলে দিয়েও রাস্তাটা প্রায় আগলে দাঁড়িয়ে মায়া জিজ্ঞাসা করলে—“মুস্কিলটা কি হল আপনার ?”

“মুস্কিল এই যে দরজা খোলবার আর কোন ছুতো খুঁজে পাচ্ছিলাম না !” দিলীপ হাসিমুখে সরলভাবে স্বীকার করে ফেললে।

"দরজা খোলাবার আপনি ছুতো খুঁজছিলেন? কেন?"—মায়ার একটু বিরক্ত হওয়ার ভান।

"বাঃ জরুরী কাজ রয়েছে যে!"—দিলীপের অপ্রস্তুত হবার কোন লক্ষণ নেই।

"কি জরুরী কাজ?"—মায়া রীতিমত গম্ভীর।—"কোন জরুরী কাজ আপনার এখানে থাকতে পারে না!"

"ভেতরে ঢুকতে না দিলে বোঝাব কি করে?"—দিলীপেরও জবাব যেন মুখস্থ।

মায়া অসাবধানেই বোধহয় একটু সরে দাঁড়াতেই দিলীপ একেবারে বাড়ির ভেতরে গিয়ে হাজির।

ফিরে দাঁড়িয়ে ভ্রূকুটির সঙ্গে মায়া জিজ্ঞাসা করলে,—"বেশ ভেতরে তো ঢুকেছেন, এখন কি জরুরী কাজ শুনি!"

"আপনার কাছে ফিতে আছে?" মাপবার ফিতে?"—দিলীপ গম্ভীর কাজের লোক।

"ফিতে?"—এবার মায়ার সত্যিই অবাক হবার পালা।—"ফিতে কেন?"

"মাপবার জন্যে। আপনাদের ঘরদোর সব কিছুর একটা হিসেব নিতে হবে।"—দিলীপের গলায় কর্তব্যনিষ্ঠার নীরসতা।

"ঘরদোরের হিসাব?"—মায়া বিমূঢ়।

"হ্যাঁ, কখানা ঘর, কতটা জায়গা, কি মাপ, কতদিন আছেন, ভাড়া কত—এইসব।"

"এসব আপনাকে জানাব কেন?"—মায়া বিস্মিত এবং বিরক্তও বুঝি একটু।

"জানাবেন বাধ্য হয়ে, বাড়িওয়ালার হুকুমে।"—দিলীপ ইতিমধ্যে একেবারে বারান্দায় গিয়ে উঠে সেখানকার একটা মোড়ায় বসে পড়েছে।—"আপনার বাড়িওয়ালা কে জানেন বোধ হয়।"

"এইটুকু জানি যে আপনি অন্ততঃ নন।"—মায়ার গলায় এবার

কৌতুকের সঙ্গে বিদ্রূপ মেশানো।

"ঠিক ধরেছেন ?"—দিলীপের ভাবান্তর নেই।—"তবে জেনে রাখুন আমি বাড়িওয়ালার agent—এ অঞ্চলের সমস্ত বাড়িঘর আমার জিম্মায়। সব তাই নতুন করে দেখে মেপে আবার ভাড়া কষতে হবে।"

"তাই নাকি ?"—মায়ার মুখেও কপট গাম্ভীর্য।—"কিন্তু আপনার পেশাগুলো বড় তাড়াতাড়ি পাল্টাচ্ছে না। ওষুধ বেচা থেকে রাতারাতি house agent হয়ে গেলেন কি করে ?"

"আমি নিজেই ঠিক জানি না। তবে নিয়তির কোন গূঢ় অভিপ্রায় এর মধ্যে আছে বলে মনে হচ্ছে। এখন একটা ফিতে দিন দিকি ?" —দিলীপের কর্তব্যবোধ বেশ সজাগ দেখা গেল।

"আপনি মাপতে এসেছেন, আর ফিতে দিতে হবে আমাকে ?"

"সেটা একটু অন্যায় আবদার অবশ্য মানছি।"—দিলীপ সোজাসুজি স্বীকারই করে ফেললে।—"তা ফিতে যদি না দেন মাপা হবে না।"

হাসি চেপে মায়া জিজ্ঞাসা করলে,—"কি করবেন তা হলে ?"

"কি আর করব !"—দিলীপ যেন নিরুপায় হয়ে বললে,—"একটু গল্পগাছাই করে যাই তাহলে।

"গল্পগাছা করলে কাজ করবেন কখন ?"—মায়া না হেসে পারল না।

"এটাও তো কাজের অঙ্গ।"—দিলীপ বুঝিয়ে দিলে,—' ভাড়াটেদের মনস্তত্ত্বও জানা দরকার এবং তাদের খুশী রাখা।"

"ভাড়াটেরা আপনার সঙ্গে গল্প করলেই খুশী হবে বলে আপনার ধারণা ?"

"ধারণা না বলে আশা কি অনুমানও বলা যায়।"—মায়ার দিকে দিলীপ কৌতুকভরে তাকাল।—আর এমনি এক-আধটা ভুল ধারণা থাকলেই বা ক্ষতি কি ? মানুষকে তাই তো চালায় !"

মায়া এই প্রথম কেমন যেন একটু অস্বস্তির সঙ্গে মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্যে বললে,—"আচ্ছা আপনাকে,—একটু চা দিতে পারলে হত বোধ হয়। কিন্তু—"

"এটা খুব নতুন ধরণের আপ্যায়ন যা হোক!"—দিলীপ হেসে উঠল।—"দিতে পারলে ভালো হত কিন্তু দিচ্ছি না!"

"সত্যি কথাটা অদ্ভুতই হল বটে!"—মায়া একটু অপ্রস্তুত হয়েছে বোঝা গেল। কিন্তু সে ভাবটা সামলে যেন অভিযোগের সুরেই বললে, —"কিন্তু কেন যে দিতে পারছি না সেটা আপনার বোঝা উচিত ছিল।"

"বুদ্ধিটা আমার একটু খাটো স্বীকার করছি।"—দিলীপ তখনও হাসছে।—"কিন্তু দিতে না পারলে প্রস্তাব করবারই কি দরকার ছিল বুঝতে পারছি না।"

"আমার অন্যায় হয়েছে। মাপ চাইছি।"—মায়া রেগেই গেছে মনে হল, —"কিন্তু আপনিই বা কিরকম লোক! নিজের না হয় কাজকর্ম নেই, তা বলে অন্য কারুর যে কাজকর্ম থাকতে পারে সেটুকুও বোঝেন না? আমার সংসারের কাজ সেরে অফিস যেতে হয় তা জানেন? আপনার জন্যে এখন চা করতে গিয়ে আমি অফিসে late হই এই কি আপনি চান?"

"কখনো নয়!"—দিলীপের মুখে সেই হাসি।—"কিন্তু চা না দেওয়ার এ কৈফিয়তের দায় সাধ করে কেন নিলেন তাই ভাবছি। আর মনে মনে এর পেছনে বিবেকের দংশন একটু আছে ভেবে কিঞ্চিৎ খুশীও হচ্ছি।"

দিলীপের কথার ধরনে মুখ ভার করে থাকা বুঝি অসম্ভব। মায়া হেসে ফেলে বললে,—"খুশি যদি আপনি অকারণে হতে চান হতে পারেন। কিন্তু সত্যি আমার কিন্তু আর সময় নেই।"

"তার মানে এখন আমায় উঠতে হবে। তথাস্তু।"—বলে উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে হঠাৎ ফিরে দাঁড়িয়ে সে যেন কৌতুকের স্বরেই আর কি একটা মিশিয়ে বললে—"কিন্তু সময় আছে আমি জানি। অঢেল অনন্ত সময়।"

দিলীপ আর সেখানে দাঁড়াল না। দাঁড়ালে মায়ার মুখের দিকে তাকিয়ে সে কি বুঝত কে জানে।

প্রায় হাল্কা সুরে বলা এই কটা কথা মনের কোন্ গভীরে গিয়ে এমনভাবে বাজবে মায়া-ই কি জানত?

পনেরো

চৌধুরী সাহেবের খাস কামরায় আজ বেশ একটু ভিড়। তাঁর প্রকাণ্ড টেবিলের চারিধারে যারা ঘিরে দাঁড়িয়েছে চেহারায় পোষাকে তারা এ ঘরের সঙ্গে বেশ একটু বেমানান। শক্ত সমর্থ জোয়ান হলেও এ ধরনের চোয়াড় চেহারা জেলের পাঁচিলের ভেতরেই যেন মানায়। আকার প্রকার দেখে তাদের যদি কেউ মার্কামারা গুণ্ডা বলে মনে করে তাকে খুব দোষ দেওয়া যায় না।

চৌধুরী সাহেব কিন্তু সত্যি উদার লোক সন্দেহ নেই। এদের প্রতিও প্রসন্নতার তাঁর অভাব নেই মনে হয়।

চৌধুরী সাহেব আপাততঃ মনোযোগ দিয়ে একটি ফর্দ গোছের কাগজ দেখছিলেন। দেখা শেষ করে মুখ তুলে তাকিয়ে একটু হেসে বললেন,—"খরচাটা একটু বেশী পড়ল না দাশু!"

টেবিল ঘিরে যারা দাঁড়িয়েছে দাশু-ই তাদের মাতব্বর বোঝা গেল। নিজস্ব ভঙ্গিতে একটু দাঁত বার করে দাশু সবিনয়ে জানালে,—"না স্যার! কামটা আউর কমে হাঁসিল হত না। শালা একদম ছুঁচোর মাফিক গর্তে সেঁধিয়ে গেল। কেতো তোয়াজ কোরতে হোলো শালাকে খালি বাইরে আনবার জন্যে।"

চৌধুরী সাহেব আর কিছু বলতেন কি না বলা যায় না, কিন্তু দরজার গোড়ায় দিলীপকে আসতে দেখে, ফর্দটায় একটা সই করে দাশুর হাতে দিয়ে বললেন,—"কেশিয়ার বাবুকে দিলেই টাকাটা পাবে।"

দিলীপ ততক্ষণে ঘরের ভেতর এসে দাঁড়িয়েছে। তাকে প্রসন্নমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন,—"যাক আপনি এসে গেছেন। আপনার জন্যেই ভাবছিলাম।"

"ভাবছিলেন আমার জন্যে!"—দিলীপের স্বরে বেশ সন্দেহের আভাস।

দাশু ও তার দলবল তখন সেলাম করে বিদায় হচ্ছে। চৌধুরী সাহেবকে সেলাম করে দাশু 'সেলাম দিলীপবাবু' বলে দিলীপকেও একটা সেলাম ঠুকে চলে গেল।

দিলীপের মুখ থেকে আপনা থেকেই বুঝি বেরিয়ে গেল,—"আশ্চর্য তো!"

"কোন্‌টা আশ্চর্য ?"—চৌধুরী হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করলেন,—"আপনার জন্যে ভাবছিলাম, এই ?"

"হ্যাঁ সেটা তো বটেই। তার চেয়ে আশ্চর্য আমায় ওদের সেলাম করা। আর আমার নাম ওরা জানল কোথা থেকে ?"

"এখানেই ওরা কাজ করে, সুতরাং নামটা জানা আশ্চর্য কি !"—চৌধুরী আর একবার মধুর হেসে স্নেহভরে বললেন,—"আমার এখানে দুদিন কাজ করলেই বুঝতে পারবেন দিলীপবাবু—এখানে আমরা সবাইকে আপনার বলে মনে করি। এটা শুধু একটা কোম্পানী নয় একটা বৃহৎ পরিবার।"

"হুঁ, তা একটু একটু বুঝতে পারছি।"—দিলীপের স্বরে বিদ্রূপের আভাস নিশ্চয়ই নেই।—"কিন্তু আমার জন্যে ভাবছিলেন কেন বলুন তো?"

চৌধুরী একটু চুপ করে থেকে যেন একটু দ্বিধার সঙ্গেই কথাটা বলে ফেললেন,—"ভাবছিলাম কাজটা আপনার ঠিক উপযুক্ত হয়েছে কি না।"

"আমিই কাজটার উপযুক্ত নই এই বলতে চান কি !" দিলীপের স্বর একটু কঠিন।

চৌধুরী হাসলেন, "এটা শুধু কথার মারপ্যাঁচ দিলীপবাবু। ওসব বিলাস আমাদের জন্যে নয়। সত্যিই বলছি, আপনার যদি একাজে মন না লাগে—"

কথাটা শেষ করতে না দিয়েই দিলীপ বললে, "তা হলে কি অন্য কাজও দিতে পারেন বলছেন ?"

"ঠিক তাই বলছি।" চৌধুরী সাহেবের স্বর অত্যন্ত স্নিগ্ধ।

"মনিব হিসেবে আপনার এই উদারতার জন্যে কৃতজ্ঞ রইলাম, কিন্তু মনের মত নয় বলেই একাজটা ছাড়তে চাই না।"

চৌধুরী সাহেব দিলীপের দিকে সবিস্ময়ে তাকিয়ে একটু চুপ করে থেকে বললেন, "বুঝতে পারলাম না আপনার কথাটা। তবু খুশী হলাম কাজ ছাড়তে চান না জেনে।"

"যদি অনুমতি দেন বুঝিয়ে বলি।" দিলীপের স্বরটা খুব মধুর নয়।

"বলুন।" চৌধুরী উৎসুক ভাবেই দিলীপের দিকে চাইলেন।

দিলীপ এতক্ষণ দাঁড়িয়েই কথা বলছিল। এবার নিজেই চৌধুরীর সামনের চেয়ারটা টেনে নিয়ে বসে ধীরে ধীরে কঠিন স্বরে বললে,—"মাথা গোঁজবার জায়গা নিয়ে এমন লাভের ব্যবসা যে থাকতে পারে তা জানতাম না। আরো তলিয়ে ব্যাপারটা তাই বুঝতে চাই। সামান্য যেটুকু দেখছি তাতেই দিব্যচক্ষু খুলে গেছে।"

চৌধুরী সাহেবের মনে যাই হোক মুখে অন্ততঃ তার কোন পরিচয় পাওয়া গেল না। শুধু একটু যেন আগ্রহের সঙ্গেই জিজ্ঞাসা করলেন, —"কি দেখেছেন জানতে পারি?"

"দেখেছি, ভদ্রলোক হওয়ার কি দাম আমরা দিচ্ছি?" দিলীপের স্বরে তিক্ততাটা আর অস্পষ্ট নয়। "যে ছাদ মাথায় ভেঙ্গে পড়বার দাখিল, তার তলাতেও মাথা গুঁজে আমাদের মানরক্ষা করতে হবে। সুতরাং আপনার থলি না ভরিয়ে আমাদের উপায় কি?"

চৌধুরী একটু হাসলেন। তারপর শান্ত স্বরেই, বললেন,—"থলিটা আমার নয় দিলীপবাবু, চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজএর। এই বাড়িগুলো যে আমাদের কোম্পানীর কি ঝামেলা তা জানেন না। পারলে এখুনি এসব ঘাড় থেকে নামিয়ে ফেলতাম।"

দিলীপও তিক্তভাবে একটু হাসল। "হ্যাঁ ঝামেলা বলেই সেই মান্ধাতার আমলের বাড়িতে আর একটা চুনের পোঁচও কখনও পড়ে নি। দেয়াল ধ্বসে পড়ছে, ছাদ ফুটো, জল নেই, নর্দমা বন্ধ, তবু তার নাম বাসা বাড়ি।"

"বলেন কি দিলীপবাবু!" চৌধুরীর মুখে আহত বিস্ময় ফুটে উঠল। —"এসব কথা তো কিছুই আমি জানি না। এসব বাড়ির যা আয়

তার সিকি ভাগ তো প্রতি বছর মেরামত ইত্যাদির খরচের জন্যে বরাদ্দ !”

“তা হলে সেটা কাগজ কলমেই খরচ হচ্ছে। আপনি খোঁজ নিতে পারেন।”

“নিশ্চয়ই নেব !” বলে চৌধুরী সাহেব বেশ একটু উত্তেজিত ভাবেই কলিংবেল টিপলেন।

চৌধুরী সাহেব চটে না উঠে এভাবে তার কথাটা শুনবেন দিলীপ আশা করে নি। সে একটু নরম হয়েই বললে, “আমাকেও আর একটু দেখতে দিন ব্যাপারটা। হয়তো আরো নতুন কিছু আবিষ্কার করতে পারি।”

ইতিমধ্যে বেয়ারা এসে সেলাম দিয়েছে।

“বিনোদবাবু,”—বলে সংক্ষেপে তাকে নির্দেশ দিয়ে চৌধুরী সাহেব দিলীপের দিকে ফিরে বললেন,—“আবিষ্কার করুন, তাই আমি চাই। শুধু—যাই আবিষ্কার হোক আমাকে তখুনি জানাতে ভুলবেন না।”

বিনোদবাবু বিনীতভাবে তখন ঘরে ঢুকে দাঁড়িয়েছেন। চৌধুরী সাহেব এবার তার দিকে ফিরে অত্যন্ত কঠিন স্বরে বললেন,—“আমাদের এ পাড়ায় ভাড়াবাড়িগুলো সম্বন্ধে কি শুনছি বিনোদবাবু। সেগুলোতে সেই মান্ধাতার আমল থেকে একটা চুনকাম পর্যন্ত নাকি হয়নি ?”

বিনোদবাবু মাথা নীচু করে হাত কচলাতে কচলাতে জানালেন,—‘ আজ্ঞে ওগুলো তো ঠিক আমার ডিপার্টমেণ্ট নয়।”

“তা হলে কার ডিপার্টমেণ্ট এখুনি জেনে আসুন”—চৌধুরী সাহেব হঠাৎ টেবিল চাপড়ে গর্জন করে উঠলেন।

“আচ্ছা আমি তা হলে এখন চলি। নমস্কার !”—বলে দিলীপ চেয়ার থেকে উঠে পড়ল। দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে যেতে সে শুনতে পেলো, চৌধুরী সাহেব রাগে প্রায় ফেটে পড়ে বলছেন,—“আপনাদের আমি সাবধান করে দিচ্ছি, বিনোদবাবু। দিলীপবাবুর কাছে এইমাত্র যা শুনলাম সে রকম অভিযোগ শুনে আমি চুপ করে থাকব না।”

ষোল

একটা শক্ত বাঁকারি দিয়ে খোঁচা দিতেই ঝর ঝর করে চুন-বালির পলেস্তারা খসে পড়ল।

খোঁচাটা দিয়েছে দিলীপ। তার পাশে দাঁড়িয়ে শীর্ণ রুগ্ন চেহারার একটি প্রৌঢ় ভদ্রলোক। মাথায় বিরল যে কয়েকগাছি চুল আছে তা ধবধবে শাদা। এই শীর্ণ দুর্বল মুখে যে সৌম্য একটি প্রশান্তি আছে তার সঙ্গে বেশভূষার দীনদশার অসামঞ্জস্য থেকে তাঁর বৃত্তি অনায়াসেই অনুমান করা উচিত।

হ্যাঁ শিক্ষকতাই তিনি করেন। দিলীপদের অঞ্চলের একটিমাত্র বিদ্যালয়ের তিনি প্রধান শিক্ষক। বিদ্যালয়টি বলা বাহুল্য চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজেরই একটি বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত। দিলীপ সেই সুবাদেই এসেছে বাকি ভাড়া আদায় করতে।

ভাড়া আদায়ের ভূমিকাটা অবশ্য তার একটু অদ্ভুত।

হেডমাস্টার উমেশ সেন একটু ম্লান হেসে বললেন,—"আমায় আর কি দেখাচ্ছেন! আপনি নিজেই দেখুন। এই বাড়িতে ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুল বসাবার বিপদটার কথাও ভাবুন।"

"কিন্তু আমি তার আগে অন্য কথা ভাবছি মাস্টার মশাই।"—দিলীপের বলার ধরনটা হাল্কা, কিন্তু তার ভেতরকার জ্বালাটা খুব প্রচ্ছন্ন নয়।—"আমি ভাবছি এবাড়িটায় যা নোনা আর ঘুণ ধরেছে, তার চেয়ে বেশী ধরেছে আমাদের আপনাদের চরিত্রে। নইলে ছেলেমেয়েদের এই বিপদের কথা জেনেও আপনারা রোজ এখানে স্কুল খোলেন! একটা প্রতিবাদ নালিশ পর্যন্ত করেন না!"

"নালিশ প্রতিবাদ কি কম হয়েছে মনে করছেন,"—হেডমাষ্টার উমেশ সেন করুণ হতাশার সঙ্গে জানালেন,—"কিন্তু এটা আপনাদের চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজের সম্পত্তি। তার বিরুদ্ধে নালিশ চলে! পাহাড় টলাবেন পাকাটির খোঁচায়।"

"কিন্তু তেমন সাহস আর জেদ থাকলে পাহাড়ও টলান যায় মাষ্টার মশাই। অন্ততঃ সেই বিশ্বাসেই আমাদের বাঁচা!"—গলার স্বরটা একটু বেশী চড়া হয়ে গিয়েছিল বলেই দিলীপ একটু থামল, তার পর একটু তিক্ত হাসির সঙ্গে বললে,—"যাক্ আমার নিজের কাজের কথাটা এবার সারি। আপনাদের তিন মাসের ভাড়া বাকি জানেন বোধ হয়! আপনাদের স্কুল বোর্ড আর কতদিন ঘোরাবেন!"

সেন মশাই-এর মুখখানা অপরাধীর মত সঙ্কুচিত হয়ে গেল। কারণ, স্কুলবোর্ড নামে উমেশ সেন মশাই নিজেই সব। দেশ ভাগ হবার আগে সারা জীবনের চেষ্টায় আদর্শ একটি স্কুল যেখানে গড়ে তুলেছিলেন, কপর্দকহীন অবস্থায় প্রায় এক বস্ত্রে সেখান থেকে একদিন প্রাণ-মান বাঁচাতে চলে আসতে হয়েছে। শিক্ষাদানই জীবনের নেশা, তাই শহরতলির এই অঞ্চলে কোন রকমে আবার একটা বিদ্যালয় গড়ে তোলবার চেষ্টা করছেন, এই বছর কয়েক ধরে। কিন্তু সে চেষ্টা সফল হওয়ার আশা নিজেই আজকাল আর করেন না। স্কুল-বাড়িটির মত শরীরও ভেঙে পড়ছে দিন দিন, শুধু প্রাণের আগ্রহের দীপটি নিভেও নিভতে চায় না। জীর্ণ একটি বিপজ্জনক বাড়িতে এ অঞ্চলের দরিদ্র কয়েকটি ছেলেমেয়েদের নিয়ে তাই অনিবার্যের বিরুদ্ধে নিস্ফল সংগ্রামই চালিয়ে যাচ্ছেন।

দিলীপের কথায় মাথা নিচু করে কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সেন মশাই কুণ্ঠিত ভাবে শেষে বললেন,—"আর একটা মাস আমায় সময় দিন। বছরের প্রথম। পড়ার বই কিনে অনেকে আর মাইনে দিয়ে উঠতে পারে নি। পরের মাসে যা করে হোক দু মাসের ভাড়া নিশ্চয় চুকিয়ে দেব!"

"চুকিয়ে দেবেন!"—দিলীপ কেমন একটু যেন বিদ্রূপভরেই সেন-মশাইএর আপাদমস্তক একবার দেখে নিল। নোংরা কি অপরিচ্ছন্ন নয়, কিন্তু পায়ের অতি সুলভ ক্যাম্বিসের জুতো থেকে গলার কলারে সুতো ওঠা গায়ের পুরনো লংক্লথের কোটটিতে পর্যন্ত সেনমশাইএর

সঙ্গতির দৌড় সুস্পষ্ট। আর স্কুলের আর্থিক অবস্থাই তাঁর চেহারা পোষাকে প্রতিফলিত। স্কুলের ভাড়া যোগাতে ওই পরনের ধুতির পরমায়ু যে তালি দিয়ে বাড়াতে হবে তা বোঝা কঠিন নয়।

দিলীপের দৃষ্টিতে যা বিদ্রূপ বলে মনে হয়েছিল তার আসল রূপ এবার বোঝা গেল। কঠিন স্বরে সে বললে,—"ভাড়া চুকিয়ে দেওয়াটাই আপনার আগে ? এ বাড়ি মেরামত করা নয়!"

সেন মশাই একটু বিমূঢ়ভাবে দিলীপের দিকে তাকালেন!—"আপনি পরিহাস করছেন কিনা বুঝতে পারছি না!"

"চৌধুরী সাহেবের কাছে চাকরি করি বলে ওরকম উঁচুদরের পরিহাসও করতে শিখে ফেলেছি মনে করবেন না!"—দিলীপ একটু আহত স্বরেই বললে,—"না পরিহাস নয় সত্যিই আপনাকে বলছি, ভাড়া না দিয়ে এ বাড়ি মেরামতের বিল আমায় দেবেন। তার পর আমি বুঝব।"

মাষ্টার মশাইএর কথাটা বুঝতে বেশ একটু সময় লাগল, তার পর তিনি সবিস্ময়ে বললেন,—"বলছেন কি মশাই! বাড়ি অবশ্য মেরামত হবে, কিন্তু সে বাড়িতে স্কুল আর থাকবে!"

"যদি না থাকে তাহলে এ স্কুল উঠে যাওয়াই ভালো!"—বলে দিলীপ আর সেখানে দাঁড়াল না।

স্কুলের ছুটির ঘণ্টা তখন বাজছে। ছোট ছেলের দল হল্লা করতে করতে বেরিয়ে আসছে স্কুল থেকে। যেন আনন্দের ঢেউ।

দিলীপ কিছু দূর যেতে না যেতে সে ঢেউ তাকে ধরে ফেললে।

বই খাতা নিয়ে ছুটতে ছুটতে একটি ছেলের বুঝি হাত থেকে একটা বই পড়ে গেছে। কুড়িয়ে নিতে মাটির ওপর বসতেই দিলীপের তার দিকে নজর গেল।

আরে এ যে বেণু!

বেণুও তখন তাকে দেখতে পেয়েছে ছুটে কাছে এসে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।—"দারোগা বাবু! দারোগাবাবু! তুমি ভিখুকে খুঁজে পেয়েছ!"

"না, তাকেই তো খুঁজে বেড়াচ্ছি!" মিথ্যে কথাটা খুব সহজে কিন্তু মুখ দিয়ে বেরুল না। ভিখুর কথা একেবারে ভুলে যাওয়ার জন্যে নিজেকে অপরাধীই মনে হল।

বেণু কিন্তু যা বললে দিলীপ তা কল্পনা করতেই পারে নি।

মুখখানা করুণ করে সে জানালে—"তাকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না!"

"কেন বল তো?"—দিলীপ সত্যিই অবাক।

"কি করে যাবে!"—বেণু করুণ গাম্ভীর্যের সঙ্গে বুঝিয়ে দিলে,—"সে তো এখন রোজ বড় হয়ে যাচ্ছে কিনা। সে আমাদের ভুলেই গেছে। বড় হলে সবাই সব ভুলে যায়।"

"তাই নাকি! এটা তো খুব আবিষ্কার করেছ!"—হাল্কা সুরে কথাটা বলবার চেষ্টা করলেও দিলীপের মনের ভেতরটা ওই ছোট্ট ছেলের খেয়ালের কথায় তখন কেমন যেন হয়ে গেছে। জীবনের একটা নির্মম সত্যই শিশুর মুখ দিয়ে আচমকা প্রকাশ পেল কি?

বেণুই তার ক্ষণিক অন্যমনস্কতাটা কাটিয়ে দিলে।

"ওই যা, ভুলেই গেছলাম।"—বেণু বলতে বলতেই দু পা এগিয়ে আবার দারোগাবাবুর খাতির রাখতেই একবার ফিরে দাঁড়াল,—"আজ আর তোমার সঙ্গে কথা বলতে পারব না। এখ্খুনি বাড়ি যেতে হবে।"

"আরে শোন শোন!"—দিলীপ কৌতূহলী হয়ে ডাক দিলে,—"এত তাড়াতাড়ি বাড়িতে যাচ্ছ কেন?"

বেণু ততক্ষণে আরো খানিকটা ছুটে এগিয়ে গেছে। চেঁচিয়ে একবার শুধু বলে গেল,—"আজ যে চিড়িয়াখানায় যাচ্ছি মণির সঙ্গে।"

বেণু তার পরই রাস্তার মোড় ঘুরে অদৃশ্য হল।

দিলীপ তখনও বেণুর কাছে পাওয়া সংবাদটা হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করছে বোধ হয়।

হৃদয়ঙ্গম করবার পর তার মুখে যে দুর্বোধ হাসি ফুটে উঠল সেটা যেন কেমন সুবিধের নয়।

* * * *

দুর্বোধ হাসিটার অর্থ চিড়িয়াখানাতেই বোঝা গেল।

মায়া তখন উঁচু দেয়াল ঘেরা বাঁধানো ডোবার মধ্যে বেণুকে হিপোপটেমাস দেখাচ্ছে।

জানোয়ারটা বেণুর কাছে যত অদ্ভুত, নামটা তার চেয়ে বেশী।

মায়ার কাছে শুনে নামটা সে মুখস্থ করবার চেষ্টা করলে।

"—কি বললে! হিপো হিপোপো…"

"হিপোপটেমাস! হিপ্পোও বলতে পার।"

কথাগুলো মায়ার নয়।

বেণু ও মায়া দুজনেই অবাক হয়ে পাশে তাকাল। তার পর বেণুর উল্লসিত কণ্ঠ—"ও দারোগাবাবু তুমিও এসেছ।"

দিলীপ কখন নিঃশব্দে এসে পাশে দাঁড়িয়েছে তারা সত্যি জানতে পারে নি। মায়াকে যেন দেখতেই পায় নি এমনি ভাবে দিলীপ ভারিক্কী চালে বললে, "হ্যাঁ আমাকে প্রায়ই এখানে আসতে হয় কি না!"

"কেন?"—বেণুর চোখে সরল কৌতূহল।

"কেন জানো না! এই কটা জানোয়ার মানুষ হয়ে গেল আর কটা মানুষ জানোয়ার হল তার হিসেব রাখতে।"—মায়ার মুখটেপা হাসিটুকু আড়চোখে দেখে নিয়ে দিলীপের উৎসাহ বুঝি বাড়ল। বেণুকে সে বোঝালে,—"কিন্তু শোন হিপোপটেমাস নামটা যেন ভুল করো না। ও নাম ভুল করলে বেচারা যা দুঃখ পাবে।"

বেণু বুঝি একটু হতভম্ব। তার প্রশ্নটা নিজেই যুগিয়ে দিয়ে দিলীপ বলে চলল, "কেন দুঃখ পাবে ভাবছ তো! দুঃখ পাবে এই জন্যে যে ওই নামটুকুই ওর সব কিনা। আসলে শূয়োরের বংশ তো। ডুবে ডুবে জল খেয়ে ফুলে ঢাক হয়েছে, তাই সেই ঢাকের বাদ্যির মত শুধু নামটুকুর বড়াই—হি-পো-প-টে-মা-স!"

নিচের ডোবায় তখন ধাড়ি হিপোপটেমাসটা মুখব্যাদান করেছে।

বেণু তা দেখে বিস্মিত। মায়ার হাত ধরে টান দিয়ে বললে, "কত বড় হাঁ দেখো মণি।"

"ওটা হাঁ নয়, না!" দিলীপ গম্ভীর মুখে মন্তব্য করলে।

উদ্দেশ্যটা এবার বিফল হল না। মায়া এবার স্পষ্টই হেসে ফেলে জিজ্ঞাসা করলে,—"সেটা কি রকম?"

দিলীপ হেসে এবার সোজাসুজিই মায়ার দিকে ফিরল।

"বুঝতে পারলেন না? ক্ষিদের চেয়ে হাঁ-টা বড় কিনা, তাই নিজের পেটটুকু ছাড়া দুনিয়ার সব কিছুই না!"

এ সব গোলমেলে কথা বেণুর পছন্দ নয়। হিপোপটেমাসের আকর্ষণও ফুরিয়েছে। সে দিলীপকে টান দিয়ে বললে, "চলো দারোগাবাবু, তোমায় আমাদের সঙ্গে যেতে হবে!"

মায়ার দিকে একবার দৃষ্টিপাত করে দিলীপ যেন নিয়তির কাছেই নিজেকে ছেড়ে নেবার ভাব দেখালে।

"হ্যাঁ আমারও তাই মনে হচ্ছে। দেখা যখন হয়েই গেছে তখন ছাড়াছাড়ি না হওয়াই ভালো। চলো।"

গতিটা এবার জিরাফ জেব্রাদের ডেরার দিকে।

যেতে যেতে দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে একটু হেসে,—"আমায় এখানে দেখে খুব অবাক হয়েছেন নিশ্চয়?"

মায়ার উত্তরটা একটু বাঁকা।—"না, আপনার বিষয়ে অবাক হওয়া ছেড়ে দিয়েছি।"

দিলীপ যেন অত্যন্ত বিস্মিত আহত হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল,—"বলেন কি! এরই মধ্যে!"

তার পর যেন অতি দুঃখের সঙ্গে মাথা নেড়ে বললে,—"না ভালো করেন নি! কি আপনি হারাইতেছেন জানেন না। বিনামুল্যে সারাজীবন কত রকমে অবাক হবার সুবিধে পেতেন ভাবুন তো!"

"সারাজীবন ধরে অবাক হতে হবে?" মায়ার চোখে কপট আশঙ্কার ছায়া।—"ও শাস্তি কেউ সাধ করে চায়!"

দিলীপ জুৎসই একটা জবাব তৈরী করবার আগেই বেড়ার ধার থেকে বেণুর ডাক এল,—"মণি, দারোগাবাবু শীগ্‌গির এসো।"

বেণু আগেই তাদের হাত ছেড়ে বেড়ার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

মায়া ও দিলীপ কাছে যেতে সে মুগ্ধ বিস্ময়ে প্রশ্ন করলে,—"এটা জিরাফ না মণি! গলাটা অত লম্বা কেন দারোগাবাবু!"

"তা জানো না!" দিলীপ বোঝাতে তৎপর হল।—"আফ্রিকার তেপান্তরে জিরাফ ভায়া কোথা থেকে একদিন শুনলেন যে যার মাথা যত উঁচু তার তত মান। তাই না শুনে জিরাফ ভায়া মাথা ওপরে ঠেলবার জন্যে গলা কেবল বাড়িয়েই চললেন। বাড়াতে বাড়াতে গলা সব জন্তু জানোয়ার এমন কি গাছের মাথাও ছাড়িয়ে গেল।"

বেণুর ব্যাখ্যাটা পছন্দই হল। তবু সমর্থনের জন্যে মায়াকে একবার জিজ্ঞেস করলে,—"হ্যাঁ মণি তাই!"

দিলীপের দিকে একবার সকৌতুকে চেয়ে মায়াকেও সায় দিতে হল,—"হ্যাঁ তাই!"

সায় দেবার সঙ্গে দিলীপের ব্যাখ্যা একটু বাড়িয়েও দিলে,—"তবে মিথ্যে অহঙ্কারে মাথা শুধু উঁচুতে তুলতে যা হয় জিরাফ ভায়ারও তাই হয়েছে। মাথা যত ওপরে উঠেছে তত হয়েছে ছোট।"

"আর ওই যে দেখছ গায়ে ডোরা কাটা জেব্রা," দিলীপের বোঝাবার উৎসাহ এখন বেড়ে গেল,—"ও হল আমাদের ঘোড়ার আপন কুটুম।"

"গায়ে তাহলে দাগ কেন?" বেণুর সঙ্গত প্রশ্ন।

"ঘোড়ার মত মানুষের লাগাম মুখে পরতে চায় না বলে চাবুক খেয়েছে। ও সেই চাবুকের কালসিটে দাগ!"

"লাগাম পরলে আর তো কেউ চাবুক মারত না?" বেণু সাগ্রহে জিজ্ঞাসা করলে।

"হতভাগা সেইটেই যে কেন বোঝে না!" দিলীপের মুখ বাঁকাবার ধরনে মায়া না হেসে পারল না।

এতক্ষণ দিলীপই মূল গায়েনের ভূমিকা নিয়েছে।

সিংহের খাঁচাটার কাছে এসে মায়া ভূমিকাটা পাল্টে নিলে। সিংহটা অস্থির ভাবে খাঁচার ভেতর পায়চারী করছে। মায়া দিলীপ দুজনেই বেণুর দিকে চেয়ে হেসে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি? ভয় করছে বেণু!"

বেণু দুজনের হাত দুদিক থেকে বেশ শক্ত করে ধরে যথাসম্ভব সাহস দেখিয়ে জানালে,—"কই না তো!" তার পর নিজের আশঙ্কাটুকুও প্রশ্নের ছলে না জানিয়ে পারলে না—"আচ্ছা, সিংহ খাঁচার গরাদ ভাঙতে পারে?"

"পারলে কি আর বন্দী হয়ে থাকত।"—দিলীপ হেসে আশ্বাস দিলে, কিন্তু মায়া প্রতিবাদ জানিয়ে বললে,—"পারলেও হয়ত থাকত!"

"তাই মনে হয়! কেন বলুন তো?"—দিলীপ সকৌতুক দৃষ্টিতে মায়ার দিকে তাকাল।

"কেন?"—মায়া বেশ গম্ভীর ভাবেই জানালে,—"বন্দী হওয়ার মজা বুঝে ফেলেছে বলে। বনে জঙ্গলে আর লাফাই ঝাঁপাই করবার দরকার নেই। ঠিক ঘড়ি ধরে এমন বরাদ্দ মাফিক খোরাক পেলে আর কি চাই!"

"কিন্তু ও খোরাকে যে পেট ভরে না।"—দিলীপ হাসল।

"তা নিয়ে কে ভাবে? নির্ঝঞ্ঝাট সোয়াস্তিতে পেটের জ্বালাও সয়ে যায়।"—মায়ার জবাব যেন মুখস্থ ছিল।

দিলীপ মায়াকে যেন পরীক্ষা করবার জন্যেই মুখ টিপে হেসে জিজ্ঞেস করলে,—"তাহলে ওই পায়চারির ছটফটানিটুকু কেন?"

"ওটা!"—মায়া চট্ করে এ প্রশ্নের জবাবও দিয়ে ফেললে,—"ওটা অভ্যাস বলতে পারেন। কিংবা 'এখনো কি না পারি' গোছের আস্ফালনের বিলাস।"

"মানে, আমাদের যা সম্বল।"

দুজনেই এবার হেসে উঠল। বেণু কিন্তু বিরক্ত হয়ে তখন দুজনের হাত ধরেই টান দিচ্ছে,—"আঃ চুপ করো না। তোমরা কেবল নিজেরাই কথা বলছ। আর কোথাও যেতে হবে না!"

বেণুকে এতক্ষণ ভুলে থাকা যে উচিত হয় নি তা বুঝে দুজনেই তখন অপ্রস্তুত।

"না, না, খুব অন্যায় হয়েছে চল।"—বলে দিলীপই তার হাত ধরে এগিয়ে গেল এবার।

চিড়িয়াখানায় ঘুরে ঘুরে এক সময় কোথাও বসতেই হয়। আর বসবার পক্ষে, যে-ঝিলের জলে অপরূপ কৃষ্ণমরালী ভেসে বেড়ায় তার ধারের ঘাসের বিছানার চেয়ে ভালো আর কি হতে পারে!

কিছুক্ষণ বাদে দিলীপ আর মায়াকে সেখানেই বসে থাকতে দেখা গেল। সামনে একটি তোয়ালে পাতা, তার ওপরে খাবারের একটি বাক্স খোলা।

খাবারের বাক্স বেণুর জন্যেই এসেছিল নিশ্চয়। কিন্তু খাওয়ার চেয়ে ঝিলের ধারে দাঁড়িয়ে কালো রাজহাঁস দেখার আগ্রহ তার বেশী। হাতে যে সন্দেশটি তার আছে তা তার নিজের মুখে যতটা যাচ্ছে তার চেয়ে বেশী যাচ্ছে রাজহাঁসদের উদ্দেশে ঝিলের জলে।

মায়া বার কয়েক বেণুকে আরো কিছু খাবার নিয়ে যাবার জন্যে মিছে ডাকাডাকি করে শেষে দিলীপের দিকে ফিরে বললে,—"কই, আপনি যে হাত গুটিয়ে আছেন। লজ্জা করছে নাকি?"

'থাকলে নিশ্চয় করত।"—দিলীপের চোখ মুখে কৌতুকের হাসি।—"উড়ে এসে জুড়ে বসেছি তো বটে। কিন্তু চরিত্রের ওই লজ্জা নামক ভূষণ থেকে আমি বঞ্চিত।"

"নিজের চরিত্র আপনি তাহলে ভালো করেই বোঝেন!"—মায়া একটু খোঁচা মিশিয়ে বললে,—"সেটাও কম গুণ নয়।"

"হ্যাঁ, তবে সেটাও একটা দুর্ভাগ্য।"—দিলীপ কথাটা ঘুরিয়ে দিলে,—''আমি কি, আর কি নই, কি চাই আর কি চাই না, এত স্পষ্ট করে না বুঝলে ভালো হত। আলো আঁধারিতে আরো অনেক সুখে থাকা যেত।"

"মানে মূর্খের স্বর্গে বলছেন,"—মায়া হাসল।—"কিন্তু স্বর্গে পৌঁছোবার জন্যে একটু মূর্খ হলেই বা ক্ষতি কি!"

"ক্ষতি কেন? অনেক লাভ। কিন্তু পারছি কই।"—দিলীপ যেন হতাশ ভাবে বোঝাতে চেষ্টা করলে,—"এই ধরুন না, এই এখানে এসে বসে থাকার কি একটা মধুর মানে-ই না দেওয়া যায়। ওখানে বিলের জলে কৃষ্ণ মরালী ভেসে বেড়াচ্ছে, এই ঘাসের বিছানা যেন মাটির আদর—"

"থামুন। থামুন।"—মায়া পরম কৌতুকে হেসে উঠল।

"ওই তো! থামিয়ে দিলেন তো হেসে!"—দিলীপ যেন বেশ ক্ষুণ্ণ।—"তার মানে স্বর্গ রচনা করবার মত মূর্খ হওয়া অত সোজা নয়।"

দিলীপ দু-এক মুহূর্তের জন্যে একটু থেমে আবার বলতে সুরু করলে,—"তবু এক এক সময়ে রাগ হয় নিজের ওপরে। কেন ভুলতে পারি না রূঢ় সত্যকে—কেন ভুলতে পারি না যে এটা-একটা দেয়ালঘেরা সরকারী চিড়িয়াখানা, জনা পিছু তিন আনা যার দর্শনী। কেন মন থেকে মুছতে পারি না যে এখান থেকে বেরিয়ে সেই বাসের ঠেলাঠেলি, সেই নোংরা শহর, সেই ঘড়ি ধরা জীবন—"

কথা বলতে বলতে হাল্কা পরিহাসের সুরটা কখন ক্ষোভে বেদনায় গাঢ় হয়ে গেছে দিলীপও বোধহয় বুঝতে পারে নি। মায়া এবার যেভাবে উত্তর দিলে তার ধরনটাও আলাদা। বললে,—"কিন্তু ওগুলো ভুলতেই বা যাব না কেন? আমার স্বর্গ সব সত্য স্বীকার করেও গড়া যায় বলে আমি বিশ্বাস করি।"

মায়ার কণ্ঠের অপ্রত্যাশিত সুরটার জন্যেই বুঝি দিলীপ তার দিকে অমন এক দৃষ্টে তাকিয়ে বললে,—"ওই বিশ্বাসই যদি পেতাম!"

দিলীপের সেই একাগ্র দৃষ্টিতেই মায়ার যেন হঠাৎ ক্ষণিকের চটক ভেঙে গেল। একটু অস্বস্তির সঙ্গে চোখ ফিরিয়ে সে ব্যাপারটা হাল্কা করবার জন্যে বললে,—"এ বিশ্বাস কি কেউ কাউকে দিতে পারে। এ তো দেশলাই-এর কাঠি দিয়ে জ্বেলে দেবার নয়।"

"আহা তবু আগুনের ফুলকি থাকলে হাওয়া দিয়ে তাকে জ্বালানও তো যায়!"—দিলীপও হেসে ব্যাপারটাকে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করলে।

অস্বস্তিবোধটা তবু দুইজনেরই কাটতে বোধহয় দেরী হত যদি বেণু হঠাৎ এসে সোৎসাহে না জানাত,—"মণি, দারোগাবাবু! তোমরা দেখলে না তো আমি ওই কালো হাঁসটাকে সত্যি একবার ছুঁলাম। ওটা রঙ করা নয়। সত্যি কালো!"

মায়া ও দিলীপকে যথোচিত বিস্ময়ের ভান করতে হল।

"তাই নাকি? সত্যি!"

কিন্তু তাতেও দোষ কাটল না। বেণু ভর্ৎসনার সুরে বললে,—"হ্যাঁ তোমরা তো দেখলে না। কি যে তোমরা শুধু বসে বসে বক্‌বক্ করো!"

দিলীপ মায়ার দিকে একবার চেয়ে অত্যন্ত অপরাধীর মত স্বীকার করলে,—"হ্যাঁ, শুধু কথাই বাড়ালাম।"

সতেরো

চিড়িয়াখানা থেকে বলা বাহুল্য দিলীপ মায়া ও বেণুর সঙ্গেই তাদের বাড়ি পর্যন্ত গেল।

বাড়ির দরজা বন্ধ। যাবার সময় মায়া দরজায় তালা দিয়েই গেছল। তালা বেণুর দাদা নির্মলবাবুই যে খুলেছেন সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু অসময়ে বাড়ি ঢুকে দরজা বন্ধ করে থাকবার লোক তো তিনি নন।

মায়া একটু বিস্মিত ও চিন্তিত হয়ে দরজায় একটু জোরে জোরে কবার ঘা দিতে নির্মলবাবুই এসে দরজা খুলে দিয়ে কেমন একটু উত্তেজিত ভাবে বললেন,—"ওঃ তোরা এসে গেছিস্ !"

দিলীপকে পেছনে দেখতে পেয়ে,—"এই যে Good Evening" জানিয়ে তিনি আবার মায়াকে উদ্দেশ করেই বললেন,—"ঈস্ আর দু মিনিট দেরি করতে পারলি না !"

ব্যাপারটা বুঝতে না পেরে ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে মায়া অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কেন ? দু মিনিট দেরি করলে কি হত ?"

"কি আর হত !"—নির্মলবাবু রহস্যজনক ভাবে জানালেন,—"তা হলেই সব একেবারে নিখুঁত, perfect."

রহস্যজনক ব্যাপারটা যে কি বেণুর উচ্ছ্বসিত চীৎকারেই তার খানিকটা আভাস পাওয়া গেল।

"ও মণি, দেখ দেখ কত ফুল !"

সত্যিই বাইরের ঢাকা বারান্দাটা ফুলের তোড়া আর মালায় বেশ চমৎকার ভাবেই সাজান হয়েছে।

মায়া অবাক হয়ে দাদার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"এসব কি দাদা ! ব্যাপার কি !"

নির্মল রহস্যটাকে আরো ঘনীভূত করে, যেন ক্ষোভের সঙ্গেই বললেন,—"তা তুই-ই তো জিজ্ঞাসা করবি !" পর মুহূর্তে দিলীপের

প্রতি মনোযোগ দিয়ে অভ্যর্থনায় উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন,—"বসুন দিলীপবাবু বসুন। আপনি আসাতে কি খুশী যে হয়েছি কি বলব!"

হঠাৎ আর একটা কথা মনে পড়ায় নির্মলবাবু প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন,—"ও আমার আসল কাজই বাকি। রামের মা! রামের মা! শীগ্‌গির শীগ্‌গির।"

দিলীপ মায়া বেণু সবাই বিমূঢ়।

মায়া দাদার ভাবগতিক দেখে এবার হেসে ফেলে বললে,—"কি যেন ম্যাজিক দেখাবে মনে হচ্ছে?"

"ম্যাজিক!"—নির্মলবাবু একগাল হেসে মায়ার দিকে ফিরলেন,—"তা ম্যাজিক বলতে পারিস। দাদার ওপর ভক্তি-শ্রদ্ধা তো নেই, কিন্তু দাদা সত্যিই এখনো ম্যাজিক দেখাতে পারে রে!"

নির্মলবাবু আবার রান্নাঘরের দিকে মুখ ফিরিয়ে চীৎকার করে উঠলেন,—"কই রামের মা! কি হল কি!"

রান্নাঘর থেকে তিনবার শঙ্খধ্বনি শোনা গেল এবার। সঙ্গে সঙ্গে নির্মলবাবু বারান্দায় টেবিলের ওপর রাখা একটা কাগজের বাক্সের ঢাকনি খুলে দিয়ে বললেন,—"এই—এইবার তাহলে ম্যাজিক।"

কাগজের বাক্সটার ওপরকার বড় বড় হাতের লেখা এবার চোখে পড়ল—

স্নেহের মায়ার জন্মদিনে—দাদ

শেষের শব্দটা সহজ বলে বেণুই প্রথম সেটা বানান করে পড়বার চেষ্টা করে বলে উঠল—"দ-এ আকার দা আর দ, দাদ। দাদ কি বাবা?"

"ওই তো"—নির্মলবাবু হতাশার ভঙ্গি করলেন,—"তোরা তাড়াতাড়ি এসে পড়লি বলে ওই আকারটা আর শেষ করতে পারলাম না।"

কাগজের বাক্সটা খুলে এবার তিনি আসল জিনিসটি বার করে মায়াকে জিজ্ঞেস করলেন,—"কেমন? ভালো?"

শাড়িটা দামী না হলেও খেলো নয়। মায়া সত্যিই তখন অভিভূত। —"ভালো, খুব ভালো!" শাড়িটা হাতে করে সে দাদার পায়ের ধুলো নিলে, তারপর একটু হেসে ঈষৎ অনুযোগের স্বরে বললে,—"কিন্তু কেন এসব করতে গেলে বলো তো!"

"বাঃ কেন করতে গেলাম"—নির্মলবাবু যেন সালিশী মানতে দিলীপের দিকেই ফিরলেন,—"একটা মাত্র বোন, তার জন্মদিনটার কথাও আমার খেয়াল থাকবে না! আপনি বলুন না দিলীপবাবু, মা বাবাই না হয় নেই, কিন্তু আমি তো আর মরে যাই নি। আমি থাকতে বোনের জন্মদিনটাতেও একটা কিছু হবে না!"

"তা কি হয়!"—দিলীপ সোৎসাহে নির্মলবাবুকে সমর্থন করলে,— "আর জন্মদিন তো বছরে একটার বেশী নয়।"

ইতিমধ্যে রামের মা নামে পরিচারিকা এসে টেবিলের ওপর কয়েক থালা মিষ্টি আর জল সাজিয়ে দিয়ে গেছে।

মায়া সেগুলোর দিকে চেয়ে ঠাট্টার সুরেই বলবার চেষ্টা করলে,— "কিন্তু কারুর কারুর বেলায় সেই একটা দিনে উৎসবের বদলে শোক-সভা করলেই বেশী মানায় না কি!"

ঠাট্টার সুরটা শেষ দিকে আপনা থেকেই কেমন করুণ হয়ে উঠল, তারপর ওরই মধ্যেই একটু তিক্তই বলা যায়। শাড়িটাকে দেখিয়ে সে বলল,—"আর তাও উৎসব যদি করলে এ সব শাড়ি-টাড়ির কি দরকার ছিল। এ সব বাজে খরচের পয়সা পেলে কোথায়?"

সুরটা ঠিক অভিযোগের না হলেও নির্মলবাব্ কেমন একটু বিব্রত উঠলেন যেন। আর সে ভাবটা ঢাকতে গলা চড়িয়ে দিলেন,—"শোনো কথা। পয়সা পেলাম কোথায়? আরে তাতে তোর কি দরকার? নির্মল রায়, দুদিন একটু কাবু হয়েছে বলে ত্রিশটা টাকা আর যোগাড় করতে পারে না।"

দিলীপের সামনে বাহাদুরী দেখাবার উৎসাহটা এবার বেড়ে গেল। —"বুঝেছেন দিলীপবাবু, একটা শুধু চিরকুট সই করে পাঠালে

কমলচাঁদ ফতেচাঁদের দোকান থেকে অমন পাঁচ শ টাকার শাড়ি এখুনি চলে আসতে পারে—আমি শুধু ও সব খাতির-টাতির নেওয়া পছন্দ করি না তাই—”

নির্মলবাবু আত্মপ্রচার আরো উঁচু পর্দায় হয়ত উঠত, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরের দরজায় কড়া নড়ে উঠল।

নির্মলবাবু বক্তৃতা থামিয়ে বিরক্তির সঙ্গে হেঁকে উঠলেন—“কে ?”

রুক্ষ স্বরে জবাব এল,—“নোটিশ আছে! সই করে নিতে হবে।”

এবার দেখা গেল দরজার বাইরে একজন পিওন দাঁড়িয়ে।

মায়া উঠতে যেতেই নির্মলবাবু তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করলেন, —“থাক্ থাক্ আমি যাচ্ছি।”

“না, দেখি আবার কিসের নোটিশ,”—বলে মায়া ততক্ষণে এগিয়ে গেছে।

নির্মলবাবু আবার সোৎসাহে দিলীপের দিকে ফিরলেন,—“কই চুপ করে আছেন কেন দিলীপবাবু! হাত লাগান! অতিথি বলতে তো আপনি একা।”

“হ্যাঁ অনাহূত হলেও অবাঞ্ছিত আশা করি না।”—বলে দিলীপ হাসল।

“Certainly not”—বলে নির্মলবাবু টেবিল চাপড়ালেন। তাঁর মেজাজ এখন উঁচু সুরে বাঁধা। বললেন,—“বুঝেছেন, এখন মনে হচ্ছে Great Eastern-এ একটা ডিনার দিয়েই Celebrate করা উচিত ছিল। কিন্তু আমার আবার মুস্কিল কি জানেন, ওসব জায়গায় কিছু করতে গেলেই আমার Circle-এর কাকে রেখে কাকে বাদ দেব ভেবে পাই না। এই আপনাদের চৌধুরী সাহেবকেই কি আর—”

“চৌধুরী সাহেবের কথা কি বলছিলে দাদা ?”

মায়া যে কখন ফিরে এসে দাঁড়িয়েছে বক্তৃতার উৎসাহে নির্মলবাবু লক্ষ্যই করেন নি।

এখন একটু যেন অপ্রস্তুত হয়ে বললেন,—“না এই মানে,—বলছিলাম—”

হাতের কাগজটা দেখিয়ে মায়া বললে,—"যাঁর কথা বলছিলে তিনিই আমাদের স্মরণ করেছেন।"

নির্মলবাবুর চেহারাটা কেমন একটু যেন বদলে গেল। মায়ার হাত থেকে কাগজটা নিয়ে একটু অস্বস্তির সঙ্গে বললেন,—"কিন্তু মানে—নোটিশ বললে যে—"

"হ্যাঁ চৌধুরী কোম্পানীরই নোটিশ, বাড়ি ছেড়ে দেবার জন্যে। চার মাস আমাদের ভাড়া বাকি পড়েছে।"—মায়ার গলার স্বর যেন কাঠিন্য আর কান্নায় মেশানো।

নির্মলবাবু কিন্তু যেন জ্বলে ওঠবার ভান করলেন,—"বাঃ ভাড়া বাকি পড়বে কেন?"

"কেন তাই তো আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করছি দাদা। প্রত্যেক মাসে তুমি তো ভাড়ার টাকা দিতে নিয়ে গেছ!"

"হ্যাঁ আমি কি,—মানে আমি কি নিই নি বলছি!"—নির্মলবাবু গলাটা চড়া রাখবার চেষ্টা সত্ত্বেও কেমন যেন কথা গুলিয়ে ফেলছেন মনে হল। চেয়ার থেকে উঠে পড়ে বললেন,—"আচ্ছা আমি দেখছি এ নোটিশের মানে কি?"

"মানে আমি জানি দাদা।"—মায়ার স্বর এবার হতাশ ও ক্লান্ত।—"আমার জন্মদিনের এও একটা উপহার। এই আশ্রয়টুকুও এবার ঘুচল!"

"বাঃ অমনি ঘুচলেই হল!" নির্মলবাবুর গলায় কিন্তু আর সে তেজ নেই। কোনরকমে সরে পড়তে পারলেই যেন বাঁচেন। হন হন করে দরজার দিকে এগুতে এগুতে শেষ চাল বজায় রাখার চেষ্টায় বললেন,—"দেখছি, দেখছি আমি, কি গোলমাল হয়েছে। আমি এক্ষুনি যাচ্ছি।"

"যেতে চাও যাও, কিন্তু নোটিশটা দিয়ে যাও।"

মায়ার স্বর রূঢ় কি কঠিন নয়। কিন্তু নির্মলবাবুকে থামতে হল। মুখটাও এবার কেমন কাঁচুমাচু। নোটিশটা মায়ার হাতে দিয়ে কোন কথা না বলেই তিনি বেরিয়ে গেলেন।

দিলীপের এতক্ষণ যে অবস্থা হয়েছে তা বর্ণনার অতীত। এই বিশ্রী পারিবারিক সঙ্কটের মধ্যে অপ্রত্যাশিত ভাবে এসে পড়ে হঠাৎ উঠে যাওয়া যেমন, বসে থাকাও তেমনি লজ্জাকর যন্ত্রণা।

মায়া এতক্ষণে তার দিকে ফিরতেই দিলীপ খানিক চুপ করে থেকে অপরাধীর মত বললে,—"আমি সত্যি দুঃখিত।"

"কেন?" মায়ার মুখে এবার করুণ একটু হাসি।

"আমার এখানে না থাকাই উচিত ছিল। কিন্তু—"

"কিন্তু হবার তো কিছু নেই।" মায়ার স্বর ব্যথিত হলেও তেমন তিক্ত আর যেন নয়। "সাধ করে আলাপ যখন করেছেন তখন জন্ম-দিনের উৎসবটা পুরোপুরিই পালন করে যান।"

সত্যিই হাসতে হাসতে উঠে রান্নাঘরের দিকে যেতে যেতে মায়া তার পর বললে,—"নিন খাওয়া সুরু করুন। আমি আপনার জন্যে চা নিয়ে আসি।"

"কিন্তু দেখুন"—দিলীপ একটু অস্বস্তির সঙ্গে বাধা দেবার চেষ্টা করলে। কিন্তু তার কথা অগ্রাহ্য করে হাসতে হাসতে মায়া বলে গেল, "না—না, জন্মদিনের উৎসব আজ সত্যিই করব। এ দিনটা মিথ্যে হতে দেব না।"

মায়ার হাসিটা রান্নাঘর থেকেও শোনা গেল।

সেই হাসির মানেটা বোঝার চেষ্টাতেই দিলীপ তখন বুঝি বিমূঢ়।

আঠারো

চৌধুরী ইন্‌ডাস্ট্রিজ-এর এলাকায় ঢুকতে সেই প্রকাণ্ড গেট।

আজ ঢুকতে গিয়ে দিলীপকে একটু অপেক্ষা করতে হয়।

প্রকাণ্ড একটা মালবোঝাই লরি ঢুকছে। লরিটার আগাগোড়া ঢাকা। তবু পাশের ফাঁক দিয়ে বড় বড় বস্তাগুলো চোখে পড়ে।

গেট পেরিয়ে আবার জোরে চালাবার সময় একটা আলগা বস্তা কেমন করে ধার থেকে মাটিতে সজোরে পড়ে গিয়ে ফেটে যায়।

গেটের দারোয়ান হাঁক পাড়তে পাড়তে গাড়ির পেছনে ছোটে—"এ ড্রাইভার! রোখো রোখো জল্‌দি।"

ড্রাইভার অদূরে গিয়ে লরি থামায়।

দিলীপ ততক্ষণে ফেটে যাওয়া বস্তাটার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে। বস্তা ফেটে মাটির ওপর কি ছড়িয়ে পড়েছে দেখবার জন্যে একটা টুকরো সে তখন তুলেও নিয়েছে।

জিনিসটা কি বুঝতে তার দেরী হয় না। মোলায়েম শাদা পাথর-কুচি।

দারোয়ানের ডাকে লরির ড্রাইভার তখন গাড়ি পিছু হটাচ্ছে।

দারোয়ান কাছে আসতে দিলীপ তাকে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে,—"এ কেয়া হ্যায় দরোয়ানজী?"

দরোয়ান চোখ টিপে একটু হেসে বলে,—"যাইয়ে বাবু, যাইয়ে।"

তারপর লরির কুলিদের ওপর দরোয়ানজী খাপ্পা হয়ে ওঠে,—"ক্যায়সা কাম করতে হো. বুদ্ধু কাঁহাকা! এ কেয়া এ্যায়সা গিরানে কা চিজ হ্যায়!"

দুজন কুলি তাড়াতাড়ি নেমে বস্তাটা ওপরে তোলায় তৎপর হয়।

দিলীপ আর সেখানে দাঁড়ায় না। পাথরকুচিটা পকেটে ফেলেই অফিসের দিকে পা বাড়ায়।

অফিসের বাড়িভাড়া সংক্রান্ত বিভাগেই প্রথম গিয়ে সে মায়াদের দেওয়া নোটিশটা দেখায়।

জিজ্ঞাসা করে,—"এ নোটিশ তো এই ডিপার্টমেণ্ট থেকেই গেছে?"

বিভাগের কেরানী নোটিশটা হাতে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে সবিনয়ে বলে,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

চৌধুরী কোম্পানিতে যারা চাকরি করে অমায়িকতা ও বিনয় বুঝি তাদের মজ্জাগত।

এরই ভেতর গুণ্ডাগোছের চেহারা সেই দাশুর দল সেখান দিয়ে যেতে যেতে সসম্ভ্রমে তাকে সেলাম জানিয়ে যায়।

অনিচ্ছায় হলেও সে সেলামের জবাবে হাতটা তুলে দিলীপ কেরানীকে আবার জিজ্ঞাসা করে,— "এখানে নোটিশ দেওয়ার নিয়মটা কি বলতে পারেন? তিন মাস বাড়ি ভাড়া বাকি পড়লেই একেবারে উচ্ছেদের নোটিশ! বাকি ভাড়া যদি ভাড়াটে মিটিয়ে দেয়?"

"মিটিয়ে দেবে কি করে?" কেরাণী সবিনয়ে জানায়,—"আমরা তো আর ভাড়া নিতে পারি না।"

"নিতে পারেন না?"—দিলীপ অবাক।—"তার মানে কোন রকমে তিন মাস বাকী পড়লেই বাড়ি ছাড়তে হবে?"

কেরানীর মুখের হাসিটা একটু যেন মিলিয়ে আসে। গলার স্বর কিন্তু তেমনি মোলায়েম।—"আমাকে এসব কথা বলে লাভ কি! যা নিয়ম তাই আপনাকে জানালাম।"

"কিন্তু এটা কি মগের মুল্লুক!"—দিলীপের স্বরে কোন রকম মিষ্টতা আর নেই।—"নিয়ম যা হোক করলেই হল!"

কেরানীর মুখের হাসি আর নেই, কণ্ঠে কিন্তু সেই বিনয়ের সুর,—"নিয়ম যাঁরা করেছেন তাঁদেরই জিজ্ঞাসা করুন।"

"তাই করব।" বলে দিলীপ সবেগে সেখান থেকে খোদ চৌধুরী সাহেবের ঘরের দিকেই যায়।

চৌধুরী সাহেবের ঘরে ঢুকে কিন্তু সে অবাক। ঘরে কেউ নেই।

দিলীপ অপেক্ষা করবে না বেরিয়ে যাবে ভেবে ইতস্তত: করছে এমন সময় পেছনের দেয়ালের একটা পাশ-দরজা সরিয়ে একটা ফাইল হাতে চৌধুরী সাহেব বেরিয়ে আসেন।

পেছনে যে একটা গুপ্তঘর থাকতে পারে পাশ-দরজার কায়দায় তা বোঝাই যায় না।

দিলীপ এক মুহূর্তের জন্যে বুঝি একটু অপ্রস্তুত হয়ে পড়ে। চৌধুরী সাহেবও তাই। তাঁর মুখে একটু ভ্রূকুটি বুঝি গোপন থাকে না।

কিন্তু চৌধুরী সাহেবই তারপর প্রথম সামলে নিয়ে পাশ-দরজাটা ঠেলে বন্ধ করে মৃদু হেসে এগিয়ে আসেন।

—"আসুন দিলীপবাবু! আমার কাছে যখন এসেছেন, তখন নিশ্চয় নতুন কিছু আবিষ্কার করেছেন এর মধ্যে!"

"যা করেছি তাতে আমাকে চাকরিতে না রাখাই আপনার উচিত।" —দিলীপের মুখে হাসি থাকলেও কথাগুলোতে রূঢ়তারই আভাস।

চৌধুরী সাহেবের কিন্তু ভাবান্তর নেই। তেমনি হেসে বললেন,— "সব উচিত কাজই কি করি। আমায় এত অসাধারণ ভাবছেন কেন?"

"অসাধারণ না হলেও, অদ্ভুত আপনাকে সত্যিই মনে হয়!"— দিলীপের দৃষ্টি সোজা চৌধুরী সাহেবের চোখের উপর নিবদ্ধ।

"তাই নাকি!"—চৌধুরী সাহেব একটু বিস্ময়ের ভান করেন— "কেন বলুন তো?"

"তা না হলে, আমার মত বেয়াড়া লোককে আপনি কেন সহ্য করেন!" দিলীপ কঠিন স্বরেই বলে যায়,—"জ্বালা হিসেবে আমি অবশ্য সামান্যই! কিন্তু সামান্য একটু নুনের ছিটেও কি আপনার মত লোক সাধ করে সয়?"

"সয় দিলীপবাবু!" চৌধুরী সাহেব একটু গাঢ় স্বরেই বলেন,— "হয়ত কাটা ঘা কোথায় আছে তা চেনবার জন্যেই সয়। কিন্তু আজ কোন্ ঘা-টা দেখাতে এসেছেন!"

উচ্ছেদের নোটিশটা চৌধুরী সাহেবের টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে দিলীপ বলে—“এইটে।”

চৌধুরী সাহেব নোটিশটা তুলে নিয়ে ভুরু কুঁচকে একবার দেখে বলেন,—“এটা তো বাড়ি ছেড়ে দেওয়ার নোটিশ দেখছি। এর জন্যে তো আলাদা ডিপার্টমেণ্ট আছে। সেখানে যদি—”

“সে ডিপার্টমেণ্ট হয়ে এসেছি এবং জেনেছি যে নিয়মের এখানে নড়চড় হবার জো নেই। আর সে নিয়ম তৈরীর মালিক আপনি!”—দিলীপ এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে যায়।

“মালিক আমি ঠিক নই!”—চৌধুরী সাহেব হাসেন,—“কিন্তু নিয়ম তো কাউকে না কাউকে তৈরী,করতেই হয়। নিয়ম ছাড়া কিছু চলে কি?”

চৌধুরী সাহেবের শেষ কথাটায় বিদ্রূপের ক্ষীণ রেশটুকুতেই দিলীপ জ্বলে ওঠে,—“কিন্তু নিয়ম মানে এই অন্যায় জুলুম! তিন মাস ভাড়া দিতে পারে নি এটা মানছি। কিন্তু তার পর বাকি ভাড়া মিটিয়ে দিতে চাইলেও পারবে না? বাড়ি তাকে ছাড়তেই হবে।”

চৌধুরী সাহেবের মুখের হাসি মিলিয়ে যায়। সজোরে ঘণ্টাটা টিপে তিনি গম্ভীর ভাবে বললেন,—“এটা তো শোনাবার মত আবিষ্কার বলেই মনে হচ্ছে।”

ঘণ্টা শুনে বেয়ারা এসে সেলাম দিতে তিনি কর্কশ ভাবেই বলেন,—“বিনোদবাবু।”

বেয়ারা চলে যাবার পর আবার দিলীপের দিকে ফিরে তিনি বলেন,—“আপনার সঙ্গে আমারও কিছু শিক্ষা হওয়া দরকার।”

বিনোদবাবু তখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন। চৌধুরী সাহেব তাঁকে উদ্দেশ করে কঠিন স্বরে জিজ্ঞাসা করেন,—“শুনুন বিনোদবাবু, এই নোটিশটার মানে আমায় বোঝাতে পারেন? তিন মাস ভাড়া বাকি পড়েছে বলে একেবারে ejectment! এই কি আপনাদের নিয়ম?”

বিনোদ কাছে এসে নোটিশটা চৌধুরী সাহেবের হাত থেকে নিয়ে একবার চোখ বুলিয়ে শান্ত স্বরে বলেন,—“আজ্ঞে হ্যাঁ!”

"বাঃ চমৎকার !"—চৌধুরী সাহেবের কণ্ঠ অত্যন্ত তীব্র,—"আর ভাড়া যদি সে মিটিয়ে দেয় এখন ?"

"তার তো উপায় নেই, কণ্ট্র্যাক্ট-ই যে তাই।"—বিনোদবাবু যন্ত্রের মত চলে যান,—"তা ছাড়া নোটিশ যখন বেরিয়ে গেছে।"

"এই তা হলে নিয়ম !"—চৌধুরী সাহেবকে বেশ উষ্ণ মনে হয়—"কিন্তু এরকম অন্যায় নিয়মের মানে কি বলতে পারেন ?"

"আজ্ঞে একটা system না মানলে এত বড় এস্টেটের কাজ তো চলে না।"—বিনোদবাবুর জবাব যেন মুখস্থ।—"এ নিয়ম তো একজন কারুর বেলা নয়, সকলের জন্যেই।"

"কিন্তু এটা তো সকলের case নয় !"—চৌধুরী সাহেব তিক্ত বিদ্রূপের সঙ্গে বলেন,—"আমাদের দিলীপবাবুর এ ব্যাপারে বিশেষ আগ্রহ নিশ্চয় আছে।"

দিলীপকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন তার পর,—"কোনো আত্মীয় বোধহয়, না দিলীপবাবু ?"

"না !"—দিলীপ দৃঢ়ভাবে প্রতিবাদ জানায়,—"আর এঁদের জন্যে বিশেষ অনুগ্রহও আমি চাইতে আসি নি। আপনাদের এই নিয়মই আমি অন্যায় মনে করি।"

"নিশ্চয়।"—চৌধুরী সাহেব তৎক্ষণাৎ সায় দিয়ে বলেন,—"এ নিয়ম চলবে না বিনোদবাবু।"

"আজ্ঞে তা হলে Director's meeting-এ নতুন প্রস্তাব করে ভাড়াটেদের সঙ্গে সমস্ত Contract-এর ফর্ম বদলে ছাপাতে হবে।"—বিনোদবাবু নির্বিকার।

"হ্যাঁ তাও তো বটে !"—চৌধুরী সাহেব ভাবনায় পড়েন,—"তার তো অনেক হাঙ্গামা !"

হঠাৎ একটা নতুন রাস্তা যেন খুঁজে পেয়ে চৌধুরী সাহেব উজ্জ্বল হয়ে ওঠেন,—"আচ্ছা বিনোদবাবু এ সমস্যার একটা মীমাংসা তো অনায়াসে হয়।"

"আজ্ঞে বলুন।"—বিনোদবাবুর মুখে ভাবলেশ নেই।

তখুনি জবাব না দিয়ে চৌধুরী সাহেব ডানদিকের দেওয়াল-জোড়া প্রকাণ্ড প্ল্যানের নক্সাটার দিকে এগিয়ে যান। বিনোদবাবু ও দিলীপকেও সেখানে ইসারায় ডাকেন। তার পর প্ল্যানটার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে জিজ্ঞাসা করেন,—"এটা তো দু নম্বর কলোনি প্রজেক্ট? অধিকাংশ বাড়িই তো তৈরী শেষ?"

বিনোদবাবু বলেন,—"আজ্ঞে হ্যাঁ।"

চৌধুরী সাহেব প্ল্যানের একটা বাড়ি দেখিয়ে বলেন,—"কি, এইটে হলে সব সমস্যা মিটে যায় না?"

বিনোদবাবু যান্ত্রিক কণ্ঠেই মৃদু প্রতিবাদ জানান,—"আজ্ঞে ওটা Executive-দের জন্যে।"

"তা জানি।"—চৌধুরী সাহেব বিরক্ত হয়ে ওঠেন,—"দিলীপবাবু কি Executive নন?"

বিনোদবাবু সসম্ভ্রমে এবার একটু দ্বিধাভরে বললেন,—"আজ্ঞে, উনি তো—মানে—ও সব বাড়ি শুধু ক্লাস টু অফিসারেরাই পাবেন ঠিক হয়েছে।"

"ওঃ!"—চৌধুরী সাহেব যেন ভাবনায় পড়েন,—"ক্লাস টু অফিসারদের জন্যে বরাদ্দ!"

পরমুহূর্তে সমস্যার সমাধান তিনি খুঁজে পান মনে হয়। বলেন,—"সে আমি দেখছি। কি দিলীপবাবু এ বাড়ি কিরকম মনে হচ্ছে?"

প্ল্যানটা খুব বিশদ ভাবেই আঁকা। তা থেকে বাড়িটা কোন্ জাতের অনুমান করতে কষ্ট হয় না। দিলীপ তাই এতক্ষণে একটু হেসে বলে,—"খুব ভালো। কিন্তু বাড়ির দরকার তো আমার নয়।"

চৌধুরী সাহেব একটু ইঙ্গিতপূর্ণ ভাবেই হাসেন যেন। বলেন,—"সেটা আপনি বুঝে দেখুন। দেখুন আপনি এ বাড়ি পেলে সমস্যা মেটে কি না। তবে এ বাড়ি আপনি এখুনি পেতে পারেন এইটুকু জানিয়ে রাখলাম।"

এ পরিণতির জন্যে দিলীপ সত্যিই প্রস্তুত ছিল না। কেমন একটু বিমূঢ়ই সে হয়ে যায়। দ্বিধান্বিতভাবে একটু চুপ করে থেকে বলে,—"আচ্ছা তা হলে ভেবে দেখি। আজ—না কালই আপনাকে জানাব।"

প্রসন্নভাবে চৌধুরী সাহেব বলেন,—"আপনার যখন খুশি জানাবেন।"

দিলীপ নমস্কার করে বিদায় নেবার পর চৌধুরী সাহেব বিনোদের দিকে ফেরেন। চোখে তাঁর কিসের একটা ঝিলিক বোঝা যায় না। কতকটা নিজের মনেই যেন শুধু বলেন.—"মনে হচ্ছে ঠিক ওষুধই এবার পড়েছে।"

বিনোদবাবু শেষ বার বুঝি তাঁর আপত্তিটা জানাবার চেষ্টা করেন,—"কিন্তু এই বাড়ি দেওয়াটা কি ঠিক হবে?"

"ঠিকই হবে বিনোদবাবু!"—চৌধুরী সাহেব অদ্ভুতভাবে হেসে ওঠেন,—"বেয়াড়া ঘোড়াকে লাগাম টেনেই জব্দ করতে হয়। কিন্তু সব লাগাম কি একরকম! মখমলেও লাগাম মোড়া যায়।"

একটু থেমে বেশ কঠিন স্বরে তিনি বলেন,—"তা ছাড়া ভেতরের খবর ও যতটুকু জেনেছে তাতে ওকে আর বাইরে হাতছাড়া করা চলে না।"

প্ল্যানটার দিকে তাকিয়ে চৌধুরী সাহেব শেষ আদেশ দেন,—"আপনি টোপটা ঠিকমত তৈরী রাখবেন।"

উনিশ

বাড়ি তো ছাড়তেই হবে। তাই দিলীপ অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে মায়াকে নতুন একটা বাড়ি দেখাতে এনেছে।

মায়া প্রথম আসতে চায় নি। বলেছে—"আমাদের মত অবস্থার লোকের বাড়ি কি শহরে ছড়াছড়ি যাচ্ছে যে চাইলেই পাবেন। যা পাবেন তার ভাড়া গোনবার ক্ষমতাই আমাদের নেই। শহরে নয় বরং এবার শহর ছাড়িয়ে রেলে আসা যাওয়া যায় এমন কোন দূরের স্টেশনের কাছে দেখতে হবে, আমাদের সাধ্যে যা কুলোয়।"

দিলীপ পেড়াপীড়ি করে বলেছে,—"আহা তবু একবার দেখতে দোষ কি? চলুন না?"

এখন বাড়ি দেখে মায়ার চক্ষুস্থির। মাথা খারাপ না হলে এরকম পরিবেশে এমন বাড়ি তাদের জন্যে দিলীপ দেখাতে আনে!

বাইরে থেকে বাড়িটা দেখিয়ে দিলীপ জিজ্ঞাসা করে,—"কি বাড়িটা পছন্দ হয়?"

"হলেই বা কি আর না হলেই বা কি?"—দিলীপের পাগলামিতে মায়া একটু শুধু হেসে বলে—"পছন্দ তো রাজবাড়িও হতে পারে।"

"পাগল!" দিলীপ তৎক্ষণাৎ প্রতিবাদ জানায়,—"সাধ করে কেউ রাজবাড়ি পছন্দ করে? বাড়ি হবে প্রাণের বন্ধুর মত। নিশ্চিন্ত নির্ভরের মত থাকবে কিন্তু রাত দিন সাড়া দেবে না। তার বদলে খানসামা বেয়ারা পাইক বরকন্দাজ হয়ে সে বাড়ি যদি সব সময়ে সেলাম ঠোকে তাহলে সেখানে থাকা যায়?"

"সেখানেও যেমন যায় না এখানেও তাই।" মায়া দিলীপের উৎসাহে প্রশ্রয় দেয় না,—"চলুন, চলুন। কোথায় কি বাড়ি আছে বলছিলেন দেখাবেন চলুন। এ বাড়ি এতক্ষণ ধরে দেখাও শাস্তি।"

"শাস্তি!"—দিলীপ যেন অবাক!

"শাস্তি ছাড়া কি ! মিছি মিছি মন খারাপ করা ছাড়া তো কিছু নয় !"

"আহা, মন খারাপই একটু না হয় করলাম।"—দিলীপ বোঝাবার চেষ্টা করে,—"মনটা যে মরে যায় নি মিছিমিছি খারাপ করেও তা মাঝে মাঝে পরখ করতে হয়।"

দিলীপ এবার বাড়িটার দিকে এগোয়।

অনিচ্ছায় বাধ্য হয়েই তার সঙ্গে যেতে যেতে মায়া বলে—"কেন যে সময় নষ্ট করছেন জানি না !"

দিলীপ কোন উত্তর না দিয়ে বাইরের ঘেরা দেওয়ালের কাঠের গেটটা খুলে ধরে বলে—"এই দেখুন কাঠের গেটটা খুললেই ছোট্ট একটু বাগান।"

মায়া একেবারে হতভম্ব। নতুন বাড়ি এখনো একেবারে সম্পূর্ণ হয় নি। বিশেষ করে কাঠের গেট পেরিয়ে ছোট মাটির উঠোনটায় এবড়ো খেবড়ো ঘাসের চাপড়া ছাড়া কিছু নেই।

অবাক হয়েই সে তাই জিজ্ঞাসা করে—"বাগান কোথায় ? শুধু তো দেখছি ঘাসের চাপড়া !"

"ওই ঘাসের চাপড়া কি আর থাকবে ?"—দিলীপ হেসে ওঠে। তার পর উঠানের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলে,—"এইখানে কটা সূর্যমুখী, ওখানে একটা হাস্নাহানার ঝাড়, আর ওদিকে একটা শিউলি।"

মায়া এতক্ষণে দিলীপের কৌতুকের ধরনটা বুঝেছে। নিজেও তাতে যোগ দিয়ে হেসে বলে,—"বাগানটা কিন্তু কি রকম হল ?"

"একি আর সাজানো লোকদেখানো বাগান !"—দিলীপ ব্যাখ্যা করে দেয়,—"এ বাগান খেয়াল-খুশির, তাই বাঁধা নিয়ম মানে না। আচ্ছা বাগান থেকে এবার বাড়ির ভেতর।"

দিলীপের সঙ্গে মায়াকেও বাড়ির ভেতর ঢুকতে হয় কৌতুকভরে।

বাইরে মেঠো উঠোন থেকে কয়েকটা ধাপ উঠে একটা বারান্দা ঘেরা প্রশস্ত ঘর। নতুন তৈরী মেঝে দেওয়াল ঝক্‌ঝক্ করছে।

"ঘরটা চমৎকার নয় ?"—দিলীপ জিজ্ঞাসা করে।

"খুব চমৎকার!"—মায়া সায় দিয়ে বলে,—"এটা তো বাইরের ঘর।"

"বাইরের ঘর!"—দিলীপ যেন ক্ষুণ্ণ।—"পাগল!" এরকম একটা ঘর বাইরের লোকজনের জন্যে নষ্ট করতে আছে। এরকম একটা ঘরে বসতে পেলে বাইরের লোক তো আর উঠতেই চাইবে না।"

হাসি চেপে দিলীপের কাল্পনিক মজার খেলায় উৎসাহ দিয়েই মায়া কপট বিস্ময় প্রকাশ করে,—"ও আপনি বাইরের লোকজনকে বেশী আমল দিতে চান না।"

"দেব কখন? সময় কোথায়?" দিলীপ রীতিমত গম্ভীর।

দিলীপ কল্পনায় ফাঁকা ঘরটা সাজিয়ে ফেলে এবার।

"এই জানালার এধারে একটা বড় টেবিল। তার পাশে একটা বইএর আলমারি। টেবিলের ওপর একটা মোরাদাবাদী পেতলের ফুলদানিতে রজনীগন্ধা। আর এখানে একটা টিপয়ের ওপর একটা—একটা..."

"ব্রঞ্জের মূর্তি।"—মায়াই কথা যুগিয়ে দিয়ে কল্পনাটা টেনে নিয়ে চলে,—"তার ওপরে দেওয়ালে একটা বাঁধানো ছবি, অবন ঠাকুর কি নন্দলাল বোসের। জানালায় দরজায় হাতের এমব্রয়ডারী করা পর্দা হাওয়ায় দুলছে। ওধারে—"

"ধীরে একটু ধীরে"—দিলীপ বাধা দিলে—"মাথা গুলিয়ে আসল কথাটা ভুলে যাবো।"

"আসল কথাটা কি?"—মায়া কৌতূহলী।

"আমি এইখানে বসে কাজ করছি,"—দিলীপ কল্পনার রাশ ছেড়ে দেয়,—"আর মাঝে মাঝে ওই দরজার ওধারে রান্নাঘরের দিকে চেয়ে চেঁচাচ্ছি, কই কফি হল?"

মায়ার মুখটা একটু বুঝি রাঙা হয়ে ওঠে, কিন্তু হাল্কা হাসিতে সে সলজ্জ অস্বস্তিটা চাপা দিয়ে বলে, —"আর ওখান থেকে আওয়াজ আসে,—কফি হবে কিসে? চিনি বাড়ন্ত।"

দুজনেই এবার হাসতে থাকে।

মায়াই প্রথম হাসি থামিয়ে গম্ভীর হয়ে বলে,—"যাক্ ঢের পাগলামি হয়েছে। এখন চলুন। কাদের খালি বাড়িতে ঢুকেছেন, এখুনি তাড়া খেতে হবে হয়ত।"

মায়া যাবার জন্যে পা বাড়াবার আগেই দিলীপ বাধা দিয়ে গম্ভীর ভাবেই বলে,—"আচ্ছা সত্যিই যদি এ বাড়িটা পাওয়া যায়।"

"তা হলে বুঝব আকাশ কুসুম সত্যি সত্যি কখনো ফোটে।"—মায়ার মুখের হাসিটা এবার বুঝি করুণ।

"তা হলে বলি সত্যি ফুটেছে!"—দিলীপ উজ্জ্বল মুখে বলে—"এ বাড়ি পেয়েই গেছি মনে করতে পারেন। একটু শুধু উপদ্রব সহ্য করতে হবে।"

সমস্ত ব্যাপারটা এখনো তামাসা মনে করেই মায়া কৌতুকের স্বরে জিজ্ঞাসা করে,—"উপদ্রবটা আবার কি?"

"উপদ্রব আমি স্বয়ং।" মায়ার দিকে কেমন একটু অদ্ভুত ভাবে চেয়ে দিলীপ যেন মিনতি করে, —"এ বাড়িতে আমার একটু জায়গা দিতে হবে।"

মায়ার কাছে ব্যাপারটা এখনো ছেলেমানুষী কল্পনা। সে উদার ভাবেই সম্মতি জানিয়ে বলে,—"তা না হয় দেওয়া যাবে। এমন একটা বাসার জন্যে ওটুকু উপদ্রব না হয় সইলাম।"

"দেখুন, ঠিক তো? শেষে আবার পিছিয়ে যাবেন না। আমায় থাকতে দেওয়ার ঝামেলা আছে।"

"যেমন?" মায়ার চোখে দুষ্টুমির হাসি।

"তা ঠিক আমি নিজেই কি জানি এখনো!" দিলীপ যেন ভেবে চিন্তে বলে,—"একটু আদর আস্কারা পেলেই হয়ত আবদার বাড়তে থাকবে। ঘরে থাকতে পেয়ে ঘরনী-ই চেয়ে বসব।"

নেহাৎ ঠাট্টার ছলে বলা কথা। কিন্তু একজন বলে, আর একজন শুনে দুজনেই কেমন খানিকক্ষণ অপ্রস্তুত হয়ে যায়।

পরিহাসের সুরটাই নিরাপদ বলে মায়াই তারপর হেসে উঠে বলে, —"তাহলে আস্কারা দেওয়া সম্বন্ধে সাবধান থাকতে হবে।"

"তাই থাকবেন!" দিলীপও হাসে কিন্তু হাসিটা একটু বুঝি আলাদা জাতের। পরের কথাগুলো কৌতুকের ভঙ্গিতে বললেও স্বরটা কেমন গাঢ়—"তবু একদিন আনমনা হয়ে ওই বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াতে পারেন—"

দিলীপের মুখের দিকে চেয়ে কৌতুকের ভানটাই রাখবার চেষ্টা করে মায়া বলে,—"দাঁড়ালাম, তারপর—"

"তারপর?"—দিলীপ মায়ার দিকে একবার চোখটা ফিরিয়ে নিয়ে একেবারে অন্য সুরে গাঢ় গম্ভীর স্বরে বলে,—"তারপর ঐ দূর-দিগন্তের দিকে চেয়ে মনে হতে পারে, কোন মানে হয় না হৃদয়ের চারিদিকে এমন বেড়া দিয়ে রাখবার।"

"তাই মনে হল। তারপর?"—মায়ার কণ্ঠও কি একটু ধরা?

দিলীপ একবার একদৃষ্টে মায়ার দিকে তাকিয়ে গাঢ় গভীর স্বরে বলে,—"তারপর কাছে এসে যে দাঁড়িয়েছে তার হাতে ধীরে ধীরে একটা হাত হয়ত রাখা যায়।"

পরস্পরের দিকে তাকিয়ে দুজনেই খানিক নীরব নিস্পন্দ হয়ে থাকে, তারপর সত্যিই মায়া হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে প্রায় অস্ফুট স্বরে বলে,— "তাই রাখলাম।"

হাতটা কতক্ষণ ধরা থাকত বলা যায় না। হঠাৎ একটা বিশ্রী আওয়াজে তাদের চমক ভাঙে। খালি বাড়ির বারান্দার রেলিঙে বসে দুটো শালিক উচ্চকণ্ঠে কিচির মিচির করছে, যেন তাদেরই ভৎর্সনা করছে!

দুজনেই হেসে উঠে পরস্পারের হাত ছেড়ে দেয়। দিলীপ তার পর বলে,—"এবাড়িই তাহলে আমাদের হোক মায়া।"

মায়া আর হাসে না। একটু ব্যথিত স্বরেই বলে,—"ঠাট্টাটা একটু নিষ্ঠুর হয়ে যাচ্ছে না?"

"না মায়া, ঠাট্টা নয়।" দিলীপ শান্ত স্বরে বলে,—"সত্যিই চৌধুরী সমবায় থেকে এবাড়ি আমায় দিচ্ছে। মনে হচ্ছে চাকরিরও একটা উন্নতি হচ্ছে সেই সঙ্গে।"

একটু হেসে কি একটা দ্বিধা যেন জয় করে দিলীপ বলে,—"তোমার —তোমার যদি আপত্তি না থাকে তাহলে এ বাড়ি নিতে পারি।"

"নিতে তুমি সত্যি চাও?" প্রশ্নটা করতে মায়ার বেশ দেরী হয়। এটা যেন প্রশ্নও নয় ঠিক, বিস্মিত বিহ্বল মনের একটা অর্ধস্ফুট ধ্বনি।

দিলীপ উত্তর না দিয়ে মায়ার হাতটা আর একবার ধরে শুধু একটু হাসে।

কুড়ি

মায়াকে বাড়ি পৌঁছে দিয়ে দিলীপ যখন চৌধুরী সাহেবের অফিসের দিকে রওনা হয় তখন তার সমস্ত মন যেন টান করে বাঁধা কোন তারের বাজনা। সামান্য একটু হাওয়ার ছোঁয়াতেই তা কেঁপে উঠে ঝঙ্কার তোলে।

রাস্তা ঘাট মানুষ জন সবই যেন নতুন। আকাশ পৃথিবী সব কিছুর ওপর যেন রঙের নতুন পোঁচ! তার মনের একদিক বলে, এরই নাম সস্তা ভাবালুতা। একে প্রশ্রয় যে দেয় সে মূঢ় কিন্তু মনের আরেক দিক বলে মূঢ়তায় যদি এত বিস্ময় আর আনন্দ তা হলে কাজ কি বিচক্ষণ বুদ্ধিমান হয়ে।

দিলীপ চৌধুরী সমবায়ের কারখানায় পৌঁছোবার আগেই কেষ্টকে চৌধুরী সাহেবের খাস গাড়ি নিয়ে অফিসের গাড়ি-বারান্দার নিচে ঢুকতে দেখা যায়। তার গাড়ির আরোহীদের দেখে একটু অবাক হবারই কথা। স্বয়ং চৌধুরী সাহেব তো ননই, তাঁর ধারে কাছে থাকবার মত কেউও নয়। জীর্ণ মলিন থান পরা কঙ্কালসার এক বৃদ্ধা আর ছেঁড়া ময়লা ফ্রক পরা হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা বছর ছয়েকের একটি ছোট্ট মেয়ে!

গাড়ি-বারান্দায় দাশুর দল যেন কেষ্টর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। কেষ্ট গাড়ি থামাতেই দাশু এগিয়ে এসে রুক্ষ স্বরে বলে—"এই যে তোমাকেই খুঁজতে যাচ্ছিলাম! গাড়ি আনতে এত দেরী হল যে!"

কেষ্ট নিজে নেমে পেছনের দরজা খুলে বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েটিকে নামাতে নামাতে তাচ্ছিল্য ভরে বলে—"সে কৈফিয়ৎ কি তোমায় দিতে হবে নাকি!"

"মেজাজ যে বড় চড়া দেখছি।"—দাশু মুখ বাঁকিয়ে বলে—"দাওয়াই এখনো পড়ে নি কি না। যাও বিনোদবাবু খুঁজছেন।"

"আমিও তাঁকেই খুঁজছি।"—কঠিন স্বরে জবাব দিয়ে কেষ্ট বৃদ্ধাকে তার পেছনে আসতে বলে।

বৃদ্ধার কিন্তু যাবার উৎসাহ দেখা যায় না। চারিদিকে চেয়ে ভীত কাতর কণ্ঠে তিনি বলেন,—"আমাদের কেন নিয়ে এলে বাবা ? আমি তো আসতে চাই নি !"

"আপনি চলুন না।—আপনার কোন ভয় নেই"—কেষ্ট তাঁকে আশ্বাস দিয়ে এক রকম জোর করেই সঙ্গে নিয়ে যায়।

নিজের গরজে একরকম জোর করে বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েটিকে বিনোদবাবুর কাছে নিয়ে যাবার কারণটা খানিক বাদেই ভাল করে বোঝা যায়।

বিনোদবাবুর সে শান্ত অমায়িক চেহারাই আর নেই।

তিনিও এখন ক্ষুদে চৌধুরী সাহেব হয়ে কেষ্টকে ধমকাচ্ছেন শোনা যায়।

"বুঝলাম ছাদের টালি খসে পড়ে হাত ভেঙেছে! তার জন্যে হাসপাতাল থেকে আবার থানায় নিয়ে গেছ ! আবার সেখান থেকে গাড়ি করে নিয়ে এসেছ এখানে ? তুমি এ গাড়ির ড্রাইভার না মালিক ! এ কাজ কি তোমার ?"

কেষ্ট কঠিন স্বরে জবাব দিলে—'হ্যাঁ, আমার। মানুষ হলে সামনে যে থাকবে এ কাজ তারই। আর চৌধুরী সমবায়ের ড্রাইভার বলেই এটা আমার দায় বলে মনে করেছি। এনেছি তো শুধু এই দুজনকে। হাসপাতালে আরেকজনকে যে রেখে আসতে হয়েছে সে খবর আশা করি জানেন।"

"হ্যাঁ জানি।"—বিনোদ বাবু গর্জন করে উঠলেন,—"কিন্তু থানায় নিয়ে গিয়েছিলে কেন ? কে হুকুম দিয়েছিল ?"

"কেউ দেয় নি !"—কেষ্টর গলাতেও কঠিন বিদ্রূপ—"আপনাদের হুকুম তামিলের কেনা গোলাম শুধু আমি নই বোধ হয়।"

দাশুর দলও ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে।

"কেন ফজুল বাত করছেন বিনোদবাবু!"—দাশু ঠোঁট বেঁকিয়ে বললে—"ছেড়ে দিন আমার হাতে। ঘাড়ে দুটো রদ্দা দিলেই হুকুম বুঝবে।"

বৃদ্ধা এসব কথা-বার্তা শুনে আর দাশুদের দলের চেহারা ভাব-ভঙ্গী দেখে ভয়ে একেবারে শুকিয়ে গেছেন তখন। কাকুতি মিনতি করে প্রায় কেঁদে উঠলেন—"আমাদের বাড়ি পাঠিয়ে দাও বাবা। আমাদের ভাগ্যে যা হবার হয়েছে।"

"না, দাঁড়ান।"—কেষ্ট তার সঙ্কল্পে অটল।

"কি! ধরে-বেঁধে নালিশ করাবে নাকি?"—দাশুর দল গলা ছেড়ে হেসে উঠল।

দিলীপ তখন এসে পোঁছেছে। অফিস-ঘরের ভেতর দিয়ে চৌধুরী সাহেবের খাস কামরার দিকে যেতে যেতে শেষ কথাগুলোই তার কানে গেল।

ভিড়ের মাঝখানে কেষ্টকে দেখে সে দাঁড়িয়ে পড়তেই দাশু ও তার দল সসম্ভ্রমে মাথায় হাত ঠেকাল।

—"সেলাম—দিলীপবাবু!"

সকলের দিকে একবার চোখ বুলিয়ে একটু অবাক হয়েই দিলীপ জিজ্ঞাসা করলে—"কি হয়েছে কি?"

প্রশ্নটা কেষ্টকেই করেছিল, জবাব দিল দাশু নিজে।

—"হবে আবার কি স্যার। এই কেষ্টো ড্রাইভারের একটু চুলবুলুনি বেড়েছে। মক্কেল বলছে নালিশ নেই তবু উনি সাউখুড়ি করে লড়তে এসেছেন।"

দিলীপ কেষ্টকেই সরাসরি এবার জিজ্ঞাসা করল—"কি ব্যাপারটা শুনি কেষ্ট?"

"ব্যাপার চৌধুরী কোম্পানীর এক বাড়ি," তিক্ত স্বরে কেষ্ট বুঝিয়ে দিলে।—"কি বাড়ি বুঝতেই পারছ! ভাঙা ছাদের টালি খসে এই

মেয়েটির হাত ভেঙেছে আর ওর ছোট ভাইয়ের মাথা। ওই রাস্তা দিয়েই আসছিলাম, তাই গাড়িতে হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে—সেখান থেকে থানায় একটা ডায়েরী করিয়ে এসেছি এই আমার অপরাধ!"

"আপনিই শুনুন দিলীপবাবু!"—বিনোদবাবু দিলীপকেই সাক্ষী মানলেন,—"থানায় ডায়েরী করিয়ে এসেছে চৌধুরী কোম্পানীর নিমক-খোর ড্রাইভার।"

দিলীপ বিনোদবাবুকে কোন জবাব না দিয়ে বৃদ্ধার দিকেই ফিরে এবার বলল,—"আপনারা আমার সঙ্গে আসুন তো!"

"না বাবা আমাদের বাড়ি পৌঁছে দাও।"—বৃদ্ধার ভীত কণ্ঠে সেই এক কথা।

দিলীপ কিন্তু সে আপত্তি না শুনেই তাঁদের নিয়ে চলল চৌধুরী সাহেবের ঘরের দিকে।

চৌধুরী সাহেব ধৈর্য ধরে সব কথাই শুনলেন, তারপর বিনোদ-বাবুকেই ভৎর্সনা করে বললেন,—"না বিনোদবাবু, এটা আপনারই অন্যায়। থানায় ডায়েরী করাতে দোষ কি হয়েছে? করাই তো উচিত—"

বৃদ্ধার দিকে ফিরে তার পর তিনি আশ্বাস দিলেন,—"আপনার কোন ভাবনা নেই বুড়ি মা। ঐ ব্যাপারের যা উচিত ব্যবস্থা আমি এখুনি করছি। আপনার যা কিছু নালিশ আছে নির্ভয়ে আমার কাছে জানিয়ে যান।"

এ আশ্বাসেও বৃদ্ধার কাছে কোন নালিশ শোনা গেল না। কাতরভাবে সেই এক কথাই তিনি বললেন,—"আমার কোন নালিশ নেই বাবা। আমরা বাড়ি যেতে চাই! ভাগ্যে আমাদের এই শাস্তি ছিল মানুষ কি করবে!"

"যা করবার মানুষই করেছে, ভাগ্যে নয়!"—দিলীপ রাগ চাপতে না পেরে প্রায় ধমক দিয়ে উঠল,—"যে বাড়িতে থাকেন তার অবস্থা আপনি বলুন..."

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, বলুন না।"—দিলীপকে বাধা দিয়ে মধুর ভাবে হেসে চৌধুরী সাহেব বললেন,—"তবে আপনি বলছেন আমার কোন নালিশ নেই।"

"না বাবা কিছু নেই।"—বৃদ্ধা সকলের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে ব্যাকুল,—"ওই ড্রাইভার বাবু আমাদের অনেক উপকার করেছেন। উনি না পেড়াপেড়ি করলে এখানে আসতাম না। আমাদের বাড়ি যেতে দাও বাবা!"

"হ্যাঁ হ্যাঁ এখুনি আপনাদের বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছি!"—চৌধুরী সাহেব নিজেই ব্যস্ত হয়ে বিনোদবাবুকে আদেশ দিলেন—"এঁদের গাড়ির ব্যবস্থা করে দিন বিনোদবাবু। আর তার আগে ওঁর যে কোন নালিশ নেই টিপ সই দিয়ে সেটা লিখিয়েও নেবেন।"

"তার মানে?"—দিলীপ জ্বলে উঠল,—"অসহায় বুড়ো মানুষ ভয় পেয়েছেন বলে তাকে দিয়ে ওই কথা লিখিয়ে নেবেন।"

"মিছামিছি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন?"—চৌধুরী সাহেব স্নিগ্ধ স্বরে দিলীপকে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—"ও লেখানোটুকু তো শুধু কাগজে কলমে। নইলে যা করবার সবই করা হবে। যান বিনোদবাবু নিয়ে যান।"

বিনোদবাবু বৃদ্ধা ও ছোট মেয়েটিকে নিয়ে বেরিয়ে যাবার পর তিক্ত হতাশার স্বরে চৌধুরী সাহেবের দিকে ফিরে দিলীপ বললে,—"চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজের কেন এত উন্নতি তা এখন বুঝতে পারছি।"

"বুঝবেন দিলীপবাবু, আরো কিছু দিন থাকলে আরো বুঝবেন।"—চৌধুরী সাহেবের হাসিতে যেন স্নেহই ঝরে পড়ছে মনে হল।

টেবিলের ড্রয়ার খুলে কি কাগজ বার করে তিনি এবার জিজ্ঞাসা করলেন—"তা ও বাড়ি সম্বন্ধে কি ঠিক করলেন?"

"ঠিক আর কি করব!"—দিলীপের গলাটা জ্বালিয়ে যেন জবাবটা বার হ'ল—"আপনি দিলে নেব। অত বড় লোভ কি জয় করতে পারি!"

"জয় করবেনই বা কেন?"—চৌধুরী সাহেব বেশ জোরেই হেসে উঠলেন,—"সবাই আমরা মুনি ঋষি হলে বিধাতার দুনিয়াই যে অচল হবে! হ্যাঁ ওবাড়ি পাওয়ার সামান্য যে বাধাটুকু ছিল তাও আর নেই।"

হাতের কাগজটা দিলীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব বললেন,—"এই নিন আপনার নতুন appointment letter, আপনি এখন চৌধুরী কোম্পানীর বড় অফিসার।"

নির্বাক নিস্পন্দ দিলীপের হাতটা ধরে দুবার নেড়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব খুশিতে গদ গদ কণ্ঠে বললেন,—"আমিই আপনাকে প্রথম অভিনন্দন জানাচ্ছি।"

এরকম দামী অভিনন্দনের পর দিলীপের পক্ষে একটু বিচলিত হওয়া বোধহয় স্বাভাবিক।

অন্ততঃ সেই দিনই ঘণ্টা কয়েক পরে তাকে মায়াদের বাড়িতে অস্থির ভাবে পায়চারী করতে দেখা গেল।

নীরব পদচারণা নয়, পদচারণার সঙ্গে মুখের তোড়ও চলেছে সমান বেগে।

"কই অভিনন্দন কই? Congratulations, উচ্ছ্বাস, কিছুই তো নেই! এত বড় একটা কাণ্ড করে এলাম, আর তোমার একটু সাড়াও নেই তাতে? একটু মৌখিক আনন্দও জানাতে পার না!"

কথাগুলো যে মায়াকে উদ্দেশ করেই বলা হচ্ছে তা জানান বাহুল্য। মায়া বারান্দায় একটি টুলে বসে একটু চিন্তিত মুখেই দিলীপের কথা শুনছিল। দিলীপের শেষ কথায় ম্লান একটু হেসে বললে,—"আনন্দ জানাতে নিশ্চয় পারি; কিন্তু আপনিও তো একটু বসতে পারেন। অত অস্থির কেন?"

"অস্থির কেন?"—দিলীপ এতক্ষণে একবার দাঁড়াল স্থির হয়ে! তার পর মায়ার কাছে এগিয়ে তিক্ত তীব্র গলায় বললে,—"বাঃ অস্থির হব না! এক নিমেষে ভাগ্যের চাকা কি ভাবে ঘুরে গেছে ভাবো দিকি। রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াত, যেদিন যা জোটে তাই নিয়ে খুশী থাকত, সেই বেকার বাউণ্ডুলে দিলীপ সামন্ত নয়; চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজের ক্লাস টু অফিসার! একটা কেওকেটা লোক! কি তার প্রতিপত্তি! তার ওপর ছবির মত একটা বাড়ি, সারাদিন চৌধুরীর অফিসে মাতব্বরি করে সেখানে এসে আরামে গা ছেড়ে দিয়ে যা ইচ্ছে স্বপ্ন দেখা যায়! অস্থির হয়েছি কি সাধে? ব্যাপারটা ভাল করে সামলাতেই এখনো পারছি না যে!"

মায়া উদ্বিগ্ন মুখেই এবার উঠে দাঁড়াল। জোর করে তবু একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, "তাহলে আপনি ততক্ষণ আপনার অস্থিরতা সামলান। আমি একটু চা করে নিয়ে আসি।"

"না না কিছু আনতে হবে না!"—দিলীপ বাধা দিয়ে কি রকম অদ্ভুত ভাবে হেসে উঠল।—"এখন চায়ের চেয়ে আমার কি দরকার জানো? শুধু একজন মুগ্ধ শ্রোতা।"

"তার চেয়ে একজন ডাক্তার হলেই ভালো হত না কি!"—মায়া পরিহাসের সুরটাই গলায় রাখবার চেষ্টা করলে,—"চাকরির উন্নতির সঙ্গে বাড়ি পেয়ে তো মাথা খারাপ হবার যোগাড় দেখছি!"

"ঠিক বলেছ মায়া!" দিলীপের গলা এবার গম্ভীর,—"মাথাটা খারাপ হতে দিলে চলবে না। তবে তার জন্যে ডাক্তার লাগবে না। উপায়টা আমি নিজেই বার করে ফেলেছি। অতি সহজ উপায়। স্রেফ সুবিধামত চোখ বুজে থাকতে শেখা। চোখ আর মুখ দুইই বুজে। ব্যস্, দুনিয়ায় আমার উন্নতি আটকায় কে?"

"সত্যি আপনার হয়েছে কি?"—মায়ার গলার কাতরতা আর লুকোন নয়,—"কি বলছেন, কিছুই ঠিক বুঝতে পারছি না।"

"পারছ না!" দিলীপ আবার তিক্তভাবে একটু হাসল,—"যা বলছি তার মানে হয়ত সত্যিই কিছু নেই। জীবনে পয়সা কড়ি সম্মান প্রতিপত্তি যদি হয় সব কিছুর অত মানে খোঁজার দরকার কি? চৌধুরীর কারবারে কার বাড়িতে টালি ধ্বসে পড়ে কোন্ ছেলে-মেয়েকে হাসপাতালে যেতে হয়েছে আমার জানবার কি দায়? আমার বাড়ি তো স্বপ্নের মত সুন্দর। সেখানে বারান্দায় বসে আমরা পূর্ণিমা-চাঁদ দেখব হাত ধরাধরি করে। কোথায় কোন্ তেলের টিনে কিসের ভেজাল, আটা-ময়দায় পাথরের গুঁড়ো, চোখ বুজে থাকলে তো আর দেখতে হবে না। আমি দস্তুর মত মোটা মাইনের অফিসার। চোখ খুলে করে রাখবার দায় নেই। আমার অত ভাববার দরকার কি?"

মায়া এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে শুধু দিলীপকে লক্ষ্য করছিল।

এবার ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে দিলীপের হাতে তার হাতটা রাখল। তার পর স্নিগ্ধ অথচ দৃঢ়স্বরে বললে,—"শোন। এখুনি তুমি যাও চৌধুরী সাহেবের অফিসে।"

"তা তো যেতেই হবে?"—দিলীপ নিজেকেই যেন বিদ্রূপ করার সুরে বললে,—"শুধু সুখবরটা তোমায় জানিয়ে যেতে এসেছিলাম।"

"বেশ করেছ!"—মায়ার স্বর আগের মতই স্নিগ্ধ,—"কিন্তু এর চেয়ে বড় সুখবরের জন্যে আমি অপেক্ষা করব। তুমি চাকরি ছেড়ে দিয়ে এসো।"

"ছেড়ে দেব চাকরি!" দিলীপ কি সত্যিই বিস্মিত? অন্ততঃ গলার স্বরের জ্বালাটুকু না থাকলে মায়ার মুখের দিকে চেয়ে সে যেন নিজের ওকালতি করছে ভাবা যেত। সেই জ্বালা নিয়েই সে বললে,—"তুমি পরিহাস করছ মনে হচ্ছে! যা কিছু মানুষ চায় সব হাতের মুঠোয় পেয়েও হেলায় ছুঁড়ে দেব তুমি বলতে চাও! এতদিনের সব স্বপ্ন ব্যর্থ করে দেব নিজেই?"

"তাই দিতে হবে!" মায়ার কণ্ঠস্বরে দৃঢ়তার সঙ্গে যেন কান্না মেশানো।

দিলীপের চোখের দৃষ্টি ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল। মায়াকে যেন নতুন করে চিনছে এমনি ভাবে কয়েক মুহূর্ত চেয়ে থেকে গাঢ়স্বরে সে সে বললে,—"এই তোমার প্রাণের কথা মায়া?"

"হ্যাঁ, এই আমার প্রাণের কথা!" মায়ার কণ্ঠ নিঃসংশয়,—"সব কিছু পাবার লোভেও পরস্পরের নোংরা হাত আমরা ধরতে পারব না।"

"আজ তোমার কাছে কি যে পেলাম মায়া তা মুখে বোঝাতে পারব না। এই সাহসটুকুই তোমার কাছে চেয়েছিলাম। আবার দুর্বল হয়ে পড়বার আগেই তাই যাচ্ছি।"

ছুটি পাওয়া পাঠশালার ছেলের মত সবেগে বেরিয়ে যেতে গিয়ে দিলীপ আবার থামল। তার পর ধীরে ধীরে মায়ার কাছে এগিয়ে এসে খানিক চুপ করে থেকে করুণ ভাবে একটু হেসে বললে,—"কিন্তু

একটা সাধ আর পূর্ণ হল না মায়া। ওই স্বপ্নের বাড়ির বারান্দায় তোমার সঙ্গে বসে পূর্ণিমার চাঁদ দেখা।"

মায়া নীরব। তার চোখের ভাষা বোঝবার উপায় নেই।

দিলীপ নিজেই ব্যঙ্গ ভরে সজোরে হেসে উঠল এবার,—"আমাদের মত মানুষেরও এসব কবিত্বের শখ হয়!"

আর সে সেখানে দাঁড়াল না।

চৌধুরী কোম্পানীর গেটে বড় বড় লরীর ভীড়। কোনটা আটার কোনটা তেলের কোনটা কয়লার।

সেগুলোর পাশ কাটিয়ে যেতে দিলীপের মনে হয় একটা বিরাট জটিল যন্ত্রবাহু যেন এখনো তাকে মুঠোর মধ্যে ধরবার জন্যে উন্মুখ হয়ে আছে।

কারখানার এলাকা ছাড়িয়ে অফিস-বাড়িতে ঢোকবার সময় পাশে গাড়ি রাখবার গ্যারেজগুলোর দিক থেকে হঠাৎ কেষ্টর তীক্ষ্ণ ক্রুদ্ধ কণ্ঠ শুনে সে থমকে দাঁড়ায়।

কেষ্ট তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বলছে,—"রাস্তা ছাড়ো। ভালো কথায় বলছি।"

সঙ্গে সঙ্গে দাশুর বিষ মাখানো বিদ্রূপের স্বর শোনা যায়,—"আরে রোখো ইয়ার! ঘর যাবার এত তাড়া কিসের? নোকরি না হয় খতম হয়েছে। আমরা সব পুরান দোস্ত! এতো জলদি কি আমাদের মায়া কাটাতে আছে।"

দিলীপ আর এক মুহূর্ত দেরী না করে সেদিকে এগিয়ে যায়। গ্যারেজের ওধারে গিয়ে যখন পৌঁছায় তখন কেষ্ট আগুন হয়ে বলছে—"দলের মধ্যে একা পেয়ে বড় সাহস না! কি করতে চাও কি?"

কেষ্টকে ঘিরে দাশুর দলের সব কটি গুণ্ডা দাঁড়িয়ে। দাশু কেষ্টর আরো একটু সামনে এগিয়ে এসে কুৎসিত ভাবে হেসে বলে,—"আরে কিছু নয় ইয়ার। খালি দুটো বাৎচিৎ—"

দিলীপকে সেই মুহূর্তে দলের একজন দেখতে পায়। কনুইএর ঠেলা

দিয়ে ইশারা করে দিতেই দাশু একেবারে অন্য মানুষ হয়ে সসম্ভ্রমে হাত তুলে জানায়—"সেলাম স্যার!"

অন্যদের হাতও তখন সেলামের ভঙ্গীতে ওপরে উঠেছে।

দিলীপ তাদের দিকে চেয়ে তীক্ষ্ণ স্বরে জিজ্ঞাসা করে—"কি ব্যাপার কি!"

"কিছু না স্যার!" দাশুই জবাব দেয়।—"কেষ্টবাবু নোকরী ছেড়ে চলে যাচ্ছে। কিছু বখশিশ ভি তাই দিয়ে দেব ভাবছি।"

তাদের মুখচোখের ভঙ্গীতে বখশিশের স্বরূপটা দিলীপের অগোচর থাকে না। তবু মুখে ভাবান্তর না দেখিয়ে সে বলে,—"ওঃ। আচ্ছা আগে চৌধুরী সাহেবের সঙ্গে দেখা করে আসি। এসো কেষ্ট!"

"ওখানে গিয়ে কোন লাভ নেই দিলীপ।"—কেষ্টই আপত্তি জানায়,—"তুমি যেতে হয় যাও।"

দিলীপ কিন্তু কেষ্টকে ছাড়ে না। এক রকম জোর করেই তাকে সঙ্গে নিয়ে যেতে যেতে বলে,—"না, তোমাকেও যেতে হবে।"

স্বরটা প্রায় আদেশের।

দাশুর দল বাধা দেয় না, কিন্তু দিলীপকে দাশু এবার যা বলে তাতে ঠিক সম্ভ্রমের সুর আর নেই।

দাশু চিবিয়ে চিবিয়ে বলে,—"নিয়ে যাচ্ছেন যান! আপনি বড়া আফিসার, আপনার উপর তো বাৎ চলে না। তবে কেষ্টকে ছেড়ে গেলেই ভাল করতেন।'

দিলীপ মুখ না ফিরিয়েই চৌধুরীর খাস কামরার দিকে কেষ্টকে নিয়ে যায়।

খাস কামরায় চৌধুরী সাহেব তখন বিনোদবাবুকে কি আদেশ দিচ্ছেন। কোন একটা গোলমেলে ব্যাপার নিশ্চয়ই। কারণ দিলীপকে কেষ্টর সঙ্গে ঢুকতে দেখেই চৌধুরী সাহেবের কথা বন্ধ হয়ে যায়।

আসল কথা তখন বলা হয়ে গেছে বোধহয়। কারণ বিনোদবাবুও

আর সেখানে থাকেন না। 'যে আজ্ঞে' বলে দিলীপ ও কেষ্টর দিকে একবার ভ্রুকুঞ্চিত করে চেয়ে তিনি বেরিয়ে যান।

চৌধুরী সাহেব প্রসন্ন মুখে 'আসুন দিলীপবাবু' বলে দিলীপকে অভ্যর্থনা করতে গিয়ে থামেন। কেষ্টর দিকে চোখ পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মুখ কঠিন হয়ে ওঠে।

কেষ্টকে উদ্দেশ্য করেই বলেন—"তুমি! তুমি আবার কি করতে এসেছ? তোমার মাইনে তুমি পাও নি?"

কেষ্টর হয়ে দিলীপই জবাব দেয়,—"মাইনে পেয়েছে। কিন্তু তার ওপর বখশিশের যে ব্যবস্থা করেছেন সেই বিষয়েই একটু জানাতে এসেছে।"

দিলীপের কথাগুলোর রুক্ষতা লক্ষ্য না করবার নয়। তবু চৌধুরী সাহেব বিস্ময়ের ভান করে বলেন,—"বখশিশ? কিসের?"

"যে জন্যে চাকরি ছাড়ালেন সেই জন্যেই বখশিশের ব্যবস্থা করেছেন বোধহয়।"—দিলীপের গলায় তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ।

কপালে কটা রেখা ফুটে ওঠা ছাড়া চৌধুরী সাহেবের মুখে তবুও ভাবান্তর নেই এখনো। হেসেই বলেন—"আপনার কথা আমি ঠিক বুঝতে পারছি না দিলীপবাবু।"

দরকার হলে তিনি বিদ্রূপের জবাব যোগ্য ভাষায় দিতে পারেন তাঁর পরের কথায় তা বোঝা যায়। মুখের হাসিটা বজায় রেখেই তিনি বলেন—"কিন্তু নিজের একটা ড্রাইভার ছাড়াবার অধিকার বোধহয় আমার আছে। আর সে জন্যে কৈফিয়ৎও আশা করি কাউকে দিতে বাধ্য নই।"

পর মুহূর্তের মুখটা তাঁর কঠিন হয়ে ওঠে। কেষ্টর দিকে ফিরে রূঢ় স্বরে বলেন,—"তুমি এখন যেতে পারো।"

মুখের ভাবের ওপর দখল যে তাঁর অসামান্য আবার দিলীপের সঙ্গে কথা বলাতেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

"আপনার যদি অন্য কিছু বলবার থাকে তাহলে…"

কথাটা চৌধুরী সাহেব ইচ্ছে করেই বোধহয় শেষ করেন না। গলার স্বরের সামান্য একটু শুষ্কতা ছাড়া বলার ধরনে রূঢ়তা কিছু নেই।

"হ্যাঁ বলার কিছু আছে বলেই এসেছি।"—দিলীপের কণ্ঠস্বর দৃঢ়।

"বসুন তাহলে"—বলে নিজের চেয়ারে বসতে গিয়ে চৌধুরী সাহেব আবার কেষ্টর দিকে দৃষ্টি দেন। স্পষ্ট বিরক্তির সঙ্গে বলেন—"কই তুমি গেলে না?"

"না, ও আমার সঙ্গেই যাবে"—দিলীপ কঠিন স্বরে জানায়,—"আমার কথা খুব সামান্যই। সুতরাং বেশীক্ষণ আপনাকে বিরক্ত করব না।"

"কিন্তু সামান্য কিছুক্ষণেরও বিরক্তি আমি সহ্য করব কেন দিলীপবাবু!"

চৌধুরী সাহেব সৌজন্যের মুখোশটা এবার বিনা দ্বিধায় খুলতে থাকেন। পরের কথাগু'লতে তাঁর কণ্ঠ একটু একটু করে রূঢ়তায় তীব্র হয়ে ওঠে। তিনি বলে যান—"ছোট বড় ভেদ আমি করি না। কিন্তু আমার ভদ্রতার দাম যারা দিতে জানে না, তাদের নিজের জ য়গা'টা দেখিয়ে দিতেও জানি। একথাটা একেবারে ভুলে যাচ্ছেন কেন যে এটা চৌধুরী কোম্পানীর অফিস, আর আপনি এখানে সামান্য একজন চাকরে।"

দিলীপ সোজা চোখের দিকে চেয়ে একটু হাসে মাত্র। তার পর পকেট থেকে একটা কাগজ বার করে বলে,—"সামান্য একজন চাকরে বলছেন! বেশ ওকথাটাই তা হলে মিথ্যে হয়ে যাক।"

দিলীপ কাগজটা টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে ঘরেই ছড়িয়ে দিয়ে বলে,—"ওই আপনার appointment letter আর এই নিন আমার কাজ ছাড়বার চিঠি।"

পকেট থেকে আর একটা কাগজ বের করে দিলীপ টেবিলের ওপর রাখে।

চৌধুরী সাহেব ঠিক এই ব্যাপারটার জন্যে নিশ্চয় প্রস্তুত ছিলেন না। কিন্তু তাঁকে রাগে ফেটে পড়তে দেখা যায় না। তার বদলে হঠাৎ

আবার মোলায়েম হয়ে তিনি বলেন,—"ও, এখানকার কাজ আপনি ছেড়ে দিতে চান।"

"ছাড়তে চাই নয়, ছেড়ে দিয়েছি। ছোট বড় ভেদটা ভুলে এবার সমানে সমানে দুটো কথা বোধহয় হতে পারে।"

দিলীপের এই জ্বালাধরানো কথাতেও চৌধুরী সাহেবকে নির্বিকার মনে হয়। তিনি সুর পাল্টেছেন। একটু হেসেই বলেন—"হুঁ, সমানে সমানেই তা হলে বলি, চাকরি না ছাড়লেই ভাল করতেন। হঠাৎ ছাড়ছেনই বা কেন? বাড়ি পছন্দ হয় নি?"

"যথেষ্ট পছন্দ হয়েছে!"—দিলীপকে এইবার উত্তেজিত দেখায়,—"কিন্তু ওই ঘুষেও হাসপাতালের ওই টালি পড়ে জখম ছেলেমেয়ে দুটোকে ভুলতে পারলাম না, হজম করতে পারলাম না অনেক কিছুর সঙ্গে এই পাথরের টুকরোটা।"

কয়েকদিন আগে গেটের কাছে কুড়িয়ে পাওয়া শাদা পাথরের টুকরোটা দিলীপ পকেট থেকে বার করে দেখায়।

চৌধুরী সাহেব নীরবে খানিকক্ষণ পাথরটার দিকে চেয়ে থাকেন তার পর যেন আরো মোলায়েম করে বলেন,—"তাহলে শুনুন, ওর চেয়ে বড় ঘুষও আছে।"

"আছে,—" দিলীপ তিক্ত কণ্ঠে বলে,—"আর ঘুষ বাড়ালেই যাকে ইচ্ছে কেনা যায় আপনার ধারণা!"

"ঠিকই ধরেছেন।" —চৌধুরী সাহেব অম্লান বদনে স্বীকার করেন।

"কিন্তু আমার মত লোককে কেনার ইচ্ছেই বা আপনার কেন?"—দিলীপ সত্যিই একটু কৌতূহলী হয়ে প্রশ্ন করে,—"বিনা ঘুষেই নিজেদের বেচবার যথেষ্ট লোক তো আছে।"

"আছে। কিন্তু তারা জোলো জিনিস।"—চৌধুরী নিজের স্বরূপ এবার যেন অসঙ্কোচে উদ্ঘাটিত করেন,—"কড়া মদ তৈরী করতে সবচেয়ে মিষ্টি রসই পচাতে হয়। আদর্শের গোঁড়ামি যার যত বেশী

তাকেই গাঁজালে তত বড় কালাপাহাড় তৈরী হয়। আর ভ্রষ্ট তপস্বী সেই সব কালাপাহাড়ই আমার দরকার।"

শেষের কথাগুলো চৌধুরী সাহেব ধীরে ধীরে যেন বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলেন। দিলীপ তখন সবিস্ময়ে তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে। চৌধুরী সাহেবকে ঠিক এতখানি চিনতে সে সত্যিই পারে নি।

উত্তর দিতে দিলীপের একটু দেরী হয়। খানিক নীরব থেকে সেও ধীরে ধীরে বিঁধিয়ে বিঁধিয়ে বলে,—"আপনার সরলতায় খুশী হলাম। তবে এই একবার বোধ হয় আপনার ঠিকে ভুল হল। কতখানি মিষ্টি নিজে তা আমি জানি না, কিন্তু আপনার ঘুষে গেঁজে ওঠবার কোন লক্ষণ দেখছি না। সুতরাং একটা কালাপাহাড় শিকার আপনার ফসকালো।"

"ফসকালে যে আমার চলে না দিলীপবাবু!"—চৌধুরী সাহেবের চোখের দৃষ্টিতে কৌতুক না কুটিলতার ঝিলিক ঠিক বোঝা যায় না,— "ঘরের খবর যে জেনেছে তাকে চর হয়ে আর বাইরে যেতে দেওয়া যায়?"

একটু থেমে যেন রীতিমত স্নিগ্ধ স্বরেই চৌধুরী সাহেব বলেন,— "বলুন! শুনি আপনার দাম!"

"এতক্ষণ ধরে শুধু নিজের দর বাড়াচ্ছি বলে আপনার ধারণা?"— দিলীপ সত্যিই বিস্মিত।

"ধারণা আশা করি ভুল নয়।"—চৌধুরী সাহেব শান্ত স্বরে বলেন— "আমিও সেজন্য প্রস্তুত হয়েছিলাম!"

ড্রয়ার টেনে একটা কাগজ বার করে দিলীপের দিকে এগিয়ে দিয়ে চৌধুরী সাহেব বলেন—"এটা কি জানেন?"

কাগজের দিকে অবজ্ঞাভরে একবার চেয়ে দিলীপ বলে,—"না।"

চৌধুরী সাহেব আবার কাগজটা নিজের কাছে টেনে নিয়ে সই করতে করতে বলেন।—"এটা চৌধুরী কোম্পানীর সব চেয়ে বড় চাকরির appointment letter, ক্লাস ওয়ান অফিসারের চাকরি!

মাইনে তো জানেনই। তা ছাড়া আপনার ব্যবহারের জন্যে খরচখরচা সমেত একটা গাড়ি।"

সই করা কাগজটা দিলীপের দিকে ঠেলে দিয়ে চৌধুরী সাহেব হেসে বলেন,—"বলুন এবার কি বলতে চান?"

দিলীপ খানিকক্ষণ সত্যিই কিছু বলতে পারে না। চৌধুরী সাহেব তখন তার মুখের দিকে চেয়ে মৃদু মৃদু হাসছেন।

হঠাৎ চৌধুরী সাহেবকেও চমকে উঠে দাঁড়াতে হয়।

"এই আমার জবাব!"—বলে কাগজটা তার মুখের ওপর ছুঁড়ে দিয়ে দিলীপ তখন বেরিয়ে যাচ্ছে।

কলিং বেলটা টিপে চৌধুরী সাহেব বলেন,—"দাঁড়ান।"

দিলীপ বুঝি নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ফিরে দাঁড়ায়।

চৌধুরী সাহেব যেন তার প্রতি সহানুভূতির স্বরেই ক্ষুণ্ণ গম্ভীর গলায় বলেন,—"এভাবে কাজ ছেড়ে এখান থেকে কেউ এখনো পর্যন্ত যেতে পারে নি দিলীপবাবু।"

বিনোদবাবু কলিং বেলের হুকুমেই বোধ হয় তখন ভেতরে এসে দাঁড়িয়েছেন।

তার ও চৌধুরী সাহেবের দিকে অবজ্ঞাভরে চেয়ে দিলীপ বলে,—"যা কেউ পারে নি তাই প্রথম করবার গৌরবটা তা হলে আমার থাক।"

চৌধুরী সাহেব যেন নিরুপায় হয়েই কথাটা মেনে নিয়ে বিনোদ বাবুকে হতাশ ভাবে বলেন,—"ইনি আপনার চাকরি ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। একটু পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করে দিন।"

"যে আজ্ঞে"—বলে বিনোদবাবু বেরিয়ে যান।

দিলীপ একটু বিস্মিত হয়েই বলে,—"আপনার উদারতার জন্যে ধন্যবাদ। কিন্তু এ অনুগ্রহটা আর নিতে পারবো না।"

"সে আপনার মর্জি!"—চৌধুরী সাহেব অদ্ভুতভাবে হেসে বলেন,—"আবার কিন্তু বলছি আমাদের সম্পর্ক না ছাড়লেই ভাল করতেন।"

অত্যন্ত সহজ শান্ত কণ্ঠ, কিন্তু কোথায় যেন একটা দুর্বোধ কিসের

ইঙ্গিত তার মধ্যে আছে যা অস্বস্তি জাগায়। সে অস্বস্তিটা অগ্রাহ্য করে দিলীপ পরিহাসের সুরেই বলে,—"একদিন হয়ত সেই আফসোসই করব!"

দিলীপ ঘর থেকে বেরিয়ে যায়।

যাবার সময় ফিরে তাকালে চৌধুরী সাহেবের চোখ দুটো দেখে অস্বস্তির কারণ সে হয়ত কিছুটা বুঝতে পারত।

বাইশ

চৌধুরী সাহেবের খাস কামরা থেকে কেষ্টকে নিয়ে দিলীপ বেরিয়ে আসতে না আসতেই অফিস বাড়ির কল্যাপ্‌সিবল গেটটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে দেখা গেল।

ব্যাপারটা অস্বাভাবিক। তবে আসল মানেটা তখনও বোধহয় কেষ্ট বা দিলীপের ধারণার বাইরে।

কেষ্টই কাছে গিয়ে দরোয়ানকে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি গেট বন্ধ করে দিলে যে!"

দরোয়ান উত্তর না দিয়ে পেছনের দিকে চাইল শুধু।

পেছনে বিনোদবাবু এসে দাঁড়িয়েছেন। মূর্তিমান বিনয়ের মত তিনি বললেন,—"অনুগ্রহ করে ওই পাশের দরজা দিয়ে যান।"

"এ অনুগ্রহটুকুর কারণ জানতে পারি?" দিলীপ একটু কঠিন স্বরেই জিজ্ঞাসা করলে।

নিশ্চয়ই পারেন। বিনোদবাবু সৌজন্যের অবতার হয়ে বললেন,—"আজ অফিস একটু সকাল সকাল বন্ধ হল কি না!"

"আমাদেরই সম্মানে বোধহয়—" তিক্তস্বরে কথাটা বলে দিলীপ কেষ্টকে নিয়ে বিনোদবাবুর দেখানো দরজার দিকেই এগুলো।

পাশের দরজাটা চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজের গ্যারেজের দিকে যাবার।

সদর দরজা বন্ধ করে খিড়কি দিয়ে তাদের যেতে বাধ্য করার অপমানটুকু চৌধুরী সাহেবের অভিপ্রেত বলে তখনও দিলীপের ধারণা।

দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়াতে সে ধারণা বদলাল।

দেয়াল দিয়ে ঘেরা বেশ খানিকটা বিস্তৃত জায়গায় কোম্পানীর সব গাড়ি রাখার ও মেরামত ইত্যাদির ব্যবস্থা।

দরজা খুলতেই দেখা গেল দাশু আর তার সাঙ্গপাঙ্গ চারিদিকে

ছাড়াছাড়াভাবে সমস্ত জায়গাটায় ছড়িয়ে আছে। তাদের স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থাকার ভঙ্গিটাই কেমন অস্বাভাবিক ও অস্বস্তিকর।

দরজা থেকে যে সিঁড়িটা নীচে নেমে গেছে তার পাশেই দাঁড়িয়ে আছে দাশু স্বয়ং।

ঘাড় বেঁকিয়ে সে একবার দিলীপ ও কেষ্টর দিকে চাইল মাত্র। এবার আর তার হাত সেলামের ভঙ্গিতে কপালে উঠল না। তার বদলে মুখে স্পষ্ট একটু অবজ্ঞার হাসি দেখা গেল।

দিলীপ সিঁড়ির ওপর দাঁড়িয়ে ব্যাপারটা ভালো করে বুঝে নেবার চেষ্টা করছিল। একটা কর্কশ শব্দে তাকে চমকে উঠতে হ'ল।

চোখ তুলে দেখল গ্যারেজ এলাকা থেকে বাইবে বার হবার গেটেব লোহার পাতের বিরাট পাল্লা দুটো একজন বন্ধ করছে। যান্ত্রিক আর্তনাদটা কিন্তু যেন শুধু গেটের নয়।

"দরজা বন্ধ করছ যে—" বলে নীচে নামতে গিয়ে কেষ্ট মাটির ওপর হুমড়ি খেয়ে গিয়ে পড়ল। কেষ্টর নামবার সময় একটা পা আচমকা বাড়িয়ে দিয়ে দাশুই তাকে ফেলে দিয়েছে।

মাটির ওপর হঠাৎ এমন ভাবে আছড়ে পড়ে কেষ্ট প্রথমটা হক-চকিয়ে গেছল। তারপর দাশুর শয়তানিটা বুঝে সে রেগে আগুন হয়ে দাশুর দিকেই ছুটে এল।

ওর ছুটে আসা পর্যন্তই। দাশু তৈরীই ছিল। তার উল্টো হাতের একটি মারে কেষ্টকে আবার মাটি নিতে হল।

মার খেয়ে ল্যাজ গুটোবার পাত্র কিন্তু কেষ্ট নয়। মুখে নাকে তখন তার রক্তের দাগ। তবু সে উঠে এল টলতে টলতে দাশুর দিকে।

দাশু ঘুষিটা তুলেছিল ঠিক সময়ে। কিন্তু সে ঘুষি আপাততঃ তার মারা হল না। দিলীপ এক লাফে নীচে নেমে দাশুর হাতটা ধরে ফেলে জ্বলন্ত স্বরে বললে,—"কি হচ্ছে কি! কি ভেবেছ তোমরা!"

মুখে নয় হাতেই দাশু তার জবাবটা দিলে। যে হাত এতদিন

সেলামের ভঙ্গিতে কপালে উঠেছে. সেটা দিলীপের মুঠো থেকে এক ঝটকায় ছাড়িয়ে নিয়ে অতর্কিতে দিলীপের পেটে ঘুষি চালালে।

অপ্রস্তুত অবস্থায় আচমকা তলপেটে প্রচণ্ড আঘাত খেয়ে দিলীপ মাটিতে লুটিয়ে পড়ল। কিন্তু কেষ্ট তাতেই যেন ক্ষিপ্ত হয়ে অসুরের শক্তি নিয়ে দাশুকে আক্রমণ করলে। সে আক্রমণের সামনে দাশুর মত গুণ্ডাকেও পিছু হটতে হল। তবে বেশীক্ষণের জন্যে নয়। দাশুর দুজন অনুচর পেছন থেকে কেষ্টর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।

দিলীপ তখন পেটের ব্যথাটা সামলে উঠে দাঁড়িয়েছে। এগিয়ে এসে সবলে কেষ্টর একজন আততায়ীকে টেনে সরিয়ে দিয়ে সে চীৎকার করে উঠল ঘৃণাভরে,—"লজ্জা করে না তোমাদের! দুজনের বিরুদ্ধে এতগুলো গুণ্ডা এক জোট হয়ে লড়ছ!"

কিন্তু কাদের সে লজ্জা দেবে। এরা এ সব কিছুর বাইরে, অমানুষ।

দিলীপের অসাবধান অবস্থাতেই দাশু ফিরে এসে সজোরে তাকে এক ঘুষি মারলে। দিলীপ টলতে টলতে পিছু হটল। কিন্তু তাতেও নিস্তার নেই। দিলীপের অসহায় অবস্থায় সুযোগ নিয়ে দাশু এলো-পাথারি তার ওপর ঘুষি চালিয়ে চলল।

দিলীপ এইবার বুঝি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে।

কিন্তু তা সে পড়ল না। প্রাণপণে নিজেকে সামলে দিলীপ হাত তুলে দাশুর কয়েকটা ঘুষি ঠেকাল। তার পর সমস্ত ব্যাপারটার চেহারাই গেল বদলে।

পেশাদার মুষ্টিযোদ্ধা দিলীপ নয়, কিন্তু এককালে শখ করে পঞ্চুদার আখড়াতেই ঘুষির লড়াইএর কিছু কায়দা কানুন সে শিখেছিল। দাশুর আঘাত ঠেকিয়ে সে-ই এবার আক্রমণ সুরু করলে।

এ যেন আরেক দিলীপ। এদের নীচতায় ও শয়তানীতে জ্বলে উঠে সে যেন অমানুষিক শক্তি পেয়ে হিংস্র একটা ঘূর্ণিবাত্যা হয়ে

উঠেছে। তার আক্রমণের বেগ সামলান দাশুর মত দুজন গুণ্ডার পক্ষেও তখন অসম্ভব।

পাল্টা জবাব তো নয়-ই, দাশু পিছু হটে পালাবার জন্যেই তখন ব্যস্ত। কিন্তু পালাবে কোথায়! দিলীপের প্রচণ্ড আক্রমণে লুটিয়ে পড়ে গিয়ে সে এবার কাপুরুষের মত হাত দুটো তুলে যেন করুণা ভিক্ষা করছে মনে হল। মুখে তার আতঙ্কের ছায়া।

ঠিক সেই সময়ে হাতে একটা কঠিন ডাণ্ডা নিয়ে দাশুর যে অনুচরটি গোড়া থেকেই এক কোণে দাঁড়িয়ে ছিল সে দিলীপের পেছনে এসে দাঁড়িয়ে সজোরে তার মাথার ওপর সেটা চালাল।

তাকে ডাণ্ডাটা তুলতে দেখেই কেষ্ট দিলীপকে সাবধান করবার জন্যে চীৎকার করে উঠেছিল। দিলীপ তাতে এক পলকের মধ্যে যতটুকু সম্ভব হাত তুলে আঘাতটা ঠেকাবার চেষ্টা করেছিল বটে কিন্তু আঘাত থেকে তাতে রক্ষা পায় নি।

ডাণ্ডাটা সজোরে মাথায় লেগে রক্তাক্ত দিলীপ জ্ঞান হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল।

ক্ষিপ্তের মত ছুটে এসে কেষ্ট ডাণ্ডাটা কেড়ে নিল গুণ্ডাটার হাত থেকে।

চার-পাঁচজন তখন তাকে ঘিরে ধরেছে। চার দিকে ডাণ্ডাটা ঘুরিয়ে কেষ্ট তাদের ঠেকিয়ে একটু একটু করে পিছু হটতে সুরু করল। তার আসল উদ্দেশ্যটা গুণ্ডাদের কেউ তখনো বোঝেনি।

দাশু মাটি থেকে উঠে পড়ে চীৎকার করে তখন বলছে—"দে, ওটাকেও শেষ করে দে। সাক্ষী কেউ যেন না থাকে।"

কিন্তু সাক্ষী তবু রইল।

ডাণ্ডা ঘোরাতে ঘোরাতে হঠাৎ ছুট দিয়ে কেষ্ট গ্যারেজের উঠোনের বাইরের গেটের দিকের নিচু একটা কুঠরির টিনের চালের ওপর কোন মতে পাশের চৌবাচ্চার গা বেয়ে লাফিয়ে উঠে পড়ল। সেখান থেকে গ্যারেজের দেওয়ালে উঠে লাফ দিয়ে বাইরের রাস্তায়।

গুণ্ডাদের দু-একজনও টিনের চালে তার পিছু পিছু উঠেছিল তাড়া করে। কিন্তু বাইরের রাস্তায় ঝাঁপ দিয়ে কেউ কেষ্টর পিছু নিলে না।

দাশুই পেছন থেকে ডেকে ঘৃণা ভরে বললে,—"যেতে দে ও নেংটি ইঁদুরটাকে। বাঘটাই আসল।"

তেইশ

বাঘটাই আসল হোক, নেংটি ইঁদুর হিসেবে কেষ্টকে ছেড়ে দেওয়া যে কত বড় ভুল তা চৌধুরী সাহেব ও তার পোষা গুণ্ডারা তখন আর বুঝবে কি করে ?

কেষ্ট লাফ দিয়ে পড়ে প্রায় ছুটতে ছুটতেই প্রথম গেল তার নিজের বাসায়।

তাকে ঐ অবস্থায় দেখে তার স্ত্রী লক্ষ্মী তো প্রথমেই আঁৎকে উঠে চীৎকার করে উঠল।

"এ কি ! কি হয়েছে তোমার ? ওগো কি হয়েছে !"

"চেঁচিও না ! সব কথা বলবার সময় নেই !" বলে ধমক দিয়ে কেষ্ট একটা খাতা পেন্সিল নিয়ে তাড়াতাড়ি কি লিখতে বসল।

ধমক খেয়ে চুপ করে থাকা কিন্তু লক্ষ্মীর পক্ষে অসম্ভব। স্বামীর চেহারা দেখে বুকের ভেতরটা তখন তার শুকিয়ে গেছে। সে কাতর স্বরে অনুনয় করলে, "কি হয়েছে একটু বলো ওগো ! আমি যে কিছু বুঝতে পারছি না।"

কেষ্টর লেখা শেষ না হওয়া পর্যন্ত সে তবু চুপ। লেখাটা শেষ করে খাতা থেকে কাগজটা ছিঁড়ে নিয়ে লক্ষ্মীর হাতে দিয়ে সে বললে, "যা বলবার এই চিঠিতে বলেছি। পড়লেই বুঝতে পারবে। এখন শোন, নিচে যে ঠিকানা লিখে দিলাম সেখানে গিয়ে মায়া দেবীকে এই চিঠিটা দেবে। তারপর তাঁকে নিয়ে দিলীপ যেখানে থাকে সেই যোশেফ খুড়োর বাসায় যাবে।"

কেষ্ট চিঠিটা দিয়েই আর দাঁড়াল না।

লক্ষ্মী ব্যাকুল হয়ে ডাকলে, "ওগো কোথায় যাচ্ছ ! শোনো !"

দরজার বাইরে থেকে কেষ্টর কণ্ঠ শোনা গেল,—"পেছু ডেকো না।"

কেষ্টকে তারপর দেখা গেল পাঁচুদার আখড়াতে ছুটতে ছুটতে ঢুকছে।

তার ছুটে আসার ধরন আর চেহারা দেখে আখড়ার ছেলেরাও অবাক।

বিকেল বেলা। বেশীর ভাগ আখড়ার ছেলেই তখন সেখানে খেলা-ধুলো ব্যায়ামের জন্যে জড় হয়েছে।

তারা কেষ্টকে ঘিরে ধরে সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলে,—"কি হয়েছে কি কেষ্টদা! এ কি চেহারা তোমার! অ্যাকসিডেণ্ট নাকি!"

"হ্যাঁ, দারুণ অ্যাকসিডেণ্ট!" কেষ্ট বেশী কথা বলতে নারাজ। তাদের সকলকে ঠেলে পঞ্চুদার ছাপাখানার দিকে যেতে যেতে শুধু বললে,—"চলো তোমরা সবাই। পঞ্চুদার কাছে গিয়েই শোনাচ্ছি।"

পঞ্চুদা তাঁর টেবিলে বসে সুতো বাঁধা চশমা নাকের ওপর ঝুলিয়ে কোন প্রুফ দেখছিলেন বোধহয়। আখড়ার ছেলেদের সঙ্গে কেষ্টকে অমন হুড়মুড় করে ঢুকতে দেখে তিনি অবাক হলেন নিশ্চয়। কিন্তু মুখে তবু কোন ভাবান্তর নেই।

এরকম চাঞ্চল্য ও উত্তেজনা যেন এখানকার নিত্য-নৈমিত্তিক এমনি-ভাবে চোখের চশমাটা খুলে তিনি হেসে বললেন, "কেষ্ট যেন একটা লঙ্কাকাণ্ড করে এসেছে মনে হচ্ছে।"

"করিনি তবে তাই করতে হবে।"—কেষ্ট পঞ্চুদার সামনে একটা টিনের চেয়ার টেনে নিয়ে বসে প্রায় হাঁপাতে হাঁফাতেই বললে,—"শুনুন পঞ্চুদা, আপনার আমার এইসব ছেলেদের সকলের আজ পরীক্ষা। বোমা বারুদ নিয়ে আপনারা কবে কি সব করেছিলেন শুনেছি, সে বারুদ একেবারে ভিজে মাটি হয়ে গেছে কিনা আজ তাই দেখতে চাই।"

পঞ্চুদা প্রথম ঠাট্টা করেই বললেন,—"তোমার কথাগুলো যা গনগনে আগুন তাতেই ভিজে বারুদ শুখিয়ে যাওয়া উচিত। তবু বলো শুনে দেখি পরীক্ষায় পাস করতে পারব কিনা।"

শেষ কথার সঙ্গে সঙ্গে পঞ্চুদার মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠল।

লক্ষ্মীর সঙ্গে মায়াকে যোশেফ খুড়োর দরজায় মৃদু করাঘাত করতে দেখা গেল কিছুক্ষণ বাদে।

লক্ষ্মী ঠিকানা খুঁজে মায়াকে কেষ্টর চিঠি দেওয়ার পরই তা পড়ে ব্যাকুল হয়ে দুজনে যোশেফের বাসায় ছুটে আসছে।

বার কয়েক করাঘাতের পর যোশেফ একটু বিরক্ত মুখেই দরজাটা খুললেন। দুটি মেয়েকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিরক্তিটা তাঁর বিস্ময়ে পরিণত হল। সেই সঙ্গে একটু বিমূঢ়তাও।

একটু ইতস্ততঃ করে যোশেফ বললেন—"Well, what can I do for you ?"

কথাটা বলে ফেলার পরই দুটি মেয়ের একটিকে তাঁর যেন চেনা মনে হ'ল। কেষ্টর স্ত্রী লক্ষ্মীকে এর আগে দু-একবার তিনি দেখেছেন বটে তবে সে দেখায় ভালো করে মনে না থাকবারই কথা।

দ্বিধাভরে যোশেফ তাই আবার জিজ্ঞাসা করলেন,—"আপনি Kesto's wife,—I mean কেষ্ট বাবুর wife নন ?"

লক্ষ্মী wife কথাটা বুঝল। সলজ্জভাবে একটু হেসে বললে,—"হ্যাঁ।" তারপর মায়াকে দেখিয়ে বললে,—"আর এঁর নাম মায়াদেবী !"

যোশেফ তখন ব্যস্ত হয়ে উঠেছেন,—"আসুন, আসুন, ভেতরে আসুন।"

যোশেফের পিছু পিছু ঘরের ভেতরে ঢুকে মায়াই এবার ব্যাকুলভাবে বললে,—"ভয়ানক বিপদে পড়ে আপনার কাছে এসেছি। আপনার সাহায্য চাই।"

"আমার সাহায্য !"—যোশেফ সত্যিই অবাক। একটু চুপ করে থেকে কিঞ্চিৎ ব্যথিত সুরেই বললেন,—"I am really flattered, young Lady,—আপনার গলার sincerity না বুঝলে ভাবতাম, হয়তো ঠাট্টা করছেন ! কিন্তু আমি তো একজন poor helpless old man, এখন আমার সাহায্য দেবার নয়, নেবার দিন।"

"না, আপনিই সাহায্য করতে পারেন।"—মায়া এবার একটু দৃঢ় স্বরেই বললে—"আপনি একদিন পুলিশ অফিসার ছিলেন না?"

"ছিলাম" —যোশেফ ম্লানভাবে একটু হাসলেন,—"কিন্তু that's old history, পুলিশের লোক হিসাবে আমার এখন কোন দাম নেই।"

"খুব আছে।"—মায়ার গলায় ব্যাকুলতার সঙ্গে গভীর নির্ভরতা,—"আমাদের পক্ষে যা সম্ভব নয়, তা আপনি পারেন। আপনি একটু চেষ্টা করলে একেবারে খোদ কর্তাদের কাছে খবরটা পৌঁছে দিতে পারেন। আর সময় নেই।"

যোশেফ সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলেন,—"কিসের সময় নেই? কি বলছেন! It's all a puzzle to me!"

নিজের ভুলটা বুঝতে পেরে মায়া লজ্জিতভাবে বললে,—"ও আপনি তো কিছুই জানেন না। শুনুন, দিলীপবাবুকে চৌধুরী সাহেবের কারখানায় বন্দী করে রেখেছে, যে রকম নির্মমভাবে তাঁকে মেরেছে তাতে বেঁচে আছেন কিনা তারও ঠিক নেই।"

শেষ কথাগুলো বলতে বলতে মায়ার গলাটা কান্নায় রুদ্ধ হয়ে গেল।

যোশেফ খুড়োও তখন যেন বিদ্যুতের চাবুক খেয়ে অন্য মানুষ হয়ে গেছেন। তীক্ষ্নস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, "দিলীপকে মেরেছে! He is a prisoner there! আপনারা জানলেন কি করে?"

কথাগুলো বলে উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করে যোশেফ তাঁর পুরোন সিন্দুকটা খুলে কি যেন খুঁজতে লাগলেন।

মায়ার বদলে লক্ষ্মীই এবার জবাব দিলে। বললে—"উনিও দিলীপ ঠাকুরপোর সঙ্গে ছিলেন। কোন রকমে পালিয়ে এসে চারিদিকে খবর দিতে বেরিয়েছেন। আমাদের শুধু আপনার কাছে পাঠিয়ে দিলেন।"

যোশেফ খুড়ো যা খুঁজছিলেন তা এতক্ষণে পেয়েছেন মনে হল। লক্ষ্মীর কথা শুনে কোন কিছু না বলে তিনি প্রথমে পোষাকের আলমারী

খুলে একটা ভালো দেখে কোট গায়ে চড়ালেন, তারপর সেই কোটের সামনে যে জিনিসটি লাগালেন সেটি একটি মেডেল। বোঝা গেল এইটিই তিনি সিন্দুক খুলে খুঁজছিলেন।

মায়া ও লক্ষ্মী একটু বিমূঢ় হয়েই তাঁর কাণ্ডকারখানা দেখছিল।

মেডেলটা বুকে এঁটে যোশেফ মায়ার দিকে ফিরে প্রায় আদেশের স্বরে বললেন,—"আপনাকে আমার সঙ্গে যেতে হবে।"

"আমাকে!"—মায়া প্রথম অবাক হয়ে এক মুহূর্ত বুঝি দ্বিধা করলো। তারপর জোরের সঙ্গে বললে,—"হ্যাঁ নিশ্চয় যাবো। চলুন।"

যোশেফ নিজের মনেই বললেন—"I hope I won't be refused at head-quarters, আমাকে আজ কেউ না চিনুক, এ Medalটা বোধ হয় চিনবে।"

চব্বিশ

চৌধুরী ইণ্ডাস্ট্রিজের এলাকার মধ্যেই একটি বাড়ির তালাবন্ধ দরজায় দাশুকে টুলের ওপর বসে থাকতে দেখা গেল। কাজের অভাবেই সে নিজের আঙুলের নখগুলো দাঁতে কাটছে বোধ হয়।

চৌধুরী সাহেব বিনোদের সঙ্গে বড় অফিস থেকে বেরিয়ে সেখানেই এসে দাঁড়ালেন। দাশু সসম্ভ্রমে উঠে সেলাম জানাতে চৌধুরী সাহেব জিজ্ঞাসা করলেন,—"নতুন কিছু খবর আছে ?"

দাশু তখন পকেট থেকে চাবির গোছা বার করে দরজার তালা খুলছে। তালা খুলে দরজাটা ঠেলে দিয়ে সে একটু ক্ষুণ্ন স্বরে জানালে, "না স্যার, সেই এক জবাব ! আমার দাওয়াই আর একটু যদি দিতে হুকুম করেন…"

"না থাক্।"—বলে দাশুর উৎসাহকে প্রশ্রয় না দিয়ে চৌধুরী সাহেব বিনোদকে সঙ্গে নিয়ে ভেতরে ঢুকলেন।

ভেতরের করিডর দিয়ে কিছুটা গিয়ে যে ঘরের সামনে তাঁরা থামলেন তার দরজা ভেজানো কিন্তু তালা বন্ধ নয়।

চৌধুরী সাহেব সে দরজায় যে ভাবে টোকা দিলেন তাতে মনে হল ভেতরে কোন গণ্যমান্য ব্যক্তি নিশ্চয় আছেন।

অনুমানটা একদিক দিয়ে ঠিক। চৌধুরী সাহেবের টোকার জবাবে ভেতর থেকে প্রসন্ন অভ্যর্থনা যার কণ্ঠে শোনা গেল, সে দিলীপ ছাড়া আর কেউ নয়।

"চলে আসুন, চলে আসুন, নির্ভয়ে চলে আসুন !" দিলীপের গলার স্বরে মনে হল সে যেন নিজের রাজবাড়ির বৈঠকখানায় কোন অতিথিকে ঢোকবার অভয় দিচ্ছে।

চৌধুরী সাহেবও বিনোদকে নিয়ে কতকটা সেই রকম কৃতার্থ ভঙ্গিতেই

ঢোকবার পর দেখা গেল দিলীপ একটি সোফায় হেলান দিয়ে রঙচঙে মলাটের একটি বই পড়ছে। তার মাথায় ব্যাণ্ডেজ বাঁধা কিন্তু মুখে চোখে কোনরকম কাতরতার বদলে কৌতুকোজ্জ্বল প্রসন্নতাই পরিস্ফুট।

চৌধুরী সাহেব ঘরে ঢুকতে দিলীপ তাঁর দিকে এমন সহাস্য মুখে তাকাল যেন এই সাক্ষাৎটার জন্যেই সে উৎসুক হয়ে ছিল।

চৌধুরী সাহেব পাশের সোফায় গিয়ে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, "কেমন আছেন দিলীপবাবু?"

"খুব ভালো", দিলীপ পরম পরিতৃপ্ত গলায় জানিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, —"এসব ইংরিজি রহস্য রোমাঞ্চের বইএর collection আপনারই নিশ্চয়।"

মাথা নেড়ে সায় দিয়ে চৌধুরী সাহেব ঘরের চারিদিকে চোখ ঘুরিয়ে হঠাৎ যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন।

বিনোদবাবু চৌধুরীসাহেবের সঙ্গে ঘরে ঢোকবার পর কাঠের সেপাই এর মত গম্ভীর মুখে এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিল। তার দিকে চেয়ে বেশ একটু বিরক্তির সঙ্গেই চৌধুরী সাহেব বললেন,—"এ ঘরে একটা পাখার বন্দোবস্ত করেন নি বিনোদবাবু!"

বিনোদবাবু নিরুত্তর হয়েও অপরাধীর মত মুখভঙ্গী করলে।

চৌধুরী সাহেব এবার ধমক দিয়ে বললেন,—"না বলে দিলে একটা কাজ নিজের বুদ্ধিতে করতে পারেন না। যান, এখুনি ব্যবস্থা করুন গিয়ে।"

বিনোদবাবু নীরবে তৎক্ষণাৎ বেরিয়ে গেল।

চৌধুরী সাহেব আবার দিলীপের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলেন, — "আচ্ছা আপনার আর কোন অসুবিধা হচ্ছে না তো?"

"অসুবিধে, বিলক্ষণ! বিন্দুমাত্র না।"—দিলীপ উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল,—"সত্যি কথা বলতে কি তা এরকম জামাই আদরে থাকার ভাগ্য জীবনে কখনো হয় নি। তাই বলছি এত সুবিধেই যখন করে দিলেন

তখন আমার সম্বন্ধে যা ব্যবস্থা করার দুদিন একটু যদি পিছিয়ে দেন, বাকি বইগুলো সব পড়ে ফেলতে পারি।"

ভেতরে ভেতরে টগবগ করে রাগে ফুটলেও চৌধুরী সাহেব মুখের হাসি মিলোতে দিলেন না। বললেন,—"বইগুলো আপনি নিয়েই যান না। আপনি যা বই চান তাই দিয়ে আপনার লাইব্রেরী ভরে দেওয়ার ব্যবস্থাও হতে পারে।"

"পারে? সত্যি!"—দিলীপ যেন উৎসাহ ভরেই দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর কেমন একটু সংশয়ের সঙ্গে বললে,—"কিন্তু এখন•••।"

দিলীপের অনুক্ত সংশয়টা চৌধুরী সাহেব অভয় দিয়ে দূর করে দিলেন,—"এখনো সময় তো যায় নি দিলীপবাবু। শুধু আমাদের বোঝাবুঝির ভুলে এই গোলমালটা হয়ে গেল। তার জন্যে আমি দুঃখিত।"

চৌধুরী সাহেবের কথায় যেন পরম আশ্বাস পেয়ে দিলীপ ঘরে পায়চারি করতে করতে বললে,—"আপনি দুঃখিত। তাহলে তো আমার আর দুঃখের কিছু নেই।"

"আপনার দুঃখের কিছু থাকবে না এইটুকু বিশ্বাস করতে পারেন।" —চৌধুরী সাহেব জোরের সঙ্গে জানালেন, "বোঝাবুঝির ভুলে যা হয়ে গেছে তার খেসারৎও আপনি পাবেন। আশা করি দুজনেই আমরা দুজনকে বোঝার ভুল এবার শোধরাতে পারব।"

"আমিও তো সেই আশাই করছি।" দিলীপ চৌধুরী সাহেবের সামনে এসে দাঁড়িয়ে হেসে বললে, —"কিন্তু সব শোধরালেও কপালের এই দাগটা কি শোধরানো যাবে?"

"তার জন্যে যথেষ্ট খেসারৎ আপনি পাবেন।"—চৌধুরী সাহেবের মুখের ভাবে গলার স্বরে উদারতা ফুটে উঠল,—"আর সেই সঙ্গে চৌধুরী এন্টারপ্রাইজএ এমন একটা কাজ •••••"

বাধা দিয়ে দিলীপ বললেন, "কিন্তু তার আগে খেসারৎটা কি জানা দরকার নয় কি?"

"নিশ্চয়ই!" চৌধুরী সাহেব উৎসাহিত হয়ে বললেন, "বলুন কি হলে আপনি সন্তুষ্ট হন ?"

"কি হলে সন্তুষ্ট হই!" দিলীপ প্রায় স্নিগ্ধ গলায় নিজেকেই যেন প্রশ্ন করলে স-রবে।

তারপর উত্তরটা সে চৌধুরী সাহেবকে গলায় যেন মধু ঢেলে দিয়ে শোনালে।

তাঁর চোখের দিকে স্থির দৃষ্টি রেখে ধীরে ধীরে বললে, "সন্তুষ্ট হই আপনার গায়ে নম্বরী কুর্তা আর জাঙ্গিয়ার সঙ্গে হাতে হাত কড়া আঁটা দেখলে! চৌধুরী এণ্টারপ্রাইজের নামে লক্ষ লক্ষ নিরীহ সরল অসহায় মানুষের সঙ্গে যে শয়তানী এতদিন করে এসেছেন তার উপযুক্ত শাস্তি আপনি যদি পান সেই আমার একমাত্র খেসারৎ।"

চৌধুরী সাহেব একবার মনে হল বুঝি বোমার মত ফেটে পড়বেন। কিন্তু আশ্চর্য ভাবে নিজেকে সামলে তিনি শুধু দাঁতে দাঁত চেপে বললেন, "হুঁ, গাঁজলা তাহলে এখনো মরে নি। বেশ! উপযুক্ত ওষুধের ব্যবস্থাই তাহলে করতে হবে।"

চৌধুরী সাহেবের কথার উত্তরে দিলীপ কি বলত কে জানে, কিন্তু সেই মুহূর্তে দাশু তার এক শাগরেদকে নিয়ে উত্তেজিত ভাবে ঘরে ঢুকে প্রায় কাতরভাবে চীৎকার করে উঠল—"স্যার!"

চৌধুরী সাহেবের মেজাজ বিগড়েই ছিল। জ্বালাটা তাঁর দাশুর ওপরই তিনি প্রকাশ করলেন ধমক দিয়ে,—"এখন বিরক্ত কোর না যাও।"

দাশুর কিন্তু যাবার লক্ষণ দেখা গেল না। ধমক খেয়ে দমে গিয়েও সে ব্যাকুল ভাবে জানালে, "বড় মুশকিল বেধে গেছে যে স্যার।"

"বাধুক, Get out।" চৌধুরী সাহেব আগুন হয়ে উঠলেন এবার।

"কি করে যাই স্যার।" দাশু নিরুপায় হয়ে তার আসল খবরটুকু জানালে শঙ্কিত কণ্ঠে,—"ওরা যে লালবাজারে গেছে স্যার। সব খবর পৌঁছে গেছে। এখুনি নাকি খানাতল্লাসীতে আসছে।"

এ খবরে যতটা, হঠাৎ দিলীপের উচ্চকণ্ঠের হাসিতে চৌধুরী সাহেব বোধ হয় তার চেয়ে বেশী চমকে উঠলেন।

দিলীপের হাসি আর থামতে চায় না। প্রায় অপ্রকৃতিস্থর মত হাসতে হাসতে সে ঘরের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে চলে গেল।

চৌধুরী সাহেব তীব্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন দাশুকে—"কোথায় শুনলে একথা?"

"এই যে এখুনি ফোন এসেছে স্যার। দুবে ফোন করে' জানিয়েছে। এই বিশে ধরেছিল।" দাশু তার শাগরেদকে দেখিয়ে দিলে প্রমাণ স্বরূপ।

দিলীপ তখন হাসতে হাসতে আবার তাদের কাছে ফিরে এসেছে। হাসি থামিয়ে তীক্ষ্ণ শ্লেষের স্বরে সে বললে,—"আপনাকে যেন একটু বিচলিত মনে হচ্ছে চৌধুরী সাহেব। সব যেন গোলমাল হয়ে গেল! গুদোম ভর্তি পাথরের গুঁড়ো, ভেজাল white oil—এ সব সামলান একটু শক্ত হয়ে গেল মনে হচ্ছে।"

দিলীপ আবার হাসতে সুরু করলে।

কিন্তু চৌধুরী সাহেবের চেহারা এই কয়েক মুহূর্তেই পাল্টে গেছে। সেই সৌজন্যের ভান ও অস্থিরতা এখন একেবারে সুস্পষ্ট হিংস্র শয়তানীর রূপ নিয়েছে। মুখ দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বার করে চৌধুরী বললেন,—"হাসছ কি! সামলাবার কথা এবার তুমি ভাবো!"

"আমি ভাবব?"—দিলীপ সত্যিই একটু বিস্মিত।

"হ্যাঁ তুমি!"—চৌধুরী হিংস্র উল্লাসে প্রায় চীৎকার করে বলতে লাগলেন,—"খানাতল্লাসীতে কিছু পাওয়া যাবে মনে করো! শোনো, এই কারখানায় এখুনি আগুন লাগবে। সে আগুন নেভাবার নয়। আর সে আগুন কে লাগাচ্ছে-জানো? তুমি।"

দিলীপ বিমূঢ়তার দরুণই বোধ হয় কিছু বলতে পারল না।

চৌধুরী নিজেই আবার জোর দিয়ে বললেন,—"হ্যাঁ তুমি। পুলিশের

কাছে সেই হবে আমাদের নালিশ। চাকরি থেকে বরখাস্ত হবার আক্রোশে তুমি আগুন লাগিয়েছ কারখানায়। পঞ্চাশ জন সাক্ষী তার জন্যে মজুদ।"

গলা-ছাড়া হাসিতেই দিলীপের হাসির জবাব দিয়ে চৌধুরী বললেন,—"এবার শেষ হাসিটা কার বুঝে দেখো।"

চৌধুরীর বিদ্রূপের হাসিটা কিন্তু মাঝপথেই থেমে গেল। দাশু ও বিশের সঙ্গে দিলীপও তখন সবিস্ময়ে কান খাড়া করে' ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করছে।

বাড়ির বাইরে কোথায় একটা প্রচণ্ড হট্টগোল শোনা যাচ্ছে।

"কিসের আওয়াজ?"—চৌধুরী ভুরু কুঁচকে দাশুর দিকে তাকালেন।

দাশুকে কিন্তু খোঁজ নিতে আর যেতে হ'ল না।

বিনোদ হাঁফাতে হাঁফাতে ঘরে ঢুকে এসে বললে,—"ওরা কারখানা অ্যাটাক করেছে স্যার! পঞ্চুবাবুর আখড়ার সমস্ত ছেলেরা দিলীপবাবুকে ছাড়াবার জন্যে গেট ভেঙে ভেতরে ঢুকে পড়েছে!"

চৌধুরী এক মুহূর্তের জন্যে বুঝি একটু বিচলিত হয়েছিলেন। তারপর নিজেকে সামলে সোৎসাহে বলে উঠলেন,—"ভালো, খুব ভালো! দিলীপ সমস্ত তার দলবল নিয়ে এসে কারখানায় আগুন দিয়েছে! চমৎকার!"

দাশু ও বিনোদকে এবার তিনি হুকুম করলেন—"যাও আর দেরী নয়। এখুনি আগুন লাগাও। আর আখড়ার দলকেও উচিত শিক্ষা দেওয়া চাই। এই দরজায় যেন পাহারা থাকে।"

হুকুম দিয়ে চৌধুরী সাহেব হিংস্র উল্লাসের দৃষ্টিতে একবার—দিলীপের দিকে চেয়ে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে।

সমস্ত কারখানায় সত্যিই একটা কুরুক্ষেত্র এবার বাধল।

চৌধুরীর লোকেরা চারিদিকে বড় বড় তেলের পিপে উল্টে এধারে ওধারে আগুন দিচ্ছে দেখা গেল।

সেই সঙ্গে দাশুর গুণ্ডাদের সঙ্গে চলছে পঞ্চুদার শাগরেদদের লড়াই।

এরই মধ্যে চৌধুরীকে বিনোদের সঙ্গে একটি করিডর দিয়ে যেতে যেতে বলতে শোনা গেল,—"আপনি এখানে থাকুন। দমকলে যেন কিছুতে খবর না পৌঁছোয়!"

প্রভুভক্ত বিনোদ সেখানেই দাঁড়িয়ে শুধু একবার স্মরণ করিয়ে দিলে,—"কাগজপত্রগুলোও সরানো দরকার স্যার।"

"হ্যাঁ আমি সেই জন্যেই যাচ্ছি," বলে চৌধুরী এ বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেলেন।

দাশুর গুণ্ডারা দলে বেশ ভারী, দাঙ্গা মারামারি তাদের পেশা। কিন্তু দেখা গেল পঞ্চুদার আখড়ার ছেলেদের শিক্ষিত শৃঙ্খলাবদ্ধ আক্রমণের কাছে ধীরে ধীরে তারা পিছু হটতে বাধ্য হচ্ছে।

এদিকে আগুন দাউ দাউ করে নানা জায়গায় ছড়াতে সুরু করেছে। গুদামবাড়ির এক এক দিকে আর কারুর যাওয়ার সাধ্য নেই।

দমকলকে খবর দেবার কাঁচের ঢাকনা দেওয়া যন্ত্রটার কাছেই গুণ্ডাদের সবচেয়ে বড় জটলা। সেখানে আখড়ার কাউকে পৌঁছোতে না দেবার জন্যে তারা সব কিছু করতে প্রস্তুত।

আগুন লাগাবার আসল উদ্দেশ্য বুঝতে না পারলেও আখড়ার ছেলেরা, ফায়ার অ্যালার্ম-এর কাছে পৌঁছোবার চেষ্টায় প্রাণপণে তখন যুঝছে দমকলে খবর দেবার জন্যে।

দিলীপকে খুঁজে বার করবার জন্যেও তারা হন্যে হয়ে ঘুরছে।

দিলীপের ঘরের দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। দুজন চৌধুরীর পোষা গুণ্ডা সেখানে খাড়া পাহারা। বাইরের হট্টগোল দিলীপ আগে থেকেই শুনতে পাচ্ছিল, এবার পেছন দিকের জানলা থেকে আগুনের হল্কাও

দেখতে পেল। আগুন একটা বারান্দা ধরে তার ঘরের দিকেই এগোচ্ছে।

একটা কিছু না করলে নয় এখুনি। দিলীপ দরজায় সজোরে কবার লাথি মেরে দেখলে সে দরজা অত্যন্ত মজবুত। তার পদাঘাতে ভাঙবার নয়।

এদিক ওদিক চেয়ে আর কোন পথই দেখতে পেল না এ ঘর থেকে বেরুবার। শেষে এই ঘরে বন্দী হয়ে আগুনে ঝলসে মরতে হবে নাকি!

মরিয়া হয়ে রাগে হতাশায় সে আরেকবার দরজাটায় সজোরে পদাঘাত করলে।

তাইতেই কাজ হয়ে গেল।

দরজা ভাঙল না, কিন্তু স্বয়ং পঞ্চুদাই কেষ্ট এবং আর একজন শাগরেদকে নিয়ে পাশের করিডর দিয়ে যেতে যেতে সে আওয়াজ শুনতে পেলেন। করিডরটা ঘুরে এসে দরজার সামনে দুজন গুণ্ডাকে পাহারায় দেখে পঞ্চুদার আর কোন সন্দেহ রইল না। তিনি দিলীপ বলে চীৎকার করে ডাক দিলেন। বিস্ময়বিমূঢ় দিলাপও সাড়া দিল দরজার ওপার থেকে।

গুণ্ডা দুজন তখন পঞ্চুদা ও কেষ্টর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

পঞ্চুদার বুড়ো হাড়েও যে ভেল্কী খেলে তা তারা আর জানবে কি করে। এক মিনিটের মধ্যেই ধ্বস্তাধ্বস্তি শেষ। পঞ্চুদা গুণ্ডাদের একজনের কাছে চাবি নিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই দিলীপ বেরিয়ে এল।

বেরিয়ে এসেই তার প্রথম কথা হল,—"চৌধুরী সাহেব কোথায়? তোমরা দেখেছ কেউ?"

আরো দু-চার জন আখড়ার ছেলে তখন সেখানে এসে জড় হয়েছে। তারা কিন্তু কেউই চৌধুরীকে দেখে নি জানালে।

"তাহলে শিগগির গিয়ে দমকলে খবর দেবার ব্যবস্থা করো। আমি চৌধুরীর খোঁজে যাচ্ছি!" বলে দিলীপ বেরিয়ে গেল।

যাবার মুখে কেষ্ট একবার শুধু জিজ্ঞাসা করলে,—"তুমি একলা যাবে ?"

"হ্যাঁ এখন একলা যাওয়াই দরকার"—বাইরে থেকে দিলীপের গলা শোনা গেল, "তোমরা যেমন করে পারো ফায়ার ব্রিগেডে খবর দাও।"

ফায়ার ব্রিগেডে খবর সত্যিই শেষ পর্যন্ত পৌঁছোল। গুণ্ডাদের সমস্ত চেষ্টা সত্ত্বেও আখড়ার ছেলেরা তাদের হটিয়ে কাঁচ ভেঙে দমকলের ঘাঁটিতে খবর পাঠালে।

দমকলের গাড়ির ঘণ্টাধ্বনির সঙ্গে সঙ্গেই কিন্তু আরেকটি বড় ভ্যান সবেগে এসে গেটের মধ্যে ঢুকল। পুলিশের গাড়ি। সে গাড়ি থেকে অফিসার ও কনেস্টবলদের সঙ্গে যোশেফ খুড়ো ও মায়াকেই নামতে দেখলে দিলীপ বিস্মিত হত নিশ্চয়।

দিলাপ কিন্তু তখন চৌধুরীর অফিস-বাড়ির পেছন দিকে একটা দরজা খোলা পেয়ে তাই দিয়ে ভেতরে ঢুকেছে।

বাইরে চৌধুরী এন্টারপ্রাইজের বিস্তীর্ণ দেয়াল ঘেরা এলাকাটা যেন একটা দুঃস্বপ্নের ভয়াবহ রাজ্য। আগুন ধোঁয়া আর ফিনকি দিয়ে ওঠা জলের তোড়ের মাঝে সমস্ত দৃশ্যটা যেন কোনো নারকীয় বিশৃঙ্খলা স্মরণ করিয়ে দেয়।

পুলিশের গাড়ির প্রায় পিছু পিছু পর পর তিনটি দমকলের গাড়ি ঘণ্টাধ্বনিতে সমস্ত অঞ্চল সচকিত করে ভেতরে এসে ঢুকেই পাইপ লাগিয়ে জলের তোড়ে আগুন নেভাবার কাজে লেগে গেছে।

আগুন নিভিয়েও কারখানার কিছু রক্ষা করা যাবে কি না অবশ্য সন্দেহ। চৌধুরীর শয়তানী ফন্দিই হয়তো শেষ পর্যন্ত সফল হবে। তার বিরুদ্ধে কোন সাক্ষ্য প্রমাণ কোথাও পাওয়া যাবে না।

দাশু আর তার গুণ্ডার দলের কিন্তু আর দেখা নেই। যে দু-চার

জনকে আখড়ার ছেলেরা ধরে বেঁধে রেখেছে তারা বাদে বাকি সবাই বিপদ বুঝেই—হাওয়া। বিনোদবাবু পর্যন্ত বেগতিক দেখে গা ঢাকা দিয়েছেন মনে হচ্ছে।

পুলিশ অফিসার যোশেফ ও মায়ার সঙ্গে প্রথমে জ্বলন্ত কারখানার বাড়ির দিকেই গেছলেন। সেখানে পঞ্চুদা ও কেষ্টর কাছে দিলীপ চৌধুরী সাহেবের খোঁজে গেছে শুনে তাঁরা অফিসবাড়ির দিকেই ছুটলেন।

অফিসবাড়ির সামনের সব দরজা বন্ধ। পেছনের ছোট দরজাটি খুঁজে বার করে যখন তাঁরা ভিতরে গিয়ে ঢুকলেন তখন সেখানেও কাউকে দেখতে না পেয়ে তাঁরা অবাক।

অফিসার মনে মনে কি ভাবছেন কে জানে! যোশেফ ও মায়ার মুখ কিন্তু ভাবনায় শঙ্কায় তখন পাণ্ডুর হয়ে এসেছে।

মায়া ব্যাকুল ভাবে যোশেফ খুড়োকেই জিজ্ঞাসা করলে,—"কি হল মিঃ যোশেফ, গুণ্ডারা কি আবার তাকে কোথাও ধরে নিয়ে গেল ?"

যোশেফ কিছু বলার আগে পুলিশ অফিসার মায়াকে আশ্বাস দিয়ে বললেন,—"এখুনি অত ভয় পাবার কিছু হয় নি মায়া দেবী। একটু ধৈর্য ধরুন। চৌধুরী ও দিলীপবাবুর খোঁজ আমরা পাবই। তাঁরা এ এলাকা এখনো ছেড়ে যেতে পারেন নি বলেই আমার বিশ্বাস।"

সঙ্গের পুলিশ দলকে সমস্ত বাড়িটা ঘেরাও করবার আদেশ দিয়ে অফিসার নিজেই একদিকে খোঁজ করতে গেলেন।

যোশেফ খুড়ো ও মায়া দুজনেই তখন হতাশায় প্রায় ভেঙে পড়েছেন। তবু অফিসারের সঙ্গেই তাঁদের থাকতে হল।

•

দিলীপ ও চৌধুরী কাউকেই যে অফিস বাড়িতে কোথাও দেখা যায় নি তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। অফিস কামরার পেছনে চৌধুরীর গুপ্ত ঘরেই তখন দুজনে মিলিত।

পেছনের দরজা দিয়ে অফিসবাড়িতে ঢুকে দিলীপ প্রথমে সোজা চৌধুরী সাহেবের এই খাস কামরার দিকেই এসেছিল। কামরায় ঢুকে কাউকে দেখতে না পেয়ে ফিরে যেতে যেতে হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ায় দিলীপ চমকে ফিরে দাঁড়িয়েছিল।

এক পলকের জন্যে দেখা চৌধুরী সাহেবের সেই চোরা কামরার কথাটা মনে পড়ে গিয়েছিল দিলীপের।

চৌধুরী সাহেব তাঁর গুপ্ত কক্ষের কাজ যা সারবার তখন প্রায় সবই সেরে ফেলেছেন। কামরার ভেতরকার সিন্দুক থেকে কাগজপত্র সব বার করে হাতের অ্যাটাচিতে তখন ভরা হয়ে গেছে। সিন্দুকটায় তালা বন্ধ করে চাবি দিতে দিতে হঠাৎ ক্ষীণ একটা শব্দে চমকে ফিরে তাকিয়ে চৌধুরী একটু শুধু হাসলেন।

তারপর অবিচলিত ভাবে সিন্দুকের চাবিটা অ্যাটাচিতে ফেলে সেটা বন্ধ করতে করতে প্রায় স্বাভাবিক গলায় বললেন,—"আপনি তাহলে ছাড়া পেয়েছেন ?"

পেছনের ভারী গুপ্ত দরজাটা ঈষৎ ঠেলে দিলীপ এতক্ষণ শুধু মুখটাই ভেতরে বাড়িয়ে উঁকি দিচ্ছিল। এবার দরজাটা সম্পূর্ণ খুলে ভেতরে আসতে আসতে হেসে বললে,—"হ্যাঁ আমি ছাড়া না পেলে আপনি ধরা পড়বেন কি করে ? আপনার এ লুকোন আস্তানাই বা খুঁজে বার করবে কে !"

কথা বলতে বলতে চৌধুরীর অ্যাটাচিটার দিকে যেন হঠাৎ দৃষ্টি দিয়ে দিলীপ আবার বললে,—"বাঃ, আমাদের কাজের সুবিধে তো করে ফেলেছেন দেখছি !"

"তার মানে ?"—চৌধুরীর বিদ্রূপ মেশানো বিস্ময়।

"মানে, কাগজপত্রগুলো সব দামী মনে হচ্ছে। নিজে থেকে আপনি গুছিয়ে না দিলে আমাদের খুঁজতে একটু সময় লাগত বোধ হয়। দিন তাহলে ব্যাগটা আমার হাতে !"—দিলীপ সত্যিই হাতটা বাড়াল।

ব্যাগটা সরিয়ে নিয়ে হাসতে হাসতেই চৌধুরী বললেন,—"স্পর্ধাটা একটু বেশী হয়ে যাচ্ছে না! এটা আমারই অফিস, আমারই কারখানা ভুলে যাওয়া কি উচিত। কারখানার আগুন ধরিয়ে আবার এখানে সিন্দুক ভেঙে লুট করতে এসেছেন!"

"ও সেই কথাই পুলিশকে জানাবেন বুঝি?"—দিলীপের স্বরে তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ, "তাহলে আর দেরী করছেন কেন? চলুন। অ্যাটাচিটা এখানে রেখে যাচ্ছেন না নিশ্চয়?"

চৌধুরীর মুখের ভাব যেমনই হোক চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড রাগের আগুন তখন আর লুকোন যাচ্ছে না।

সেই চোখের দৃষ্টি লক্ষ্য করেই দিলীপ আবার বললে,—"আমাকে এড়িয়ে পালাবার অন্য কোন ফন্দি আর কিন্তু আঁটবেন না। জোর খাটাবার কথাও যদি ভাবেন তাতে খুব সুবিধে হবে বলে মনে হয় না। পুলিশ সমস্ত ঘেরাও করে খানাতল্লাসী করছে। চোট খাওয়া অবস্থাতেও যতক্ষণ যুঝতে পারব তার মধ্যে তাদের কেউ নিশ্চয় এসে পড়বে।"

"এলে কি হবে কি?"—চৌধুরী নির্বিকার তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে বলবার চেষ্টা করলেন।

"কিছু না।"—দিলীপ একটু হেসে বললে,—"শুধু আপনার শয়তানির প্রত্যক্ষ প্রমাণ স্বরূপ যে গোপনীয় কাগজপত্রগুলো সরিয়ে ফেলতে এসেছিলেন সেগুলো আর লুকোন যাবে না!"

"লুকোবার কি আছে কি এতে!"—চৌধুরী সাহেবের হাসির ধরনে দিলীপও প্রথমটা একটু বিমূঢ় হয়ে গেল।

চৌধুরী সাহেব তারপর হাসতে হাসতে অ্যাটাচিটা খুলে সত্যিই দিলীপের হাতে কতকগুলো কাগজ গুঁজে দিয়ে যখন বললেন, "নিজেই আপনি পরীক্ষা করে দেখুন না।" তখন দিলীপও সত্যিই বিমূঢ়।

সন্দিগ্ধ ভাবেই কাগজগুলো নিয়ে দিলীপ যখন চৌধুরীর ওপর নজর

রাখার সঙ্গে কাগজগুলোয় একটু চোখ বুলোবার চেষ্টা করছে তখনই চৌধুরী তার অপ্রত্যাশিত শয়তানীর চাল চাললে!

হঠাৎ পকেট থেকে একটা সিগারেট লাইটার বার করে নিজের হাতের কাগজগুলোয় চৌধুরীকে আগুন ধরাতে দেখা গেল।

দিলীপ চমকে সে দিকে ফিরে কাগজগুলো ধরবার জন্যে হাত বাড়াতেই অ্যাটাচি সমেত জ্বলন্ত কাগজগুলো দিলীপের মুখের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে অপ্রস্তুত অবস্থায় তাকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে চৌধুরী এক পলকের মধ্যে বাইরে বেরিয়ে এসে চোরা দরজাটা জম্পেস করে বন্ধ করে দিলেন।

কাজটা খুব সময় মাফিকই সেরে ফেলেছিলেন চৌধুরী, কারণ পরক্ষণেই ঘরের বাইরে পায়ের আওয়াজ পাওয়া গেল এবং 'আসতে পারি?' বলে শুষ্ক একটু সৌজন্য দেখিয়ে যোশেফ মায়া ও জন চারেক কনেস্টবল সমেত পুলিশ অফিসার গম্ভীর মুখে ঘরে এসে ঢুকলেন।

এক মুহূর্ত চৌধুরীও একটু চমকে গিয়েছিলেন কি না বলা যায় না, কিন্তু তারপরেই একেবারে যেন উৎফুল্ল হয়ে উঠে তিনি বললেন—"ওঃ আপনারা এতক্ষণে এসে গেছেন তাহলে!"

অফিসার কি যেন বলতে যাচ্ছিলেন। তার আগেই এক নিঃশ্বাসে চৌধুরী সাহেব অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত ভাবে তাঁর নিজের বক্তব্য শুনিয়ে দিলেন,—"কি ব্যাপার এখানে হয়েছে সব দেখেছেন নিশ্চয়? কারখানা চড়াও হয়ে যারা আগুন লাগিয়েছে তাদের কাউকে ধরতে পেরেছেন?"

"কোন ভাবনা নেই আপনার!"—চৌধুরীর উত্তেজনার জবাবে পুলিশ অফিসার শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠে আশ্বাস দিলেন,—"ধরা যাদের পড়বার সকলেই পড়বে। এখন দিলীপ সামন্ত বলে আপনাদেরই একজন কর্মচারী এখানে কোথায় আছেন বলতে পারেন?"

"আমি তো তাই জানতে চাই।"—চৌধুরী তীব্র অভিযোগের সুরে

বললেন, "চুরি করার জন্যে চাকরি থেকে তাকে ছাড়িয়ে দিই, সেই আক্রোশে দলবল নিয়ে এসে সে-ই কারখানায় আগুন লাগিয়েছে!"

"তাই নাকি!"—পুলিশ অফিসারকে রীতিমত বিস্মিত মনে হল। যোশেফ ও মায়ার দিকে দেখিয়ে তিনি বললেন,—"কিন্তু এঁরা যে বলছেন।"

অফিসারের কথার মাঝখানেই চৌধুরী বাধা দিয়ে বললেন,— "ওঁরা কি বলছেন জানবার আমার দরকার নেই। আমার অভিযোগ হল এই!"

"হুঁ, তাহলে আপনার অভিযোগটাও রেকর্ড করা দরকার!"—পুলিশ অফিসার তারই জন্যে ব্যস্ত হতে গিয়ে হঠাৎ পেছনের দেওয়ালটার দিকে চেয়ে বললেন, "আচ্ছা ওখানে কিরকম একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা যাচ্ছে না?"

"শব্দ!"—চৌধুরী যেন আকাশ থেকে পড়লেন, "ওখানে শব্দ আসবে কোথা থেকে?"

"মাপ করবেন!"—অফিসার ভ্রূকুঞ্চিত করে কি যেন ভেবে নিয়ে বললেন, "ওখানে লুকোন কোন ঘর আছে কি?"

"হ্যাঁ আছে।" মিথ্যা বলে আর লাভ নেই বুঝে চৌধুরী সহজ ভাবে স্বীকার করলেন—"ওটা আমাদের লকার রুম, কারবারের টাকাকড়ি কাগজপত্র রাখবার জায়গা!"

"ও ঘরটা একবার দেখতে পারি?" অফিসারের গলার স্বরে মনে হল দেখা না দেখা তাঁর কাছে সমান।

কিন্তু চৌধুরীর ভঙ্গি এবার একমুহূর্তে বদলে গেল। বেশ একটু কঠিন স্বরেই বললেন,—"ও ঘরে দেখবার তো কিছু নেই। তাছাড়া সব কিছু দেখবার মত পরোয়ানা এনেছেন কি?"

"না, তা অবশ্য আনি নি।"—পুলিশ অফিসারকে একটু অপ্রস্তুত মনে হল।